রতবর্ষের ইতিহাস।

প্রথম শিক্ষা।

ভাবতবর্ষে আর্য্যদিগেব আগমন হইতে ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে
মহাবাজ্ঞীকর্ত্তৃক ভাবতেশ্বরী নাম গ্রহণ পর্য্যন্ত ।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

চতুর্থ সংস্কবণ।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওযালিস ষ্ট্রীট,—বেঙ্গল্ মেডিক্যাল লাইব্রেরি
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশি
ও
২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোবিয়া
শ্রীমণিমোহন বক্ষিত দ্বাবা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

উদার-চরিত্র, অমায়িক, স্নেহাস্পদ

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ বসু কনিষ্ঠ মাতুল মহাশয়।

প্রিয় মাতুল,

বাল্যকালে যাঁহারা স্নেহের পদার্থ, পূজার পদার্থ ছিলেন, আজি তাঁহারা কোথায়? বাল্যকালে যে একটি সোণার সংসার, একটি পবিত্র সংসার দেখিতাম, আজি সে স্নেহের সংসার কোথায়? করাল কাল নির্দ্দয় হস্তে স্নেহের চিত্রগুলি একে একে মোচন করিতেছে।

জগৎ হইতে সে স্নেহের চিত্রগুলি তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু হৃদয় হইতে সে চিত্র তিরোহিত হয় না, সে স্নেহ উৎপাটিত হয় না। হৃদয়ের নিহিত স্নেহ, নিহিত আকাঙ্ক্ষা, নিহিত ব্যথা সেই শান্ত মূর্ত্তিগুলিকে অবলম্বন করিয়া প্রীতি লাভ করে, শান্তি লাভ করে।

বাল্যকালের চিরসুহৃদ্! তোমার প্রণয় সেই বাল্যচিত্রের সহিত গ্রথিত রহিয়াছে; তোমার ভালবাসা সেই বাল্যসুখ পুনরুদ্দীপ্ত করে। অদ্য তোমার নাম লইয়া এই সামান্য গ্রন্থখানি পবিত্র করিলাম। স্নেহের সহিত আমার এই সামান্য উপহারটি গ্রহণ করিও; বহু দূর হইতে তোমার স্নেহ পাইয়া আমি শান্তি লাভ করিব।

কাটওয়া।
অক্টোবর, ১৮৭১।

তোমার চির স্নেহাভিলাষী

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

PREFACE.

In the present work the writer has attempted to place before his readers a brief but clear history of the people of India, their gradual progress in civilization, their manners and customs in successive periods of history, their national life and thought and religion With this object in view the writer has,—without omitting or neglecting the political history of India,—bestowed his chief attention to giving a clear narration of the social and intellectual life of the people. He has attempted to impress on his readers a distinct picture as it were of the civilization and manners of each distinct period, and to explain how and under what influences such civilization modified itself into the civilization of the next succeeding period

In attempting to make this the distinctive feature of his compilation, the writer has availed himself of the most recent and reliable sources of information illustrating the manners and civilization of the Hindu people For his account of the primitive Aryans he is principally indebted to the scattered contributions of Max Muller as well as to the researches of his own countrymen, the eminent Doctors K. M. Banerjea and Rajendra Lala Mitra In depicting the civilization of the Vedic period, he has mainly relied on Muir and Max Muller, but has occasionally borrowed his facts from Colebrooke, Weber and other writers on this period The great epics of India and the Institutes of Manu have been his principal guides in the next period,—the period of the epics, and the invaluable Greek accounts of the Hindus have helped him to complete the picture of these times. The sources of our knowledge of the Buddhistic period and the reigns of the royal race of Chandragupta and Asoka are too well-known; and the writer has attempted to compress this information within a brief compass and to explain the real character and effects of the great religious revolution. Lastly,

the Puranas themselves are the most faithful authorities on the character of the Pauranic civilization, while the invaluable accounts of these times left by Chinese travellers have helped the writer to perfect his picture of this period.

Mr Elphinstone's great work still remains the best and most impartial account of Musalman supremacy in India, and is the principal authority on which the present writer has relied for the political events of this period He has however, consistently with his plan, supplemented his account of such events with chapters on the condition and life and civilization of the people during this period, and he has drawn his information on these points from the records of intelligent contemporaneous writers like Abul Fazel and Bernier In depicting the national life of distinct races like the Rajputs, the Mahratta and the Sikhs he has borrowed his facts from special works like those of Todd, Grant Duff and Cunningham

The writer's account of the English period is so brief that he has not always considered it necessary to consult authorities like Orme, Mill or Wilson, but has satisfied himself with gleaning his facts mainly from ordinary school-books those of Murray and other writers.

In conclusion the writer has only to add that it has been his attempt to make his book an elementary one intended for use in Entrance schools and in middle English and Vernacular schools; and he has been careful to explain his subject in a manner so that students, preparing for minor or vernacular scholarship examinations, may have no difficulty whatever in comprehending it. It is his main object to place in the hands of such young students when first entering upon a study of Indian history a short and easy work, telling in simple language the story of the Indian people, their life, their manners and their civilization, as developed modified or arrested by various influences within the last four thousand years.

দ্বিতীয় সংস্করনের বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ বারে গ্রন্থকার ইহাতে কতকগুলি নূতন বিষয় সংযোজন এবং ইহার কোন কোন স্থানে সংশোধন ইত্যাদি করিয়াছেন। পূর্ব্ববারের অপেক্ষা এবারে পুস্তকের আকার কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে, অথচ ছাত্রগণের সুবিধার্থ ৸৵০ আনা মূল্যের স্থলে ॥৶০ মূল্য নির্দ্ধারিত করা হইল।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের মধ্যবাঙ্গালা ও মাইনর বিদ্যালয় সমূহে এই ইতিহাস পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে পুনর্ব্বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।
৬ই চৈত্র, ১২৯২।

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

রাজসাহি বিভাগের মধ্যবাঙ্গালা ও মাইনর বিদ্যালয় সমূহে এই ইতিহাস পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে পুনর্ব্বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রী—কলিকাতা।
জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৪।

সূচিপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আদিম আর্য্যজাতি।

৪০০০—২০০০ পূঃ খৃঃ অব্দ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেদবর্ণিত সময়।

২০০০—১০০০ পূঃ খৃঃ অব্দ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য।

১০০০—২৫০ পূঃ খৃঃ অব্দ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধধর্ম্মের উৎকর্ষের সময়।

২৫০—৫৬ পূঃ খৃঃ অব্দ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ও পৌরাণিক ধর্ম্মের উৎকর্ষের সময়।

৫৭ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে ১২০৬ খৃঃ অব্দ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মুসলমান-আক্রমণ ও বিজয়।

৬৬৪—১২০৭ খৃঃ অব্দ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পাঠান-শাসন।

১২০৭—১৫২৬ খৃঃ অব্দ।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

নবম পরিচ্ছেদ।

পাঠান-শাসনের সময় ভারতবাসীদিগের অবস্থা।

১২০৬—১৫২৬ খৃঃ অব্দ।

দশম পরিচ্ছেদ।

মোগল-রাজ্যের উন্নতি।

১৫২৬—১৬৫৮ খৃঃ অব্দ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মোগল-রাজ্যের অবনতি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মোগল-শাসনকালে ভারতবাসীদিগের অবস্থা।

১৫২৬—১৭৬১ খৃঃ অব্দ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ইংরাজ-শাসন।

১৭৪৪—১৮৭৭ খৃঃ অব্দ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আদিম আর্য্যজাতি।

অনুমান ৪০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দ হইতে অনুমান
২০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

আদিম আর্য্যজাতি।—অনুমান চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে অকশস্ ও জাকশার্টিস নদীতীরে আদিম আর্য্যজাতি বাস করিত। হিন্দু, পারসিক, গ্রীক, রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসী, ইংরাজ, জর্ম্মাণ, ওলন্দাজ, দিনেমার, স্পানীয় রুশীয় প্রভৃতি অনেক জাতি প্রাচীন আর্য্য-জাতি হইতে উৎপন্ন।

সামাজিক আচার ব্যবহার।—ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ এই প্রাচীন জাতির ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ও সামাজিক আচার ব্যবহার অনেক দূর নিরূপণ করিয়াছেন। মৃগয়া, পশুপালন ও ভূমিকর্ষণ এই তিন ব্যবসায় দ্বারা আর্য্যগণ জীবন যাপন করিত। মৃগয়া-জীবী ও পালিত পশুজীবীগণ গৃহপ্রিয় ছিল না এবং সর্ব্বদা এক স্থানে বাস করিত না, ফলতঃ আধুনিক তাতার ও আরবজাতীয়-গণ যেরূপ বহুপরিবার ও গৃহপালিত জীব-জন্তু-সমন্বিত হইয়া শিবির হইতে শিবিরান্তরে, স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া

থাকে, তাহারাও সেইরূপ ভ্রমণপটু ছিল। কৃষকগণ অপেক্ষাকৃত গৃহপ্রিয় ছিল ও স্বভাবতঃই নিজ নিজ ভূমিতে আসক্ত থাকিত। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকগণ এরূপে এক স্থানে বাস করিত না; পশুপালকগণ পশু প্রয়োজনীয় তৃণক্ষেত্র পাইবার জন্য মৃগয়া-ব্যবসায়ী নূতন নূতন বন্য পশুর অন্বেষণে সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিত। যে স্থানে সুবিধা হইত, সেই স্থানে দলে দলে বাস করিত, পুনরায় খাদ্যের বা অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হইলেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া দলে দলে অন্য স্থান অন্বেষণ করিত। আর্য্যগণ স্বদেশে এরূপ ভ্রমণপটু না হইলে গঙ্গা হইতে টেম্‌সনদী পর্য্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিত না।

সভ্যতা ও শিল্প-বিদ্যা।—আর্য্যদিগের মধ্যে বিবাহ-রীতি ও পরিবারধর্ম্ম প্রচলিত ছিল; পিতা পরিবার রক্ষা করিতেন, মাতা খাদ্য পরিমাপ করিয়া দিতেন, দুহিতা দুগ্ধ দোহন করিতেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাহারা কৃষিকার্য্য জানিত। এতদ্ভিন্ন তাহারা পশুর লোম ও চর্ম্ম হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিত, মৃত্তিকার ভাণ্ডাদি নির্ম্মাণ করিত, ও সুবর্ণ, তাম্র ও লৌহের ব্যবহার কিয়ৎপরিমাণে জানিত। আর্য্যগণ সোম নামক এক প্রকার মদিরা প্রস্তুত করিয়া পান করিত। তাহারা গম ও যব হইতে আধুনিক "পচাইয়ের" ন্যায় এক রূপ সুরাও প্রস্তুত করিত। তাহারা রাজার অধীনে বাস করিত, ও রাজাকে কর দান করিত; গৃহ ও নগর নির্ম্মাণ করিতে জানিত। তাহাদিগের মধ্যে বাণিজ্যও কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত ছিল। তাহাদিগের মধ্যে মুদ্রা প্রচলিত ছিল না, এবং তাহারা লিখিত ভাষা বা অক্ষর জানিত না।

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্ট জানা যাইবে যে, প্রাচীন আর্য্যগণ সুসভ্য না হইলেও আধুনিক অষ্ট্রেলীয় দ্বীপবাসীদিগের ন্যায় একবারে বর্ব্বর ছিল না।

ধর্ম্ম-প্রণালী।—আর্য্যদিগের ধর্ম্ম আলোচনা করিলেও সেইরূপ প্রতীতি হইবে যে, আর্য্যগণ সুসভ্যও ছিল না একবারে বর্ব্বরও ছিল না। বর্ব্বর জাতিগণ বহুসংখ্যক মন্দপ্রকৃতি ভূত ও পিশাচে বিশ্বাস করে; সুসভ্য জাতিগণ সমস্ত সদ্গুণসম্পন্ন এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে। প্রাচীন আর্য্যজাতি এই দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী। আর্য্যগণ অনেক ঈশ্বরবাদী ছিল, প্রকৃতির মধ্যে যাহা সুন্দর বা মহৎ বলিয়া বোধ হইত, তাহাই পূজা করিত। অনন্ত নীল নভোমণ্ডলকে দ্যৌঃ বলিয়া পূজা করিত, ও কখনও বরুণ বলিয়া সম্বোধন করিত। সূর্য্য ও অগ্নি আর্য্যদিগের আরাধ্য দেবতা ছিলেন। এই জাতির মধ্যে কোনরূপ মন্দির বা দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণপ্রথা প্রচলিত ছিল, এরূপ বোধ হয় না। বরং স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, পুরোহিত বা পৃথক্ উপাসকসম্প্রদায় ছিল না; আকাশ বা সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক পরিবারের শ্রেষ্ঠ ও বৃদ্ধ পুরুষ পূজার মন্ত্র পাঠ করিত, ও ফল, মূল বা দুগ্ধ দান করিয়া নিজ নিজ যাচ্ঞা প্রকাশ করিত। আর্য্যদিগের আদিম ধর্ম্ম এইরূপ সরল, এইরূপ বিশদ ও এইরূপ প্রশান্ত।

আর্য্য উপনিবেশ-সমূহ।—পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আর্য্যদিগের মধ্যে অধিকাংশই সর্ব্বদা ভ্রমণপটু ছিল। সুতরাং নিজের চঞ্চলতা বশতঃই হউক, গৃহবিচ্ছেদকারণেই হউক, খাদ্যের অভাবের জন্যই হউক, বা পূর্ব্বদিকে তুরাণীয়

জাতিদিগের আক্রমণ-কারণেই হউক, আর্য্যগণ সময়ে সময়ে দলে দলে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ পূর্ব্বক নূতন আবাসস্থান অন্বেষণ করিত, ও বর্ব্বর জাতিদিগকে জয় করিয়া নূতন নূতন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিত। এরূপ কত দেশে কত উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বলা দুঃসাধ্য, বোধ হয়, অনেক আর্য্য উপনিবেশ কালে একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে; তথাপি প্রধান উপনিবেশগুলি এখনও বিদ্যমান আছে। সেই উপনিবেশ এই ছয় সহস্র বৎসরের পর অদ্যাপি জগতের সকল জাতির মধ্যে পরাক্রান্ত ও সুসভ্য। আমরা সেই প্রধান উপনিবেশ কয়েকটির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

১। ইউরোপের পূর্ব্ব ও দক্ষিণে যে স্লাবনীয় জাতি অদ্যাপি বাস করে, তাহারা আর্য্য সন্তান; বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যগণ এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। আধুনিক রুশীয় ও পোলগণ স্লাবনীয় আর্য্য।

২। ইউরোপের মধ্যাংশে যে লিথুনীয় জাতি বাস করে, তাহারাও আর্য্যজাতির শাখা মাত্র। আধুনিক প্রুশীয়গণ অধিকাংশই লিথুনীয় আর্য্য।

৩। ইউরোপের পশ্চিমে যে মহাপরাক্রান্ত টিউটন্ জাতিগণ বাস করে, তাহারাও আর্য্যজাতি হইতে উৎপন্ন। আধুনিক জর্ম্মাণ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইংরাজ প্রভৃতি বহুজাতি টিউটন্ আর্য্য।

৪। ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিমে যে মহাপরাক্রান্ত কেল্টিক জাতি বাস করে, তাহারাও আর্য্যজাতির শাখা মাত্র। আধুনিক স্পানীয়, ফরাসী, আইরিশ প্রভৃতি অনেক জাতি কেল্টিক আর্য্য।

৫। পূর্ব্বকালে যে গ্রীক ও রোমীয় জাতি ইউরোপে সভ্যতার আলোক বিস্তার করিয়াছিল, তাহারাও আর্য্যজাতির হেলেনিক্ শাখা। আধুনিক গ্রীক্ ও ইতালীযগণ হেলেনিক আর্য্য।

গৃহবিচ্ছেদ ও দুই সম্প্রদায়ের যুদ্ধ।—যে সময়ে আর্য্যগণ বিদেশে এরূপ উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিল, সে সময়ে স্বদেশেও তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল না। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি-কারণে বা পূর্ব্ব দিকে তুরেণীযদিগের উৎপীড়নে তাহারা ক্রমশঃই দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে রাজ্য বিস্তার করিতেছিল। কালক্রমে আধুনিক পারস্য ও কাবুল দেশ আর্য্যরাজ্যের অন্তর্গত হইল। ক্রমে এই বিস্তীর্ণ রাজ্যাধিবাসী আর্য্যদিগের মধ্যে একটি গৃহ-বিচ্ছেদ হইল।

এই গৃহবিচ্ছেদের সকল কারণ এক্ষণে বিশেষরূপে জানা যায় না, কিন্তু ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের বিভিন্নতাই যে, ইহার প্রধান কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। আর্য্যদিগের মধ্যে একদল সামান্য সোমরস ও ফল মূল আহারাসক্ত ছিল, অন্য এক দল সেই সোমরসকে মাদকরূপে সেবন করিত ও মাংসপ্রিয় ছিল। প্রথম দল পূজনীয় দেবদিগকেও ঐরূপ সোমরস ও ফল মূল দান করিয়া পূজা করিত, দ্বিতীয় দল মাদক রস ও মাংস দিয়া আরাধনা করিত। প্রথম দল আপন আপন আরাধ্যকে "অসুর" বলিয়া পূজা করিত, ও দ্বিতীয় দলের আরাধ্যকে "দেব" বলিয়া ঘৃণা করিত; দ্বিতীয় দলও সেইরূপ আপনাদিগের আরাধ্যকে "দেব" বলিয়া পূজা করিত ও প্রথম দলের আরাধ্যকে "অসুর" বলিয়া ঘৃণা করিত। ক্রমে অসুরপূজক ও দেবপূজকদিগের মধ্যে মহাবিরোধ ও মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। অসুরপূজকগণ

জয় লাভ করিল ও স্বদেশে রহিল; মদ্যপায়ী দেব-পূজকগণ পরাস্ত হইয়া দেশ ত্যাগ করিল।

পরাজিত সম্প্রদায়ের ভারতবর্ষে প্রবেশ।— মদ্যপায়ী দেবপূজক পরাজিত আর্য্যসম্প্রদায় দেশ ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইল? তাহারা সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতবর্ষে পলায়ন করিল। এই ভীষণ যুদ্ধের কথা দুই জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রেই পাওয়া যায়। পারসী ও হিন্দু, উভয় জাতিই দেবাসুরের যুদ্ধের কথা বর্ণনা করিয়াছে। তবে অসুর-পূজক পারসীগণ নিজ শাস্ত্রে অসুরের পূজা ও গৌরবের কথা ও পরাজিত দেবদিগের নিন্দার কথা লিখিয়াছে, দেব-পূজক হিন্দুগণ নিজশাস্ত্রে দেবের গৌরব ও অসুরের নিন্দা করিয়াছে, ও দেবের প্রকৃত পরাজয়ের কথা স্বীকার করিয়াও, পরে অসুরের পরাজয় হইয়াছিল, এইরূপ কল্পিত গল্প রচনা করিয়াছে।

এই রূপে গৃহনিষ্ক্রান্ত একদল আর্য্যসন্তান আধুনিক ভারত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। হিন্দুগণ এই আর্য্যের সন্ততি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেদবর্ণিত সময়।

অনুমান ২০০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অনুমান
১০০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

সংহিতাবর্ণিত সময়, অর্থাৎ জাতিবিচ্ছেদ ঘটিবার পূর্ব্বের অবস্থা।—পরাজিত আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল, তখন সমগ্র ভারতবর্ষে অতি অসভ্য জাতি বাস করিত। ফলতঃ এক্ষণে যে ভীল, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ পর্ব্বতে ও জঙ্গলে বাস করে, তাহারাই ভারতবর্ষের আদিমবাসী, তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এক কালে সমস্ত ভারতবর্ষে অধিবাস করিত। আর্য্যদিগের সহিত বহু শতাব্দীর ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত ও দেশচ্যুত হইয়াই তাহারা উর্ব্বর প্রদেশ সমস্ত ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত ও জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছে। নবাগত আর্য্যগণের সিন্ধুনদ পার হইবার অচিরকাল পরেই এই আদিম অসভ্য জাতিদিগের সহিত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। আর্য্যগণ শ্বেতকায় ছিল, ও আদিমবাসীগণকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া সর্ব্বদাই ঘৃণা করিত; এবং এই কৃষ্ণকায় শত্রুর ধ্বংসের জন্য দেবতার নিকট সর্ব্বদাই আরাধনা করিত। বহু শতাব্দীর ভীষণ যুদ্ধের পর আদিমবাসীগণ ক্রমে পরাজিত হইল, ও সিন্ধু হইতে শতদ্রু পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ (পঞ্জাব প্রদেশ) আর্য্যদিগের হস্তগত হইল। যখন বেদের সংহিতা রচিত হয়, তখন আর্য্যগণ ভারতবর্ষের

মধ্যে কেবল এই প্রদেশখণ্ড অধিকাব কবিয়াছিল। তাহাবা এই প্রদেশেব কথা গীতে উল্লেখ কবিযাছে। বিজিত অসভ্য জাতিব অনেকেই আর্য্যদিগেব অধীনতা স্বীকাব কবিল, অবশিষ্ট অংশ জঙ্গল বা পর্ব্বতে আশ্রয লইযা নিজ নিজ স্বাধীনতা বক্ষা কবিতে লাগিল।

পূর্ব্ব পবিচ্ছেদে লিখিত হইযাছে যে, আদিম আর্য্যগণ প্রকৃতির মধ্যে যাহা সুন্দব ও মহৎ দেখিত, তাহাই পূজা কবিত, ও আকাশ ও সূর্য্যকে আবাধনা কবিত। ভাবতবর্ষে আগমনেব পব এই ধর্ম্ম ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ কবিতে লাগিল। সিন্ধুতীর-বাসী আর্য্যগণ ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য্যকেই সমধিক পূজা কবিত। ইন্দ্র আকাশেব দেবতা। তিনি সোমবস পান কবেন, ও মনুষ্যে র উপকাবেব জন্য সর্ব্বদাই বৃত্র ও পণি অসুবদিগেব সহিত যদ্ধ কবেন। অগ্নি অন্যান্য দেবগণকে আহ্বান কবিযা যাগ যজ্ঞ সম্পা-দন কবেন। সূর্য্য মনুষ্যেব হিতার্থ আলোক বিতবণ কবেন। ইহা ভিন্ন বিশ্ব বা প্রকৃতিকপিণী অদিতিব সপ্ত সন্তান,—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বকণ, দক্ষ, অংশ ও সাবিত্রী। তন্মধ্যে মিত্র ও বরু-ণই সর্ব্বাপেক্ষা পূজার্হ। মরুৎগণ ইন্দ্রেব সহচব; অশ্বিনগণ পীডা আবোগ্য কবেন, রুদ্র অগ্নিব ও বিষ্ণু সূর্য্যেব রূপান্তব মাত্র ত্বষ্টৃ দেবতাদিগেব কর্ম্মকাব ও উষা প্রাতঃকালে দর্শন দেন।

উপবি উক্ত দেব-বর্ণনা হইতে অনায়াসে উপলব্ধি হইবে যে, হিন্দুধর্ম্ম এক্ষণে যে আকাব ধারণ কবিযাছে, সিন্ধুতীববাসী আর্য্যগণেব নিকট সে আকাবে পবিচিত ছিল না। স্থান, কাল ও সভ্যতানুসারে ধর্ম্মেব পরিবর্ত্তন হয়। কালের ও সভ্যতার

গত্যনুসারে সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যদিগের সরল প্রকৃতি-পূজা এক্ষণে পরিবর্ত্তিত ও সুন্দর সুন্দর নানা উপন্যাসে বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের রূপ ধারণ করিয়াছে। বেদবর্ণিত কালে ব্রহ্মা বা শিব পূজিত হইতেন না; বিষ্ণু সূর্য্যের রূপান্তর মাত্র ছিলেন; তাঁহার দশ অবতারের কথা যাহা পুরাণে লেখা আছে, বেদে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। দুর্গা, কালী ও কৃষ্ণের নামমাত্রও বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

দেববিষয়ে যেরূপ, অন্যান্য বিষয়েও আদিম হিন্দুধর্ম্ম আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম হইতে সেইরূপ পৃথক্। আদিম হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিবিচ্ছেদ ছিল না, ধর্ম্মঘটিত অসমতা ছিল না। আরাধনাও সরল, উপাসক ঘৃত বা সোমরসের আহুতি দান করিতেন, নিজের বা পরিবারের কুশল বা স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করিতেন, গোবৎস-বৃদ্ধির জন্য আরাধনা করিতেন, অথবা কৃষ্ণকায় অসভ্য জাতিদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন। রাজগৃহে পূজা নির্ব্বাহার্থ এক এক জন করিয়া পুরোহিত নিযুক্ত থাকিতেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। পূজকের গৃহই মন্দির, ইহা ভিন্ন অন্য মন্দির ছিল না, দেবমূর্ত্তিও ছিল না। প্রথম হিন্দুদিগের এইরূপ সরল ধর্ম্ম ও এইরূপ সরল পূজা ছিল। এই সময়ে ঋগ্বেদের সংহিতা রচিত হয়, সেই জন্য আমরা এই কালকে সংহিতা-বর্ণিত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

ব্রাহ্মণবর্ণিত কাল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের সময়।—কালক্রমে অনেক ধর্ম্মবিষয়ক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সমাজের প্রথমাবস্থায় সকলেই যেরূপ

কৃষিকার্য্য, মেষপালনকার্য্য ও যুদ্ধকার্য্য সম্পাদন করে, পরে সেরূপ থাকে না; প্রতি ব্যবসায়ের অবলম্বনকারী লোক এক একটি ভিন্ন-শ্রেণীভুক্ত হয়। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যোদ্ধাই সচরাচর নিজের গৃহ, নিজের ধনুর্ব্বাণ, নিজের নৌকা প্রস্তুত করিয়া থাকে; কিন্তু সভ্যতার উৎকর্ষের সহিত যুদ্ধব্যবসায় ও অস্ত্রনির্ম্মাণব্যবসায়, গৃহনির্ম্মাণ ও পোতনির্ম্মাণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় বলিয়া পরিগণিত হয় ও ভিন্ন ভিন্ন লোকের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এইরূপে প্রত্যেক ব্যবসায়াবলম্বী লোক এক একটি ভিন্ন-শ্রেণীভুক্ত হইতে থাকে। হিন্দুদিগের সভ্যতার উৎকর্ষের সহিত এই ঘটনা ঘটিল। জগতের অন্যান্য স্থানে যেরূপ, ভারতবর্ষেও সেই-রূপ, পূজকগণ একটি বিভিন্ন-শ্রেণীভুক্ত হইল, ব্রাহ্মণ নাম ধারণ করিল ও ক্রমে পূজা-সম্পাদন কার্য্য একচেটিয়া করিয়া লইল, সুতরাং আর কেহ ব্রাহ্মণকে না ডাকিয়া নিজের পূজা নিজে সম্পাদন করিতে পারিত না। পরাক্রান্ত গর্ব্বিত যোদ্ধা ও রাজ-গণও সামান্য লোক হইতে পৃথক্ হইয়া একটি বিভিন্ন-শ্রেণীভুক্ত হইল ও ক্ষত্রিয় নাম ধারণ করিল। সামান্য কৃষি বাণিজ্য ব্যব-সায়ীগণ যোদ্ধা বা পূজকদিগের ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হইত না; তাহারা একটি অধীন-শ্রেণীভুক্ত হইয়া বৈশ্য নাম ধারণ করিল। পরাজিত কৃষ্ণকায় অসভ্যগণের মধ্যে যাহারা হিন্দুদিগের দাসত্ব স্বীকার করিল, তাহারা শূদ্র নাম ধারণ করিয়া আর্য্যসন্তান-দিগের দাস হইয়া রহিল।

এইরূপে হিন্দুগণ চারি জাতিতে বিভক্ত হইলে পর পূজক অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ ক্রমে পূজার ঘটা বৃদ্ধি করিতে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগের সম্মান ও মর্য্যাদার বৃদ্ধি করিতে

লাগিল। এইরূপ পূজার আড়ম্বর-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভীরুতা (Superstition) বৃদ্ধি পাইল এবং হিন্দুদিগের জাতীয় জীবন হীনবল ও চিন্তাশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যত পূজার সমারোহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যত ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থিরীকৃত করিতে লাগিল, ততই অন্যান্য জাতীয় লোক-গণ ধর্ম্মভীরু হইতে লাগিল, ততই হিন্দুদিগের কার্য্যক্ষমতা ও মানসিক ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হইল। হিন্দুদিগের মধ্যে জাতি-বিচ্ছেদের প্রারম্ভেই এই বিষময় ফল ফলিল. পণ্ডিতবর মক্ষ-মূলরের মতে হিন্দুদিগের "নূতন ও স্বাস্থ্যকর উন্নতি পূজক-প্রাধান্য ও ধর্ম্মভীরুতার দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গেল।"

এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের সময় ঋগ্বেদের সংহিতা পরিবর্দ্ধিত ও রূপান্তরিত হইয়া আর তিনখানি বেদের সংহিতা রচিত হয়, এবং এই সময়েই চারি বেদের "ব্রাহ্মণ" অংশ রচিত হয়। সেই জন্য আমরা এই কালকে ব্রাহ্মণ-বর্ণিত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

উপনিষদ্‌বর্ণিত কাল, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের সময়।—সৌভাগ্যক্রমে পূজকপ্রাধান্য অধিক দিন রহিল না, যোদ্ধা বা ক্ষত্রিয়সম্প্রদায় অচিরে আপনাদিগের মর্য্যাদার জন্য সচেষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব অস্বীকার করিল এবং শাস্ত্র ও বিদ্যার আলোচনায় আপনাদিগের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিল। বেদের "ব্রাহ্মণ" অংশের পর যে "আরণ্যক" বা "উপনিষৎ" অংশ রচিত হইয়াছে, তাহাতে ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষদের অনেক অংশে ক্ষত্রিয়গণ দর্প করিয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছে, বৃথা আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া গভীর

বৈজ্ঞানিক চর্চ্চায় জাতীয় চিন্তার পরিচয় দিতেছে, এরূপ দেখা যায়। কিন্তু কেবল শিক্ষা ও চিন্তায় ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য প্রকাশ হইয়াছিল এরূপ নহে, যে জনক রাজা উপনিষদের এক জন প্রধান শিক্ষাগুরু, তাঁহার জামাতা রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ পরশুরামকে পরাস্ত করিয়া ব্রাহ্মণপ্রাধান্য বিনষ্ট করেন, পরে দক্ষিণাপথ ভেদ করিয়া সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়-বল ও প্রাধান্য বিস্তার করেন। রামচন্দ্রের আখ্যান সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, ঐ আখ্যান দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, জনক রাজা ও উপনিষৎ রচনার সময়ে অর্থাৎ বেদবর্ণিত কালের শেষাংশে ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্রবলে ব্রাহ্মণ-বলকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করেন।

এই সময়ে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের আরও প্রমাণ আছে। কুরু-ক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়-বলের পরিচয় দিতেছে। সকলেই জানেন যে, বেদব্যাসের জীবিত কালেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বেদব্যাসের গল্প প্রকৃতই হউক বা অপ্রকৃতই হউক, দ্বৈপায়ন বেদব্যাস নামে কোন লোক থাকুন বা নাই থাকুন, এই জন-শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, যে কালে বেদ রচিত ও সঙ্কলিত হয়, সেই কালেরই শেষ ভাগে ক্ষত্রিয়-বলের অপরি-সীম বিকাশ হইয়াছিল। এইরূপ নানা কারণে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, বেদবর্ণিত কালের শেষ অংশে ক্ষত্রিয়-বল ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ক্ষত্রিয়-বলের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, অস্ত্র-বল বিকাশ পাইয়া-ছিল, আর্য্যদিগের জাতীয় জীবন উদ্দীপ্ত হইয়াছিল এবং অনার্য্য দক্ষিণাপথ ভেদ করিয়া আর্য্যগৌরব বিস্তৃত হইয়াছিল।

সামাজিক আচার ব্যবহার ও সভ্যতা।—বেদবর্ণিত সময়ের মধ্যে আর্য্যগণ সরযূ অতিক্রম করিয়া আরও পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, আধুনিক বিহার ও বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল কি না, জানা যায় না। এই প্রশস্ত প্রদেশের অনেক অংশ আবাদ হইয়াছিল, কিন্তু অনেক স্থানে বৃহৎ বৃহৎ জঙ্গলও ছিল, তাহা তখনও আবাদ হয় নাই। এক্ষণে যেরূপ, তিন চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও সেইরূপ হিন্দু-প্রদেশ ক্ষেত্র-বেষ্টিত গ্রামে বিভূষিত ছিল। গৃহগুলি এক্ষণকার ন্যায় মৃত্তিকানির্ম্মিত, বা পর্ব্বত-প্রদেশে প্রস্তরনির্ম্মিত। ইহা ভিন্ন রাজাদিগের প্রাচীরবেষ্টিত, দুর্গরক্ষিত পুর বা নগরীও ছিল।

উপরি উক্ত প্রশস্ত প্রদেশে আর্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক রাজ্য এক জন রাজা শাসন করিতেন। সময়ে সময়ে রাজাদিগের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হইত। অনেক রাজা একত্র দলবদ্ধ হইয়া অন্যান্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিতেন। তদ্ভিন্ন সৌহার্দ্য বশতঃও কখন কখন অনেক রাজা এক এক স্থানে সমবেত হইতেন। রাজগণ বহুস্তম্ভ ও বহু দ্বারবিভূষিত প্রাসাদে বাস করিতেন, এবং সুবর্ণশোভিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বহুসংখ্যক দূতবেষ্টিত হইয়া রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রাজগণ অনেক দারপরিগ্রহ করিতেন, ও প্রায়ই ধর্ম্ম-কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য এক এক জন ঋষিয়া পুরোহিত রাখিতেন এবং পুরোহিত ও ঋষিদিগকে সর্ব্বদাই অশ্ব, গো, রথ, সুবর্ণ, পরিচ্ছদ ও সুন্দরী দাসী দান করিতেন। রাজাদিগের অধীন গ্রাম ও নগর শাসনার্থে গ্রামনী ও পুরপতি নিয়োজিত হইত।

বহুবিবাহ-রীতি প্রচলিত ছিল, কিন্তু সামান্য লোকে প্রায় একটি বিবাহ করিত। নারী বিধবা হইলে, পুনর্বার বিবাহ করিতে পারিত এবং বিধবার মৃত স্বামীর ভ্রাতার সহিত বিবাহের রীতিও প্রচলিত ছিল।

যব, ব্রীহি, মাষ, তিল, ধান্য প্রভৃতি শস্যের চাষ হইতে ও উদ্যানে নানারূপ পুষ্প ও ফল ফলিত। গোমাংস ও মহিষ-মাংস, সোমরস ও সুরা আহার ও পানীয় দ্রব্য ছিল। অক্ষ-ক্রীড়া বৈদিক সময়েও প্রচলিত ছিল।

যোদ্ধাগণ বর্ম্ম পরিধান করিয়া, ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া যুদ্ধে যাইতেন। রথীগণ অশ্বচালিত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন। যুদ্ধে পতাকার ব্যবহার ছিল। এক এক জন সেনানী বহুসংখ্যক সেনাকে চালনা করিত।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের বিবরণ হইতে এই সময়ের সভ্যতার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সূত্রধর, ভিষক্, পুরোহিত লৌহ-কর্ম্মকার ও কবির পরিচয় পাওয়া যায়; সুতরাং কাষ্ঠকার্য্য, লৌহকার্য্য ও চিকিৎসাবিদ্যা প্রচলিত ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যোদ্ধা ও ধনীদিগের ব্যবহারার্থ রথ ও শটক, এবং লৌহের বর্শা, অসি ও পরশুও নির্ম্মাণ হইত। তন্তুব্যবসায় ও বস্ত্রনির্ম্মাণ, দণ্ডচালিত নৌকা ও সমুদ্রগামী পোত-নির্ম্মাণ, চর্ম্মব্যবসায় ও কৃষিকার্য্য, এ সমস্তই জানা ছিল। অদ্য সুন্দর-বনে যেরূপ, চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সেইরূপ ভারতবর্ষের কৃষকগণ, অগ্নি দ্বারা বন দাহন করিয়া চাষ কর্ম্ম আরম্ভ করিত ও প্রণালী খনন করিয়া, দূর হইতে জল আনিয়া ক্ষেত্রে সিঞ্চন করিত।

বেদের কাল-নির্ণয়।—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। প্রত্যেক বেদে সংহিতা অর্থাৎ আরাধনার সরল মন্ত্র, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আড়ম্বর পরিপূর্ণ পূজার রীতি পদ্ধতি, এবং উপনিষদ্‌ অর্থাৎ চিন্তাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আলোচনা, এই তিন অংশ আছে, তাহাও পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

পণ্ডিতবর মক্ষমূলরের মতে ১২০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮০০ পূঃ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঋগ্বেদের সংহিতা রচিত ও সঙ্কলিত হয়, ও ৮০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অন্যান্য বেদের সংহিতা ও চারি বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্‌ রচিত হয়। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয়, ১০০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই সমস্ত রচিত হইয়াছিল। সেই জন্য আমরা ২০০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১০০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়কে "বেদ-বর্ণিত সময়" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য।

অনুমান ১০০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ২৫০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

পুনরায় ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য।—পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে যে, বেদবর্ণিত কালের শেষে ক্ষত্রিয়গণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পূজক-সম্প্রদায় পুনরায়

প্রাধান্য লাভ করিল। উপনিষদের পর কোন গ্রন্থে ক্ষত্রিয়প্রাধান্যের পরিচয় নাই, ছয় বেদাঙ্গে ও বিস্তীর্ণ স্মৃতিশাস্ত্রে পুনর্বার ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের ও ব্রাহ্মণ-ধীশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

সে সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল; প্রতি রাজার প্রাচীর-বেষ্টিত রাজধানী, এবং বহু সংখ্যক রথী ও পদাতিক সেনা ছিল। সৈন্যগণ প্রায়ই ধনুর্ব্বাণ হস্তে যুদ্ধ করিত, কিন্তু সময়ে সময়ে খড়্গযুদ্ধ ও গদাযুদ্ধও করিত। রাজগণ সকলেই ক্ষত্রিয়; তাঁহারা পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ব ও কুটুম্বিতাসূত্রে বদ্ধ থাকিতেন। তথাপি সময়ে সময়ে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইত। বহুদেশের রাজা বহুদেশের সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে যিনি অধিকতর ক্ষমতাশালী হইতেন, তিনি মধ্যে মধ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, আপনার প্রাধান্য প্রচার করিতেন ও সমস্ত রাজাদিগকে আহ্বান ও সমাদর করিতেন। এতদ্ভিন্ন রাজদুহিতাগণ মধ্যে মধ্যে স্বয়ম্বরা হইতেন; সে কারণেও অনেক রাজা মধ্যে মধ্যে এক সভায় সমবেত হইতেন।

স্বদেশরক্ষা, কর আদায় ও প্রজার হিতসাধন ভিন্ন নৃপতিদিগের প্রায় অন্য কার্য্য ছিল না। তাঁহারা সর্ব্বদাই মৃগয়ায় যাইতে ভালবাসিতেন ও অক্ষক্রীড়াপ্রিয় ছিলেন। মুনি, ঋষি ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই রাজসভায় সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। রাজা স্বয়ং কখন কখন মুনিদিগের শান্ত আশ্রমে গমন করিয়া রাজকার্য্য-ভার বিস্মৃত হইতেন। সেই সমস্ত আশ্রমে পুরুষানুক্রমে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের আলোচনা হইত; বহুদেশ হইতে ও বহুশ্রেণী হইতে বহুবিদ্যার্থী এক ঋষির নিকট আসিয়া বিদ্যা শিক্ষা

করিত ও ঋষিকে পিতৃবৎ ভক্তি ও পরস্পরকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান করিত; পরে বিদ্যালোচনা সমাপ্ত হইলে, নিজ নিজ পদ বা শ্রেণীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, অথবা অন্য শিষ্য লইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিত।

নৃপতিদিগের প্রায়ই বহুসংখ্যক কলত্র থাকিত, কিন্তু প্রায় এক জন মাত্র প্রধান রাজ্ঞী থাকিতেন। উৎসবের সময় বা অন্য সময় রাজ্ঞীগণ সভায় আসিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। রাজপুত্রগণ অল্প বয়স হইতে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিতেন ও যৌবনের প্রারম্ভে যুদ্ধ-ব্যবসায়ে পরিপক্ক হইতেন। মন্ত্রিত্বকার্য্য, বিচার কার্য্য ও শাসনকার্য্য প্রায়ই ব্রাহ্মণদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। রাজা স্বয়ং বা তাঁহার কর্ম্মচারীগণ প্রত্যহ বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

ভিন্ন ভিন্ন পদের রাজকর্ম্মচারী দ্বারা শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। এক গ্রামের অধীশ্বর, দশ গ্রামের অধীশ্বর, শত গ্রামের অধীশ্বর, সহস্র গ্রামের অধীশ্বর, সকলেই রাজার অধীনে স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে শান্তি রক্ষা করিত ও নিজ নিজ কার্য্যের বেতনস্বরূপ কিছু কিছু ভূমি অধিকার করিত ও তাহার ফল ভোগ করিত। এইরূপে সেনাধ্যক্ষগণও বেতন না পাইয়া নিজের ও অধীনস্থ সৈন্যের বেতনস্বরূপ ভূমি অধিকার করিত ও তাহার ফল ভোগ করিত।

এই সমস্ত বর্ণনা হইতে উপলব্ধি হয় যে এখন যেরূপ, তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও সেইরূপ ভারতবর্ষ শস্যক্ষেত্রবেষ্টিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে আচ্ছাদিত ছিল। এখনকার ন্যায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভূমিকর্ষণই হিন্দুদিগের প্রধান উপজীবিকা ছিল।

উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ কি তদপেক্ষা ন্যূন কৃষকগণ রাজকর স্বরূপ দান করিত। যে সমস্ত গ্রাম বেতনস্বরূপ সেনাধ্যক্ষকে বা অন্য রাজকর্ম্মচারীকে দেওয়া হইত, তাহার কর সেই সেই রাজকর্ম্মচারী ভোগ করিতে; অন্যান্য গ্রামের কর রাজকোষে সংগৃহীত হইত। উৎপন্ন দ্রব্যের কর ভিন্ন বাণিজ্যের উপর কর স্থাপিত ছিল।* এইরূপে নানা আয়ের দ্বারা রাজপরিবারের বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত।

সামাজিক আচারব্যবহার।—এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের সময়ে ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ গৌরব দেখা যায়। অন্য জাতির জন্য এক নিয়ম, ব্রাহ্মণের জন্য এক নিয়ম, অন্য বর্ণের প্রতি ব্রাহ্মণকৃত পাপের অল্প শাস্তি, ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচারের দশ গুণ শাস্তি। ব্রাহ্মণগণ প্রথমাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস করিবে পরে সংসারাশ্রম গ্রহণ করিবে; পরে বনচারী হইয়া ফলমূল আহার করিবে ও কঠোর তপস্যা করিবে, শেষে সন্ন্যাসীর ন্যায় থাকিবে, এইরূপ বিধান আছে, কিন্তু বোধ হয়, সংসারী অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণই এই নিয়ম পালন করিত। রাজনীতি, বিচারকার্য্য ও মন্ত্রিপদ ব্রাহ্মণদিগের উপর ন্যস্ত থাকিত। বেদের অর্থগ্রহণ, সামাজিক নিয়মস্থাপন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই তাহাদিগের অবিভক্ত অধিকার ছিল। স্বয়ং রাজা ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বদা দক্ষিণা দান করিতেন, এবং [illegible] যজ্ঞ হইলে অন্যান্য জাতীয় লোকগণও সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ[illegible] দক্ষিণা দান করিত।

ক্ষত্রিয়কুল রাজকুল; তথাপি [illegible] ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত এবং শাসন ও বিচার[illegible] [illegible]ণদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিত। বেদপাঠে ক্ষত্রি[illegible] [illegible]ধ ছিল।

বৈশ্যগণ ভূমি কর্ষণ করিত, বাণিজ্য অবলম্বন করিত, গো, মেষ রক্ষা করিত ও অন্য লোককে অর্থ ধার দিত। বেদপাঠে তাহাদিগেরও অধিকার ছিল।

শূদ্রগণ আর্য্যজাতিদিগের দাস থাকিবে, এইরূপ বিধান আছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ মহাকাব্যবর্ণিত অবস্থায় শূদ্রদিগের অবস্থা মন্দ ছিল না; তাহারা নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিত।

এই চারি জাতি ভিন্ন অন্যান্য ব্যবসায়াবলম্বীগণ মিশ্রজাতীয় বলিয়া বর্ণিত আছে। এক জাতীয় পুরুষ ও অন্য জাতীয়া কন্যা হইতে মিশ্রজাতির উৎপন্ন হওয়া জনশ্রুতি মিথ্যা; সভ্যতার সহিত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় সৃষ্টি হওয়ায়, সেই সেই ব্যবসায়াবলম্বনকারীগণ এক একটি ভিন্ন জাতীয় বলিয়া পরিগণিত হইল। সে কালে এক্ষণের ন্যায় ভিন্ন জাতীয় লোকগণ একত্র আহার করিলে বা অন্য জাতীয়া রমণীকে বিবাহ করিলে জাতিভ্রষ্ট হইত না, প্রকৃত পাপ করিলেই লোকে জাতিভ্রষ্ট হইত।

এই কালে বিবাহ-প্রণালী এক্ষণকার প্রণালী হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন ছিল। উচ্চজাতীয় পুরুষ নীচজাতীয় স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে পারিত। স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতা বা নিকট আত্মীয় বিধবার সন্তান উৎপাদন করিতে পারিত ও সেই সন্তান মৃত ব্যক্তির সন্তান বলিয়া গ্রাহ্য হইত। অনার্য্য দক্ষিণ-ভারতবর্ষে বোধ হয় ভ্রাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবধূ ও সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিবার প্রথা ছিল। এইরূপে সুগ্রীব তারাকে ও বিভীষণ মন্দোদরীকে গ্রহণ করেন। স্ত্রীর গর্ভে সন্তান না হইলে বা স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হইলে, স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে

পারিত। ধর্ম্মের জন্য স্বামী বিদেশযাত্রা করিলে, স্ত্রী তাঁহার জন্য আট বৎসর অপেক্ষা করিবে; বিদ্যাভ্যাসের জন্য যাইলে ছয় বৎসর অপেক্ষা করিবে; আমোদের জন্য যাইলে তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে। তাহার পর কি করিবে, স্পষ্ট লিখা নাই; কিন্তু বোধ হয়, পুনরুদ্বাহ করিবার অধিকার ছিল। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় যে সমস্ত শ্লোক আছে, তাহা হইতে বোধ হয়, বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু ক্রমে নিষিদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং পুস্তকলেখকগণ ঐ রীতি নিষেধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

ধর্ম্ম-প্রণালী।—পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, বেদ-বর্ণিত সময়াপেক্ষা তাহার পরের সময়ে জাতিসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তথাপি এক্ষণে যেরূপ শত শত জাতি হইয়াছে, সেরূপ হয় নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। বেদোল্লিখিত দেব অপেক্ষা তাহার পরের সময়ে অধিকসংখ্যক দেব পূজিত হইত, তথাপি পুরাণের প্রায় অসংখ্য দেবতা তখনও সৃষ্ট হয় নাই। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, বৃহস্পতি, ধর্ম্ম, ধন্বন্তরি প্রভৃতি দেবের বিষয় মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে; ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনা আছে, কিন্তু বিষ্ণু, বা শিব, কৃষ্ণ বা রামের উল্লেখ নাই। উপরি উক্ত দেব-সমূহের বর্ণনা থাকিলেও মনুসংহিতায় এক ঈশ্বরের কথা বারম্বার উল্লেখ আছে, তিনিই অন্য দেব, মনুষ্য ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা; নিরূপিত সময় অতিবাহিত হইলে তাঁহাতেই সমস্ত লীন হইয়া যাইবে। এই বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঐই কালের হিন্দুদিগের মধ্যে দুইটি ধর্ম্ম এককালে প্রচলিত ছিল। সামান্য লোকেরা

বহুদেবে বিশ্বাস করিত ও বহুদেব পূজা করিত। ব্রাহ্মণগণ সেই পূজার ফলভোগী হওয়ায় সেইরূপ বহু-দেব-পূজা-কার্য্যে লোককে উত্তেজিত করিত ও তদ্বিষয় পুস্তকে বর্ণনা করিত। তথাপি পণ্ডিতগণ প্রায়ই একেশ্বরবাদী বা নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, বহুদেবে বিশ্বাস করিতেন না। ভারতবর্ষে যে ষড়্‌দর্শন বিখ্যাত আছে, তাহার আলোচনা বোধ হয়, এই সময়েই আরম্ভ হইয়াছিল। সেই ষড়দর্শনের মধ্যে বেদান্ত একেশ্বরবাদী, সাঙ্খ্য নিরীশ্বরবাদী। বিজ্ঞান সামান্য লোকের পাঠ্য নহে, সুতরাং ষড়্‌দর্শনে বহুদেবতার বিশ্বাস নাই, বহুদেব-পূজার উত্তেজনা নাই।

ফলতঃ সকল দেশেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য বহুদেবে বিশ্বাস করে, পরে কতক দূর সভ্যতা প্রাপ্ত হইলে, সামান্য লোকে পৈতৃক দেবে বিশ্বাস করে, জ্ঞানী লোক প্রকৃতির নানা কার্য্যে একটি প্রণালী—একটি উদ্দেশ্য দেখিতে পাইয়া একেশ্বরবাদী হয়। এইরূপে সক্রেটিসের সময়ের গ্রীকদিগের মধ্যে ও জুলিয়স্‌সিজারের সময়ের রোমীয়দিগের মধ্যে সামান্য লোকগণ পৈতৃক দেবে বিশ্বাস করিত, পণ্ডিতগণ একেশ্বরবাদী ছিলেন।

নারী অন্তঃসত্ত্বা হইলে, সন্তানের জন্ম হইলে, বিবাহ উপলক্ষ ও উপবীতগ্রহণ উপলক্ষে, নানারূপ ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় বিধান আছে। সোমরস ও মন্ত্রের দ্বারা দেবপূজা সাধিত হইত। প্রতিমার কথা দুই এক স্থানে উল্লিখিত আছে, কিন্তু প্রতিমা পূজা নিষিদ্ধ। গোমাংস ভোজনের কোনও নিষেধ নাই, বরং স্পষ্ট অনুমতি আছে। আত্মীয়ের মৃত্যুজনিত

অশুদ্ধি বিমোচনের বিধান আছে, এবং নানা দোষের নানা প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ আছে।

সভ্যতা। গ্রীক রাজা আলেক্‌জাণ্ডর ৩২৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। অনেক গ্রীক পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরও অনেক গ্রীক ভারতবর্ষ দর্শন করেন। তাঁহাদিগের পুস্তক হইতে মহাকাব্য-বর্ণিত সময়ে হিন্দুগণ কত দূর সভ্যতা লাভ করিয়াছিল, তাহা জানা যায়।

গ্রীকগণ সাটি জাতির কথা লিখিয়াছেন। যথা—

(১) ধর্ম্ম ও বিদ্যা-ব্যবসায়ী।

(২) রাজপারিষদ ও কর্ম্মচারী।

(৩) চর বা দূত।

(৪) যোদ্ধা।

(৫) গোমেষ-রক্ষক।

(৬) কৃষক।

(৭) নানা-শিল্প-ব্যবসায়ী লোক।

কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, মনু যে চারি জাতি ও মিশ্রজাতির উল্লেখ করিয়াছেন, উপরি উক্ত সাত জাতি তাহারই রূপান্তর মাত্র। ধর্ম্ম ও বিদ্যাব্যবসায়ী ও রাজপারিষদ ও কর্ম্মচারীগণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহ নহে; তবে কতক ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম ও বিদ্যা অনুশীলন করিত, কেহ কেহ রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিত, সুতরাং বিদেশীয় দর্শক ক্রমক্রমে দুই সম্প্রদায়কে দুই জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। যোদ্ধা-গণ ক্ষত্রিয়। গোমেষরক্ষক ও কৃষক মনুবর্ণিত বৈশ্য, শূদ্র

হইবে, এবং শিল্পব্যবসায়ী মনুবর্ণিত মিশ্রজাতি। গুপ্তচর ও দূতদিগকে গ্রীকগণ ভ্রমক্রমে একটি ভিন্ন জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। উপরি উক্ত গ্রীক-বিবরণে দাসের নামোল্লেখ মাত্র নাই, বরং আরীয়ান স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে দাস নাই, সকলেই স্বাধীন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিন শতাব্দী পূর্ব্বখ্রীষ্টাব্দে শূদ্রগণ আর দাস ছিল না, তাহারা নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া মিশ্রজাতির মধ্যে গণ্য হইয়া স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিত।

বিদ্যা ও ধর্ম্মব্যবসায়ী (অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ) সকল জাতি অপেক্ষা সম্মানিত ও সকল রাজকর হইতে মুক্ত কেবল উপাসনা দ্বারা রাজ্যের সহায়তা করিত। বনে বাস করিয়া ও তৃণশয্যায় বা পশুচর্ম্মে শয়ন করিয়া অল্পাহারী হইয়া তাহারা বহুপরিশ্রমে গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। সপ্তত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপে অতিবাহন করিত। যাগ যজ্ঞে ও পূজাকর্ম্মে তাহাদিগের অবিভক্ত অধিকার ছিল।

তাহারা কখন কখন একটি গ্রাম অধিকার করিত ও বিপদের সময় সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করিত। রাজ্য-কার্য্যে সর্ব্বদাই তাহারা হস্তক্ষেপ করিত।

গ্রীকগণ কঠোর তপস্যার অনেক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছে। আলেকজাণ্ডরের এক জন অনুচর তাঁহার আজ্ঞানুসারে কয়েক জন তাপসকে দেখিতে গিয়াছিলেন। দেখিলেন নগর হইতে এক ক্রোশ দূরে পনর জন তাপস উলঙ্গ হইয়া রৌদ্রের উত্তাপে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে। কেহ দণ্ডায়মান হইয়া কেহ উপবেশন করিয়া কেহ শয়ন করিয়া আছে।

কিন্তু সকলেই প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট হইয়াছিল। অন্যান্য গ্রীকগণ অন্যান্য তাপসগণকে দেখিয়াছিল। যখন তাপসগণ নগরের ভিতরে আসিত তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক দোকান হইতে ফল মূল লইয়া আহার করিত তৈল লইয়া শরীর সিক্ত করিত ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়া একত্র আহার করিত যে স্থানে যাইত সে স্থানেই সম্মানিত হইত। কেহ কেহ শীতে ও গ্রীষ্মে উলঙ্গ হইয়া থাকিত ও বটবৃক্ষতলে রজনী অতিবাহন করিত।

সে সময়ে ভারতবর্ষে অনুমান এক শত অষ্টাদশটি স্বাধীন রাজ্য ছিল সুতরাং অধিকাংশ রাজ্যগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে যেরূপ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও সেইরূপ ক্ষেত্র-বেষ্টিত গ্রামের দ্বারা ভারতবর্ষ আচ্ছাদিত ছিল। সে সময়ে গ্রামস্থ লোক নিজ নিজ গ্রামের সমস্ত ব্যাপার নিজে নিজে নিষ্পন্ন করিত ও বিপদের সময় সমস্ত গ্রামবাসীগণ একত্র হইয়া যেরূপ অপরিসীম সাহস প্রদর্শন করিয়া গ্রাম রক্ষা করিত তাহা দেখিয়া গ্রীকগণ বিস্মিত হইয়াছিল।

হিন্দুদিগের সৈন্যসংখ্যা অনেক ছিল। পুরু নামক যে সামান্য হিন্দুরাজা আলেক্‌জাণ্ডরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহার দ্বিশত হস্তী ত্রিশত রথী চারি সহস্র অশ্বারোহী ও ত্রিংশৎ সহস্র পদাতিক ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধশিবিরে চারি লক্ষ লোক ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। সৈন্যগণ সকলেই ক্ষত্রিয় এবং রাজার নিকট কি যুদ্ধ কি শান্তি সকল সময়েই বেতন পাইত। সকল সৈন্যের ভৃত্য থাকিত। সৈন্যগণ কখনও দেশের অনিষ্ট করিত না; দুই পক্ষে মহাযুদ্ধ

হইতেছে, এরূপ সময়ে, নিকটস্থ কৃষকগণ নির্ভয়ে চাষকার্য্য করিত।

সমস্ত এশিয়াতে যত শত্রুর সহিত আলেক্জাণ্ডর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হিন্দুগণ সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, এ কথা গ্রীকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে। সৈন্যগণ দীর্ঘ ধনু হস্ত ও পদ দ্বারা ব্যবহার করিত এবং চারি হস্ত দীর্ঘ তীর নিক্ষেপ করিতে পারিত, এতদ্ভিন্ন তাহারা দীর্ঘ খড়্গ ও লৌহ-বর্শা ব্যবহার করিত।

দেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। হাইদাস্পীস্ ও হাইপেসিস্ (সিন্ধু নদের দুইটি শাখা) নদীর মধ্যে ১৫০০ নগর ছিল, তাহার মধ্যে কোনটিও এক ক্রোশের অনধিক ছিল না। পাটলীপুত্র দীর্ঘে চারি ক্রোশ ও প্রস্থে প্রায় এক ক্রোশ ছিল, তাহার চারি দিকে গভীর গড়খাই ও উন্নত প্রাচীর ছিল; সে প্রাচীরে ৫৭০টি উন্নত স্তূপ (tower) এবং ৬৪টি দ্বার ছিল। অনেক বন্দর ও বাণিজ্যস্থান ছিল এবং বাণিজ্য উন্নতিশীল ছিল।

স্বয়ং রাজা এবং তাঁহার কর্ম্মচারীগণ বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কৃষক, শ্রমজীবী ও বণিক, এই তিন শ্রেণী হইতে কর আদায় হইত। ভূমির উৎপন্নের চতুর্থাংশের একাংশ রাজা গ্রহণ করিতেন। গ্রামের মণ্ডল ভূমি পরিমাপ করিতেন, ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জল বিতরণ করিতেন, গ্রামস্থ লোকদিগের মধ্যে বিচার করিতেন, সকল প্রজার কর একত্র করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন, ব্যবসার উপর দৃষ্টি রাখিতেন, পথ সংস্কার করিতেন, এবং সীমা স্থির রাখিতেন।

এক্ষণকার ন্যায় সে সময়েও দুই বার ফসল কাটা হইত, এবং এক্ষণে যে যে শস্য কাটা হয়, প্রায় সেই সেই শস্যই কাটা হইত। ক্ষেত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইত এবং জলধারণের জন্য চারি দিকে "আইল" প্রস্তুত হইত। ইক্ষু, তুলা ও গন্ধদ্রব্য উৎপন্ন হইত। হিন্দুগণ সুন্দর সুন্দর রং প্রস্তুত করিত, তাম্রপাত্র সর্ব্বদা ব্যবহার করিত, পিত্তলপাত্র ক্ষণভঙ্গুর মনে করিয়া সর্ব্বদা ব্যবহার করিত না। রাজপথের দূর-নির্ণয় করণার্থ প্রস্তর (mile stones) প্রোথিত থাকিত।

যুদ্ধে অশ্বে রথ টানিত; দুই একটি হস্তীর রথও ছিল। হস্তীগণকে এক্ষণে যেরূপে ধরে, সে সময়েও সেইরূপে ধরিত।

বিজ্ঞানশাস্ত্রে হিন্দুদিগের এই সময়ে বিশ্বাস আমরা গ্রীকপ্রমুখাৎ জানিতে পারি। তাহারা বলিত, পৃথিবী গোলাকার ও ঈশ্বরসৃষ্ট ও ঈশ্বর দ্বারা শাসিত, পৃথিবী জল হইতে সৃষ্ট হইয়াছে; চারি ভূত ভিন্ন অন্য একটি ভূত আছে, এবং সেই ভূত হইতে গগন ও নক্ষত্র সৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থান ধারণ করে এবং আত্মা অমর।

গ্রীকগণ হিন্দুদিগের উৎসবের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছে। সুবর্ণ ও রৌপ্যবিভূষিত হস্তী, চারি অশ্বের শকট, বলদের শকট এবং শিক্ষিত সেনা ধীরে ধীরে চলিত। সুবর্ণমণ্ডিত আধার, নানাপ্রকারের বৃহৎ পাত্র, উচ্চ সিংহাসন, নানাপ্রকার বহুমূল্য রত্ন, নানাবর্ণরঞ্জিত ও সুবর্ণকারুখচিত বহুমূল্য বস্ত্র উৎসবের শোভা বর্দ্ধন করিত। পোষিত সিংহ ও ব্যাঘ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিত, নানারূপ সুন্দর ও সুবেশ পক্ষী বৃক্ষের উপর বসিয়া থাকিত, ও সেই বৃক্ষ বৃহৎ বৃহৎ শকটে নীত হইত।

বিবাহের সময় অর্থ আদত্ত বা প্রদত্ত হইত না। নারীগণ পতিব্রতা ছিলেন। বিধবার চিতারোহণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু এরূপ ঘটনা অধিক হইত না।

কেবল প্রাসাদে নহে, মৃগয়ার সময়েও রাজার সঙ্গে সঙ্গে দাসীগণ যাইত। অন্য লোকে তাহাদিগকে দেখিতে বা তাহাদিগের নিকটে আসিতে পারিত না।

হিন্দুগণ একখানি কার্পাস-বস্ত্র পরিধান করিত, একখানি চাদর দ্বারা গাত্র আবরণ করিত। নানারূপ ছিট ও অলঙ্কারও পরিধান করিত। তাহারা শ্মশ্রু রঞ্জিত করিত, প্রত্যেকে নিজের অন্ন প্রস্তুত করিত, এবং ধান্য-মদিরা ভিন্ন অন্য কোনও মদিরা ব্যবহার করিত না। ধান্যের মদিরাও অতি অল্প সেবিত হইত।

হিন্দুগণ কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ, সুন্দর ও কার্য্যপটু ছিল; সাহসে তাহাদের তুল্য জাতি এশিয়াতে গ্রীকেরা দেখে নাই। তাহারা পানাসক্ত ছিল না, মিতব্যয়ী ও শান্ত ছিল, যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যে তৎপর ছিল, সরলস্বভাব ও ন্যায়পরায়ণ ছিল। গ্রীকেরা আরও বলে যে, হিন্দুগণ এরূপ ন্যায়পরায়ণ ছিল যে, বিচারদ্বারে যাইত না, এত সৎ ছিল যে, দ্বারে কুলুপ আবশ্যক ছিল না, চুক্তিবাক্য কাগজে লিখিবার আবশ্যক ছিল না।

গ্রীকগণ আরও বলে, কোনও হিন্দু কখনও মিথ্যা কথা কহিত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধধর্ম্মের উৎকর্ষের সময়।

অনুমান ২৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৬ পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

বুদ্ধ। খৃষ্টের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে আধুনিক অযোধ্যার উত্তরে, নেপালের দক্ষিণে কপিলবস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজা গৌতমকুলজ ও শাক্যবংশীয় ছিলেন, ও রাজা সুপ্রবুদ্ধের দুহিতা মায়াদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগেরই সন্তান ও ঐ রাজ্যের রাজধানী কপিল-বস্তুনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুল ও বংশের নাম হইতে শাক্য ও গৌতম নামে জগতে প্রসিদ্ধ আছেন। বুদ্ধের জন্মের সাত দিন পরে তাঁহার মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হয়, এবং বুদ্ধের বিমাতা (যিনি মায়াদেবীর সহোদরা ছিলেন) শিশুকে লালন পালন করেন। বালক অল্প বয়স হইতে অতিশয় চিন্তাশীল ছিলেন, এবং সর্ব্বদা নির্জ্জন কাননে বসিয়া চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন। কালক্রমে তিনি দণ্ডপাণির লাবণ্যময়ী কন্যা গোপাকে বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁহার তত্ত্ব-বিষয়ক চিন্তা দূরীভূত হইল না। বার্দ্ধক্য, জরা ও মৃত্যু দেখিয়া তিনি ভাবিতেন, এবং এই সমস্ত অনিষ্ট হইতে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করিতেন। অবশেষে তিনি এক জন ভিক্ষু যোগী পুরুষের শান্ত নিশ্চিন্ত জীবন দেখিয়া স্বয়ং নিশীথে পৈতৃক রাজবাটী ত্যাগ করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

প্রথমে বৈশালী দেশে যাইয়া এক জন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের শিষ্য হইলেন; সেই ব্রাহ্মণের আরও তিন শত শিষ্য ছিল। তথায় বিদ্যালাভ করিয়া মগধের রাজধানী রাজগৃহে অন্য এক ব্রাহ্মণের শিষ্য হইলেন। সেই ব্রাহ্মণের সপ্ত শত শিষ্য ছিল। এই ব্রাহ্মণের অর্জ্জিত বিদ্যায় ক্ষত্রিয়-জ্ঞানার্থীর উদ্দেশ্যসাধন হইল না, শান্তিলাভ হইল না। তখন তিনি উরুবিল্ব গ্রামের নিকট একটি নির্জ্জন স্থানে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ব্রাহ্মণ-নির্দ্দিষ্ট তপস্যায় শান্তিলাভ হইল না, উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন হইল না; তখন তিনি তপস্যা ত্যাগ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে বুদ্ধদেব জ্ঞান লাভ করিলেন এবং তখন "বুদ্ধ" নাম গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ বিখ্যাতনামা বারাণসীধামে আসিয়া জগৎকে সেই জ্ঞান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দুই সহস্র বৎসর পর অদ্য জগতের মধ্যে পঞ্চাশৎ কোটি মনুষ্য ক্ষত্রিয়-গুরুর এই জ্ঞানোপদেশ ও ধর্ম্ম অবলম্বন করে।

মগধরাজ বিম্বসার বুদ্ধদেবকে স্বদেশে আহ্বান করিলে, বুদ্ধ সেই রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহে পুনরায় গমন করিলেন ও তথায় উপদেশ দিতে লাগিলেন। পরে রাজপুত্র অজাতশত্রু যখন পিতাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং রাজ্যলাভ করিলেন, তখন বুদ্ধ সে দেশ ত্যাগ করিলেন। পরে কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীনগরে বাস করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। কথিত আছে, ঐ দেশের রাজা প্রাসেনজিৎ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসর পরে বুদ্ধ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া, পিতার সহিত

সাক্ষাৎ করিলেন ও আপন রমণী প্রভৃতি অনেক স্ত্রী ও পুরুষকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী করিলেন। সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তিনি রাজগৃহ পুনরায় দর্শন করেন। কথিত আছে, মগধরাজ অজাতশত্রু স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ইহার পর বৈশালীনগর দর্শন করিয়া কুশীনগরাভিমুখে যাত্রা করেন, ও সেই নগরের নিকটে আসিয়া একটি বনে প্রাণত্যাগ করেন। অনুমান ৫৫০ পূঃখ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। শাক্যমুনি-প্রচারিত ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম নামে, ও শাক্যমুনি স্বয়ং গৌতমবৌদ্ধ নামে জগতে খ্যাত।

বৌদ্ধধর্ম্ম। বেদবর্ণিত কালের শেষে ক্ষত্রিয়গণ একবার ব্রাহ্মণপ্রাধান্য অস্বীকার করিয়াছিল; ক্ষত্রিয় বুদ্ধদেব দ্বিতীয় বার ব্রাহ্মণপ্রাধান্য অস্বীকার করিয়া সকল মনুষ্যের সমতা প্রচার করিলেন। বৌদ্ধগণ বেদ মানে না, হিন্দু-দেবদিগকে মানে না, জাতিবিচ্ছেদ মানে না। সকল মনুষ্যই সমান, সকল শ্রেণী হইতে পুরোহিত হইতে পারে, বৌদ্ধধর্ম্ম এই মহৎ ও উন্নত শিক্ষা দান করে।

এক জন্মের পর অন্য জন্ম হয়, তাহার পর পুনরায় জন্ম হয়, বৌদ্ধদিগের এইরূপ বিশ্বাস। যাঁহারা এইরূপ বহুজন্মে আপনাদিগের কার্য্য ও ধর্ম্মবলে অবশেষে নিশ্চেষ্ট নিস্পৃহ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই "বুদ্ধ"। এইরূপ বুদ্ধপদ সময়ে সময়ে অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; শাক্যমুনি শেষ "বুদ্ধ"; তিনি এ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন বটে, তথাপি তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের কর্ত্তা ও পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই পদে থাকিবেন।

বৌদ্ধদিগেরে মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব

অস্বীকার করে। আবার কোন কোন সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কহে, ঈশ্বর "বুদ্ধ" দিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, "বুদ্ধ" হইতে "বোধিসত্ব' দিগেব উৎপত্তি, "বোধিসত্ব" হইতে জগতের উৎপত্তি হয়। এইরূপ নানা সম্প্রদায়ের নানারূপ মত আছে।

বৌদ্ধ পুবোহিতগণ মঠে বাস করেন ও চিবজীবন অ-বিবাহিত থাকিয়া ধর্ম্মের আলোচনা কবেন। তাঁহাদিগকে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী কহে। সকল শ্রেণীব লোকই ধর্ম্মব্যবসায় অবলম্বন কবিয়া ভিক্ষু হইতে পারে। তাঁহাবা হবিদ্রা-পবিচ্ছদ পরিধান করেন, মস্তক মুণ্ডন কবেন, ও অনাবৃত পদে গমনাগমন করেন। প্রাণীমাত্রেব প্রতি বৌদ্ধদিগেব অতিশয় স্নেহ। তঁহোবা কদাচ প্রাণীহত্যা কবেন না। পাছে খাদ্যের সহিত কোন ক্ষুদ্র জীব উদবসাৎ হয়, এই ভযে বৌদ্ধপুবোহিত সন্ধ্যার পর অন্ধকারে ভোজন কবেন, উপবেশনকালে সযত্নে স্থান পবিষ্কার করিয়া উপবেশন কবেন, ও কেহ কেহ নাসিকা ও মুখের উপর সর্ব্বদা একখানি বস্ত্র বাঁধিয়া রাখেন।

ভারতবর্ষ হইতে এই ধর্ম্ম তিবোহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু চীন প্রভৃতি অন্যান্য দেশে এই ধর্ম্ম অনেকে অবলম্বন করে। ফলতঃ জগতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোক যত আছে, হিন্দু বা খৃষ্টীয় বা মহম্মদীয় বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক তত নাই।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মপুস্তক। বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক তিন অংশে বা "পিটকে" বিভক্ত ও সেই জন্য উহাকে ত্রিপিটক কহে।

(১) বুদ্ধ মুনি স্বয়ং যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে সূত্র কহে।

(২) ধর্ম্মনীতি ও নিয়মাবলিকে নিয়ম কহে।

(৩) বৈজ্ঞানিক আলোচনা সমূহকে অভিধর্ম্ম কহে।

বুদ্ধের মৃত্যুর অনতিপরেই মগধদেশে বৌদ্ধগণ একটি সভায় সমবেত হইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্কলন করে। ইহার এক শত বৎসর পর পাটলীপুত্রে দ্বিতীয় বার ঐরূপ একটি সভা ঐ উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। তৃতীয় একটি সভা হয়, কিন্তু তাহার সময় ঠিক জানা যায় না, কেহ বলেন, অশোক রাজার সময়, কেহ বলেন, কাশ্মীরের কনিষ্ক রাজার সময় (৪০ খৃঃ অব্দ) এই তৃতীয় সভা সমবেত হইয়াছিল। এই সভায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মপুস্তক পবিশুদ্ধ হইয়া যে আকার ধারণ করিল, অদ্যাবধি তাহার সেই আকার আছে।

এই ধর্ম্মপুস্তক প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়, খৃষ্টের পর পঞ্চ শতাব্দীতে পালি ভাষায় অনুবাদিত হয়। পালি অনুবাদই সিংহল প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রদেশে প্রচলিত। বৌদ্ধ-ধর্ম্মপুস্তক রাখা ব্রাহ্মণদিগের অভিমত না হওয়ায় প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে সংস্কৃত ত্রিপিটক বিলুপ্ত হইয়াছিল; সম্প্রতি নেপালের রেসিডেণ্ট বি, এইচ, হজসন্ সাহেব এই পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া এই অমূল্য নিধির উদ্ধার সাধন করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের একটি ফল। হিন্দুধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া শাক্য মুনি মনুষ্যের সমতা ও সর্ব্বজীবের প্রতি অহিংসা প্রচার করিলেন; তাঁহার এই মহামন্ত্রে যেন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন নূতন বলে বলিষ্ঠ হইল। ধর্ম্মবিপ্লব চিন্তাবিপ্লব ভিন্ন আর কিছুই নহে; মনুষ্যের হৃদয় আলোড়িত হয়; পূর্ব্বসংস্কার দূর হয়; নূতন সংস্কারের আবির্ভাব হয়; মন নব বলে বলিষ্ঠ

হয়। "ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" এই চিরকিম্বদন্তীতে যাহারা উৎপীড়িত ছিল, ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে ও সমাজে জাতিঘটিত অসমতা বশতঃ যাহারা অসন্তুষ্ট ছিল, তাহারা শাক্য মুনির মহৎ উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিল; সকল মনুষ্য সমতুল্য, এই উদার বাক্যে উত্তেজিত ও প্রোৎসাহিত হইল। ভারতবর্ষে হুলস্থূল পড়িয়া গেল; অনেক রাজ্যে হিন্দুধর্ম্ম লোপ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইল; অনেক রাজ্যে দুইটি ধর্ম্মে দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। ধর্ম্মের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যবিপ্লব ঘটিল; মনের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার উৎকর্ষ ঘটিল; চিন্তার উদারতা ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের উদারতা ও বিস্তার ঘটিল; অবশেষে মগধ দেশের রাজগণ প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত একচ্ছত্র করিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত ইহার পূর্ব্বে কখন একচ্ছত্র হয় নাই; ভারতবর্ষের এই ঐক্যসাধন বৌদ্ধধর্ম্মের একটি ফল মাত্র।

খৃষ্টের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই ধর্ম্ম প্রচার হইলেও ২৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দে মহারাজ অশোকের রাজত্বের পূর্ব্বে এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় নাই।

খৃষ্টের চারি শত বৎসর পরে চীন দেশীয় ভ্রমণকারীগণ ভারতবর্ষে আসিয়া গঙ্গা ও যমুনা-কূলে বৌদ্ধধর্ম্মের অতিশয় হীনাবস্থা দর্শন করেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের হ্রাস ও পৌরাণিক ধর্ম্মের উন্নতি তাহার চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে, অর্থাৎ রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এরূপ উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব অশোকের সময় হইতে বিক্রমাদিত্যের সময় পর্য্যন্ত (২৫০-৫৬ পূঃ খৃষ্টাব্দ) দুই শত বৎসর বৌদ্ধধর্ম্মের উৎকর্ষের সময় বলিয়া বর্ণিত হইতেছে। ক্রমে হীনা-

হ্রস্থাপন্ন হইলেও বৌদ্ধধর্ম্ম মুসলমান-বিজয়ের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত কাশী, গুর্জ্জর প্রভৃতি ভারতবর্ষেব স্থানে স্থানে প্রচলিত ছিল।

মগধরাজ্য। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচাবের কারণ মগধ-রাজ্য ভারতবর্ষেব অন্যান্য বাজ্য অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ কবিল। সৌভাগ্যবশতঃ আমরা এই বাজ্যেব ইতিহাসেব কতক কতক অবগত আছি।

কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধেব শেষে, অর্থাৎ অনুমান ১৪০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে সহদেব মগধদেশেব বাজা ছিলেন। তাঁহাব পব ত্রয়স্ত্রিংশৎ রাজা ক্রমান্বযে বাজসিংহাসনে আবোহণ কবেন; পবে অনুমান ৫৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দে অজাতশত্রু এই বাজ্যেব অধীশ্বর ছিলেন, এবং তাঁহারই বাজ্যকালে শাক্য মুনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার কবেন।

অজাতশত্রুব পব আব চাবি জন বাজা ক্রমান্বযে রাজ্যশাসন কবিলে পব অনুমান ৪০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে নন্দ সিংহাসনে আবোহণ করেন। নন্দেব পূর্ব্বেব সমস্ত বাজগণ ক্ষত্রিয়বংশীয় ছিলেন, কিন্তু নন্দ শূদ্রমাতাব সন্তান ছিলেন।

নন্দেব পব আব আট জন বাজা বাজত্ব করেন, তাঁহাদের সকলেবই নাম নন্দ। তৎপবে চন্দ্রগুপ্ত অনুমান ৩০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে বাজ্য কবেন। চন্দ্রগুপ্ত নীচবংশীয় বলিযা জনশ্রুতি আছে এবং তিনি যে উপাযে কৌটিল্য বা চাণক্যের সহাযতাব রাজ্যলাভ কবেন, তাহা কল্পিত গল্পেব সহিত মিশ্রিত হইয়া মুদ্রারাক্ষসে বর্ণিত আছে। কথিত আছে যে, চন্দ্রগুপ্তেব মাতার নাম মুরা, সেই জন্য তাঁহার বংশ মৌর্য্যবংশ বলিযা খ্যাত।

চন্দ্রগুপ্ত চতুর্ব্বিংশ বৎসব রাজত্ব করেন; তৎপরে তাঁহার পুত্র ভদ্রসার বা বিন্দুসার পঞ্চবিংশ বৎসর রাজত্ব করেন; তৎপরে

অনুমান ২৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দে বিন্দুসারের পুত্র মহাবলপরাক্রান্ত অশোকবর্দ্ধন বা অশোক মগধের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রসিদ্ধনামা অশোক সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত আপন শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না, কিন্তু তিনি অন্য সমস্ত রাজ্য ও রাজাকে আপন প্রভুত্ব স্বীকার করাইযাছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। দেশের সুশাসনের জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন, এবং সকল লোক সেই নিয়ম জানিতে পারে ও পালন করিতে পারে এই অভিপ্রায়ে, তিনি সেই নিয়মাবলি বহুসংখ্যক প্রস্তরে খোদিত করিয়া, সেই প্রস্তর আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান প্রধান স্থানে ও নগরীতে স্থাপিত করেন। আর্য্যাবর্ত্তের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত এখনও স্থানে স্থানে সে স্তূপ দেখা যায। অশোক রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন, এবং ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক লোককে সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করান। বস্তুতঃ তাঁহার সময়ে হিন্দুধর্ম্ম ভারতবর্ষে বিলুপ্তপ্রায় ও বৌদ্ধধর্ম্ম অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে।

মৌর্য্যবংশ দশ পুরুষ পর্য্যন্ত মগধরাজ্যে রাজত্ব করেন; পরে অন্যান্য বংশীয় রাজগণ এই রাজ্যে রাজত্ব করেন। কিন্তু মগধ আর ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিল না। বৌদ্ধধর্ম্মও ক্রমে হীনবল হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ও পৌরাণিক ধর্ম্মের উৎকর্ষের সময়।

৫৭ পূঃ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

ধর্ম্মপ্রণালী। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে কয়েক শতাব্দী মাত্র প্রচলিত ছিল। পরে হিন্দুধর্ম্ম যেন পুনরায় সবলতা লাভ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় একবারে তিরোহিত হইল। কেবল হিন্দুধর্ম্ম পুনঃস্থাপন হইল, তাহা নহে, বোধ হইল, যেন ধর্ম্মের বন্ধনীশক্তি শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, পূজা ও দেবসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, প্রতিমাপূজা ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল। ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠে ও ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনায় অবিভক্ত অধিকার লাভ করিল, অসীম ক্ষমতা লাভ করিল, নূতন নূতন দেবতা, নূতন নূতন পূজার আবিষ্কার হইতে লাগিল পুরাণের পর পুরাণ, তন্ত্রের পর তন্ত্র রচিত হইল, দেবসম্বন্ধীয় সুন্দর উপন্যাসের পর সুন্দর উপন্যাস রচিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চিন্তাপটু বুদ্ধদেব ও তাঁহার বন্ধুগণ একবার সকল মনুষ্যের সমতা প্রচার করিয়াছিলেন; এ বার ব্রাহ্মণেরা পুনরায় ক্ষমতা লাভ করিয়া যেন চিন্তাশক্তি একবারে তিরোহিত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সকল জাতির শাস্ত্র আলোচনা ও ধর্ম্মশিক্ষা নিষেধ করিল ও নূতন, নূতন শাস্ত্র ও পুরাণ ও নূতন নূতন নিয়ম সৃষ্টি করিয়া ভারতবর্ষের ধর্ম্মশিক্ষা-বিহীন

অধিবাসীগণকে আপন আয়ত্তাধীন, আপন দাসত্বাধীন করিল। প্যাছে এই পুরাণগুলি আধুনিক বলিয়া কেহ অগ্রাহ্য করে, এই ভয়ে পুরাণগুলি বেদব্যাসরচিত বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিল। এইরূপে ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীন চিন্তা-ক্ষমতা তিরোহিত হইল; পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের সহিত অসংখ্য দেবদেবীর পূজা ও ব্রাহ্মণদিগের অবিভক্ত অসীম ক্ষমতা স্থাপিত হইল।

পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রণালী সকলেই অবগত আছেন। ব্রহ্মা ও তাঁহার পত্নী সরস্বতী, লক্ষী ও তাঁহার স্বামী বিষ্ণু ও বিষ্ণুর দশ অবতার, মহাদেব ও তাঁহার পত্নী দুর্গা, ইন্দ্র ও শচী, যম, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ সকল পাঠকেরই পরিচিত আছেন। যদিও হিন্দুমাত্রেই বেদকে সমাদর ও সম্মান করে ও হিন্দুধর্ম্মের আদিগ্রন্থ বলিয়া মানে, তথাপি অধুনা ভারতবর্ষে যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহা বেদসঙ্গত নহে, পুরাণ ও তন্ত্রসঙ্গত।

উজ্জয়িনী রাজ্য।—৫৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে উজ্জয়িনী রাজ্যে মহাবল পরাক্রান্ত বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করেন। তাঁহার সময় হইতে সংবৎ শক প্রচলিত হইয়াছে। কথিত আছে, মহাকবি কালিদাস এই রাজার এক জন সভাসদ্ ছিলেন। কিন্তু বোধ হয়, কালিদাস খৃষ্টের জন্মের তিন চারি, কি পাঁচ শত বৎসর পরে উজ্জয়িনীর অন্য এক বিক্রমাদিত্য রাজার সভার সভাসদ ছিলেন।

গৌড় রাজ্য।—মহাভারতে এই রাজ্যের উল্লেখ আছে, সুতরাং খৃষ্টের পূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ আর্য্যদিগের অধিকৃত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর সময়ে অর্থাৎ অনুমান ৫৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দে

বঙ্গদেশেব রাজা সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়সিংহ প্রজাপীড়ন-দোষে নির্ব্বাসিত হইয়া সপ্তশত সেনা লইয়া, অর্ণবপোতে সমুদ্র-যাত্রা করেন ও লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হইয়া, সেই দ্বীপ জয় করেন। বিয়জসিংহের মৃত্যুব পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস বঙ্গদেশ হইতে যাইয়া লঙ্কার সিংহাসনে আবোহণ করেন। তিনিই সিংহলের রাজবংশের আদিপুরুষ। সিংহবংশ হইতে লঙ্কাদ্বীপ সিংহল নাম ধাবণ করিয়াছে।

উপরি উক্ত বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, দ্বিসহস্র বৎসব পূর্ব্বে বঙ্গবাসীগণ পবাক্রান্ত ও বাণিজ্যপটু ছিল। খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্তি অর্থাৎ তমলুক একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল, ও তথাকার বণিকেবা সর্ব্বদা সমুদ্রে গমন কবিয়া সিংহল প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য কবিত। সমস্ত বঙ্গদেশ কখনও একটি রাজ্য ছিল বলিয়া বোধ হয না; ফলতঃ স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল বলিযাই উপলব্ধি হয়। খৃষ্টেব সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তৈলঙ্গবতী, ত্রিপুবা, শ্রীহট্ট, কিরণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল।

খৃষ্টের অষ্টম শতাব্দীতে “পাল” নামধাবী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী একটি পরাক্রান্ত বংশ বঙ্গদেশের বাজা হয়েন। ভূপাল বা লোকপাল এই বংশেব আদিপুরুষ। তাঁহার পৌত্র দেবপাল অনেক রাজ্য জয় করিয়া সমুদয় ভারতেব সম্রাট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। দিনাজপুর, বুদ্ধ গয়া, বারাণসী প্রভৃতি অনেক স্থানে পালবংশীয় রাজাদিগের অনেক কীর্ত্তি এখনও দেখা যায়; দিনাজপুরের মহীপালদীঘি মহীপাল রাজার খনিত।

যে সময়ে পালবংশীয় হিন্দু বৌদ্ধ নৃপতিগণ বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন, সেই সময়ে সেনবংশীয় রাজারা পূর্ব্ববঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন; কালক্রমে এই দুই বংশে বিরোধ হইল। ভারতবর্ষের অন্য স্থানে যেরূপ, বঙ্গদেশেও সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয় ও হিন্দুধর্ম্মের জয় হইল, ও সেনবংশ বঙ্গদেশের রাজা হইলেন। খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে এই বংশের প্রথম রাজা আদিশূর (তাঁহার প্রকৃত নাম বীরসেন বা শূরসেন) হিন্দুধর্ম্মের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইলেন, ও সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ জন কায়স্থ আসিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের প্রধান ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ এই দশ জনের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয; কিন্তু এটি অলীক কথা; কেবল দশ জনের এত সন্তান হওয়া সম্ভব নহে। পাঁচ জন ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রীহর্ষ নৈষধচরিত নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ও ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার রচনা করিয়াছিলেন।

কৌলিন্যপ্রথা আদিশূর প্রচারিত করেন নাই; তাঁহার এক জন উত্তরাধিকারী বল্লালসেন এই প্রথার প্রণেতা। তিনি ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন ও প্রশস্ত রাজ্যকে রাঢ় (বর্দ্ধমানবিভাগ), বরেন্দ্র (রাজশাহী ও কুচবিহার বিভাগ) বঙ্গ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ), বাগড়ী (প্রেসিডেন্সি বিভা)গ, ও মিথিলা (উত্তর বিহার), এই পাঁচ ভাগে বিভাগ করেন। এই দেশবিভাগ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ হইয়াছে। সুবর্ণগ্রাম, গৌড় ও নবদ্বীপ এই তিনটি বল্লালের রাজধানী ছিল।

বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে জয়দেব গীত-

গোবিন্দ রচনা করেন। তাঁহার পর মাধবসেন ও কেশব সেন যথাক্রমে রাজত্ব করেন। পরে ১১২৩ খৃষ্টাব্দে লাক্ষ্মণেয় জন্মগ্রহণ করেন ও ভূমিষ্ঠ হইয়াই বঙ্গদেশের রাজা হইলেন। তাঁহার অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সেনাপতি বখ্‌তীয়ার খিলজী নবদ্বীপ ও বঙ্গদেশের অধিকাংশ জয় করিলেন। এইরূপে হিন্দুরাজ্য বিলুপ্ত হইল।

গুর্জ্জর রাজ্য।—মহাভারত-বর্ণিত যুদ্ধের সময় কৃষ্ণ দ্বারকায় যাইয়া রাজ্য স্থাপন করেন, কিন্তু সেই রাজ্য কত দিন ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। পরে ১৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজা কনকসেন বলভীতে রাজ্য স্থাপন করেন, ও তাঁহার সন্ততিগণ প্রায় চারি শত বৎসর ঐ দেশ শাসন করেন। পরে ৫২৪ খৃষ্টাব্দে পারসীক জাতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, সেনবংশ রাজ্যচ্যুত হইয়া, ঐ দেশ ত্যাগ করিয়া, প্রসিদ্ধ মিবার রাজ্য স্থাপন করেন। মিবার রাজ্য অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

বলভীরাজাদিগের পর চৌররাজগণ গুর্জ্জর দেশ শাসন করেন, ও ৭৪৭ খৃষ্টাব্দে অহ্নলওয়ারা অথবা পত্তনে রাজধানী স্থাপন করিয়া অতিশয় খ্যাতি ও ক্ষমতা লাভ করেন।

৯৩১ খৃষ্টাব্দে এই বংশের শেষ রাজা নিঃসন্তান থাকায়, তাঁহার চালুক্যবংশীয় জামাতা সিংহাসন অধিরোহণ করেন। এই বংশীয় রাজগণ গজনীর মাহমুদ কর্ত্তৃক একবার পরাজিত হইলেও ১২২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে বাঘীল-বংশ রাজা হয়, ও সেই বংশের রাজ্যকালে ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জর দেশ মুসলমান-করকবলস্থ হয়।

কান্যকুব্জ রাজ্য।—মহাভারতের যুদ্ধের সময় এই রাজ্য

পঞ্চাল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মহাভারতে পঞ্চাল রাজ্যের রাজা ও রাজ্যপ্রণালী ও স্বয়ম্বর প্রথা ও সৈন্যসামন্তের অনেক বর্ণনা আছে।

৪৭০ খৃষ্টাব্দে রাঠোরগণ এই দেশ জয় করেন। খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে রাঠোররাজ জয়চন্দ্র কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরায় তাঁহার কন্যাকে হরণ করিয়া পাণিগ্রহণ করায় রাঠোররাজ মুসলমানদিগকে আহ্বান করেন। এই জাতিবিরোধের বিষম ফল ফলিল। শাহাবুদ্দীন ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরায়কে পরাস্ত করিয়া দিল্লী জয় করিলেন ও ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে জয়চন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া কান্যকুব্জ জয় করিলেন। ও অনতিবিলম্বে মুসলমানগণ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিল। রাঠোরগণ কান্যকুব্জচ্যুত হইয়া মাড়বারে যাইয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিল। মাড়বার রাজ্য অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, খৃষ্টের পর সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট ও অষ্টম শতাব্দীতে ভবভূতি কান্যকুব্জ-রাজসভার সভাসদ ছিলেন। ভবভূতি কান্যকুব্জ-রাজ যশোবর্ম্মণের সভার সভাসদ ছিলেন।

দিল্লী ও আজমীর রাজ্য।—মহাভারতের যুদ্ধের সময় আধুনিক দিল্লী হস্তিনাপুর নামে খ্যাত ছিল ও হস্তিনাপুরের কুরুপাণ্ডবদিগের ও সেই সময়ের যুদ্ধপ্রথা, আচার ব্যবহার-বিষয়ক যে বিস্তীর্ণ বর্ণনা আছে, তাহা তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে।

অনুমান সপ্তশত খৃষ্টাব্দে এক রাজপুতবংশ দিল্লী জয় করেন ও ১০৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারাই এই রাজ্য শাসন করেন।

ঐ বৎসরে আজমীরাধিপতি চৌহানবংশীয় বিশালরায় দিল্লী জয় করেন সেই অবধি আজমীর ও দিল্লী বহুকাল পর্য্যন্ত এক-রাজ্যভুক্ত হইয়া থাকে।

আজমীর ও দিল্লী পুনর্বার দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য হইল। দিল্লীতে তোমরকুল ও আজমীরে চৌহানকুল রাজ্য করিতে লাগিলেন। খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে দিল্লীশ্বর নিঃসন্তান থাকায় আজমীরা-ধিপতি পৃথ্বীরায়কে আপন উত্তরাধিকারী বলিয়া মনোনীত করিলেন। সুতরাং আজমীর ও দিল্লী পুনর্বার এক রাজার অধীন হইল।

আজমীর ও দিল্লীর অধিপতি চৌহান পৃথ্বীরায় খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রের কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করেন; সেই জন্য দুই রাজার মধ্যে অতি-শয় শত্রুতা জন্মে। জয়চন্দ্র মুসলমানদিগকে আহ্বান করেন; কিন্তু পৃথ্বীরায় তিরৌরির যুদ্ধে ১১৯১ খৃষ্টাব্দে শাহাবুদ্দীনকে পরাস্ত করিলেন, ও মুসলমানগণ কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দুই বৎসর পরে শাহাবুদ্দীন পুনর্বার পৃথ্বীরায়কে আক্রমণ করি-লেন। এবার পৃথ্বীরায় পরাস্ত ও হত হইলেন। সেই বৎসরেই (১১৯৩) দিল্লী ও আজমীর মুসলমান-হস্তগত হইল।

দক্ষিণাপথ।—দক্ষিণাপথে মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, তৈলঙ্গ, কর্ণাট ও দ্রাবিড, এই পাঁচটি প্রদেশ ছিল। এই পাঁচটি প্রদেশে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল; তাহার বিশেষ বিবরণের আবশ্যকতা নাই।

সভ্যতা।—বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হইল বটে, কিন্তু জগৎ হইতে তিরোহিত হয় নাই। পূর্ব্বেই উল্লিখিত

হইয়াছে যে, অধুনা জগতে প্রায় পঞ্চাশৎ কোটি লোক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অবলম্বন করে। চীনগণ প্রায় সকলেই বৌদ্ধ। ভারতবর্ষ হইতে এই ধর্ম্ম তিরোহিত হইবার অনেক পরেও চীনভ্রমণ-কারীগণ বুদ্ধদেবের জন্মস্থান ও অন্যান্য পবিত্র স্থান দেখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিত। এইরূপে অনেক চীনভ্রমণকারী ভারতবর্ষ সন্দর্শন করিয়া সে সময়ের আচার ব্যবহারের বিষয় লিখিয়া গিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে হুয়েন সাঙ্ নামক এক জন ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহা হইতে আমরা ভারতবর্ষের সে সময়ের সভ্যতার কথা অনেক দূর জানিতে পারি। আমরা হুয়েন সাঙের পুস্তকের সারাংশ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিব।

হুয়েন সাঙ্ ৬২৯ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে যাত্রা করেন। হিন্দু-কুশ পর্ব্বত পার হইয়া তিনি কপিশারাজ্যে প্রবেশ করেন। এক জন ক্ষত্রিয় সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন ও দশটি প্রদেশ শাসন করিতেন। হুয়েন সাঙ্ এই স্থানে ১০০ বৌদ্ধ-মঠ ও ছয় সহস্র মঠবাসী ও বহুসংখ্যক দেবালয় দৃষ্টি করেন। হুয়েন সাঙ্ প্রথমে এই স্থানে অশোকের স্তূপ দর্শন করেন।

গান্ধারপ্রদেশ ও তাহার রাজধানী পুরুষপুর সে সময়ে কপিশারাজ্যের অধীন ছিল। তথায় তিনি এক সহস্র বৌদ্ধমঠ ও বহুসংখ্যক স্তূপ ভগ্নাবস্থায় দেখিলেন, ও হিন্দুধর্ম্মের গৌরব ও বহুসংখ্যক হিন্দু-দেবালয় জনাকীর্ণ দেখিলেন; মহেশ্বরের একটি পবিত্র মন্দির ও নীলপ্রস্তরনির্ম্মিত ভীমার একটি প্রতি-মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই প্রদেশের অধিবাসীগণ কাপুরুষ, কিন্তু শাস্ত্রানুশীলনে তৎপর।

কাশ্মীরপ্রদেশে ক্ষত্রীয়বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, ও এই প্রদেশে হিন্দুধর্ম্মই প্রচলিত ছিল; তথাপি কাশ্মীরে অনেক বৌদ্ধমঠ ছিল। তথায় অনেক বৌদ্ধ পুরোহিতও বাস কবিতেন।

শতদ্রুনদী পার হইয়া আর কযেক স্থান দর্শন করিযা অবশেষে হুয়েন সাঙ্ মথুরায় উপস্থিত হইলেন। মথুরার চাবিদিকে হুয়েন সাঙ্ বৌদ্ধধর্ম্মের হীনতা ও হিন্দুধর্ম্মেব বিশেষ গৌরব দৃষ্টি কবেন। তিনি অনেক স্থানেব বর্ণনা কবিযাছেন। থানেশ্বরে তিনটি মাত্র বৌদ্ধমঠ ও একশত হিন্দুদেবালয ছিল, স্রুঘ্নে ৫টি বৌদ্ধমঠ ও একশত হিন্দুদেবালয ছিল, মতিপূরে শূদ্রবাজা ছিলেন ও হিন্দু-বৌদ্ধদিগেব সংখ্যা প্রায সমান ছিল। ইহা ভিন্ন ব্রহ্মপুব, অহিচ্ছত্র ও বামাযণ-বর্ণিত সাঙ্কাস্তেব বর্ণনা আছে।

কান্যকুব্জ বাজ্যে বাজ্যবর্দ্ধন বাজাব মৃত্যুব পব তাঁহাব কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসন আবোহণ কবেন ও শিলাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া, সমগ্র ভাবতবর্ষে আপন আধিপত্য বিস্তাব কবিয়াছিলেন। বাজধানী দীর্ঘে দুই ক্রোশ ও পার্শ্বে অর্দ্ধ ক্রোশ ছিল, এতদ্ভিন্ন ঐ বাজ্যে বহুসংখ্যক পবিখা ও প্রাচীব-বেষ্টিত নগব ছিল। এই স্থানে একশত বৌদ্ধমঠ ও দ্বিশত হিন্দুদেবালয় ছিল ও বাজা স্বযং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ও বৈশ্য ছিলেন। সমস্ত রাজ্য সমৃদ্ধিশালী ও স্বদেশীয ও বিদেশীয বাণিজ্যে পবিপূর্ণ ছিল।

বুদ্ধদেবনিবসিত সুপ্রসিদ্ধ শ্রাবস্তী ও কপিলবস্তু নগর প্রায জনশূন্য ও ভগ্নাবস্থাপন্ন হইয়াছিল। শ্রাবস্তীর মঠগুলি ভগ্না-

বশেষ হইয়াছিল, কিন্তু হিন্দুদেবালয় বহুসংখ্যক ও জনাকীর্ণ ছিল। কপিলবস্তু বুদ্ধদেবের জন্মস্থান; এই রাজ্যের বিষয় হুয়েন সাঙ্ এইরূপ লিখিয়াছেন—"এই স্থানে দশটি নগর আছে, রাজধানীটি ভগ্ন। রাজধানীর মধ্যস্থ রাজবাটী এককালে দেড় ক্রোশ ব্যাপিয়া ছিল ও সমস্ত ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল; ভগ্নাবশিষ্ট অংশগুলি এক্ষণ পর্য্যন্ত অতিশয় উচ্চ ও শক্ত, কিন্তু বহুকালাবধি পরিত্যক্ত রহিয়াছে। পল্লিগ্রামে লোকসংখ্যা অল্প, দেশে রাজা নাই, প্রত্যেক নগরের এক একটি অধ্যক্ষ আছে। এককালে সহস্র মঠ ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।" বৌদ্ধধর্ম্মের আদি স্থানের দুরবস্থা দেখিয়া বৌদ্ধ-ভ্রমণকারী এইরূপে আক্ষেপ করিয়াছেন।

বারাণসী রাজ্য বহুলোকাকীর্ণ পল্লিগ্রামে পরিপূর্ণ, এবং এই অসংখ্য লোকের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, বৌদ্ধ অতি অল্প। ত্রিংশৎ মঠে তিন সহস্র বৌদ্ধ বাস করিত, এক শত দেবালয়ে দশ সহস্র হিন্দু মহেশ্বরের পূজা করিত। "কেহ মস্তক মুণ্ডন করে, কেহ মস্তকের উপরে কেবল একটি শিখা রাখে ও উলঙ্গ হইয়া ভ্রমণ করে; অন্যান্য লোক পুনর্বার জন্মমৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য গাত্রে ভস্ম মাখে ও কঠোর তপস্যা করে।" বারাণসী নগরে বিংশতিটি অতিসুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত ও রঞ্জিত কাষ্ঠবিভূষিত মন্দির ছিল, তাহার চারিদিকে পত্রপূর্ণ বৃক্ষ ছায়া দান করিত ও পরিষ্কার জল বহিয়া যাইত। যষ্টি-হস্ত দীর্ঘ পিত্তলনির্ম্মিত মহেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ছিল। "তাঁহার আকৃতি গম্ভীর, দেখিলে হৃদয়ে ভয় ও ভক্তির উদ্রেক হয়, ও বোধ হয়, যেন প্রতিমূর্ত্তি জীবিত।" হুয়েন সাঙ্ বারাণসীর

নিকটে সারনাথের হরিণ-উদ্যান সন্দর্শন করিলেন; তথাকার বৌদ্ধমঠে পঞ্চদশ শত বৌদ্ধ বাস করিত।

বৈশালী রাজ্যের রাজধানীও ভগ্নাবশিষ্ট; তাহার পরিধি ছয় কি সাত ক্রোশ। তথায় বহুসংখ্যক ভগ্ন মঠ ছিল, কেবল তিন কি চারিটিতে বৌদ্ধগণ বাস করিত। হিন্দুদেবালয়ের সংখ্যা অনেক অধিক।

মগধে হুয়েন সাঙ্ পঞ্চাশৎ মঠ ও দশ সহস্র মঠবাসী বৌদ্ধ দেখিয়াছিলেন। গঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্বে পাটলীপুত্র নগরের ভগ্ন হর্ম্ম্যাদি সপ্তক্রোশ ব্যাপিয়াছিল, ও তাহার মধ্যে শত শত স্তূপ, ভগ্ন মঠ ও দেবমন্দির দেখা যাইত। গয়ানগরীতে সে সময়ে এক সহস্র ব্রাহ্মণপরিবার বাস করিত। এই স্থানে বুদ্ধদেব ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, সুতরাং বৌদ্ধ-ভ্রমণকারী এই স্থান দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ "বোধী" বৃক্ষ দেখিলেন ও তথা হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণ পর্য্যন্ত অসংখ্য পবিত্র ধর্ম্ম-নিদর্শন দৃষ্টি করেন। এই স্থানে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী আগমন করিত, ও সাত দিন ও সাত রাত্রি সুগন্ধ পুষ্প ও সুশ্রাব্য বাদ্যে বৌদ্ধপূজাদি সম্পাদন করিত। মগধের পুরাতন রাজধানী রাজগৃহ নগর ভগ্নাবশিষ্ট হইয়াছিল, এবং তাহার নিকটে রাজগৃহ বলিয়া নূতন একটি নগর স্থাপিত হইয়াছিল। এই নগরের নিকট নালন্দার মঠ সে সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধিশালী মঠ ছিল। তথায় দশ সহস্র বৌদ্ধ বাস করিত ও সকল শাস্ত্রের আলোচনা হইত। অষ্টাদশ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন দর্শন পঠিত হইত, তাহা ভিন্ন বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসা, শিল্পবিদ্যা,

প্রভৃতি নানা বিদ্যার আলোচনা হইত। শত গ্রামের কর দ্বারা এই মঠের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। হুয়েন সাঙ্ এই মঠে পাঁচ বৎসব থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস কবেন।

পূর্ব্বদিকে আসিয়া হুযেন সাঙ্ পুণ্ড্রবর্দ্ধন (বর্দ্ধমান), কামরূপ (আসাম), তাম্রলিপ্তি (তমলুক) প্রভৃতি স্থান সন্দর্শন করেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধনে ২০ মঠ ও ১০০ দেবমন্দিব ছিল; আসামে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম একবারে অপবচিত। তাম্রলিপ্তিতে দশটি বৌদ্ধ-মঠ ও পঞ্চাশৎ হিন্দু-দেবমন্দির ছিল ও তথা হইতে অর্ণবপোত সর্ব্বদাই সিংহলদ্বীপে গমনাগমন কবিত। তথা হইতে হুযেন সাঙ্ উড়িষ্যা, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ দেখিযা দক্ষিণে গমন করিলেন। উড়িষ্যায এক শত মঠ, ও কেবল পঞ্চাশৎ দেবমন্দিব দেখিলেন, কলিঙ্গে ১০টি মঠ ও দুই শত মন্দির ছিল।

দ্রাবিড়ে একশত মঠ ও ৮০টি দেবমন্দিব ছিল, তথা হইতে মলয়পর্ব্বত পার হইয়া উত্তব দিকে যাইযা মহাবাষ্ট্র দেশে পঁহুছিলেন, ও এই দেশেব সুন্দব বর্ণনা করিয়াছিলেন। হুয়েন সাঙ্ বলেন, এ স্থানেব লোকেরা দীর্ঘকায ও গর্ব্বিত, সৎ ও সরল। তাহাদিগের উপকার কবিলে তাহারা কদাচ বিস্মরণ করে না; কিন্তু কেহ তাহাদিগেব অপকাব কবিয়া তাহাদিগের ক্রোধ হইতে নিস্তার পাইতে পাবে না। যদি কেহ তাহাদিগের অবমাননা করে, মহারাষ্ট্রীয়গণ আপনাদিগের জীবনভয় তুচ্ছ কবিয়া সে অবমাননাব প্রতীকার করে; যদি কেহ বিপদে তাহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে, মহাবষ্ট্রীয়গণ আপনারা বিপদ-গ্রস্ত হইয়াও তাহাকে রক্ষা কবে। অনিষ্ট প্রতীকার করি-

যাব পূর্ব্বে তাহারা শত্রুকে যথাসময়ে সংবাদ দেয়, পবে উভয়ে বর্ম্ম ধাবণ করিয়া বর্শা হস্তে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে মহা-রাষ্ট্রীয়গণ পলাতকেব পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু যাহাবা আপনা-দিগকে বন্দী স্বীকাব করে, তাহাদিগকে হত্যা করে না। যুদ্ধে কোন সেনাপতি পবাস্ত হইলে, মহাবাষ্ট্রীয়গণ তাহাকে কায়িক ক্লেশ দেয না, কিন্তু স্ত্রীলোকেব পরিধান পরায় এবং এরূপ লজ্জা দেয যে, সে আত্মহত্যা কবে। বাজ্যে সর্ব্বদাই কয়েক শত সাহসী যোদ্ধা প্রস্তুত থাকে, এবং যুদ্ধসময়ে প্রত্যেক যোদ্ধা মদিবায উন্মত্ত হইযা বর্শা হস্তে দশ সহস্র শত্রুকেও তুচ্ছ কবে। কান্যকুব্জেব বাজা শিলাদিত্য সমস্ত ভাবতবর্ষ জয কবিয়াছিলেন, কিন্তু মহাবাষ্ট্র দেশ জয কবিতে পাবেন নাই। মহাবাষ্ট্র দেশে একশত মঠ ও একশত দেবালয় ছিল। মঠবাসী বৌদ্ধেব সংখ্যা পঞ্চসহস্র, কিন্তু হিন্দু-দেবপূজকেব সংখ্যা অতিশয অধিক।

নর্ম্মদানদী পাব হইযা হুযেন সাঙ্ মালব দেশে আসিলেন। তিনি লিখিযাছেন, ভাবতবর্ষেব মধ্যে দুইটি স্থানে বিদ্যাব সমাদব—উত্তবপূর্ব্বে মগধদেশ, দক্ষিণপশ্চিমে মালব। এই বাজ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয ধর্ম্মই অতিশয় প্রবল ছিল। পবে অন্যান্য অনেক দেশ সন্দর্শন করিয়া সিন্ধু পাব হইযা হুযেন সাঙ্ ভাবতবর্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়েন। হুয়েন সাঙ্ ভাবতবর্ষেব ১৩৮ বাজ্যেব বর্ণনা কবিযাছেন, তাহাব মধ্যে ১১০টি তিনি স্বযং দর্শন কবিয়াছিলেন।

উপবি উক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম এককালে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু

হিন্দুধর্ম্মও একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। পরে খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বেই হিন্দুধর্ম্ম প্রায় সর্ব্বস্থানে প্রবল হইয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম তখনও একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। হুয়েন সাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি জাতির বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বৈশ্যগণ বণিক ও শূদ্রগণ কৃষিজীবী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অনেক মিশ্রজাতির কথা লিখিয়াছেন। রাজার নিজের ভূমির আয় চারি ভাগে বিভক্ত হইত, এক ভাগ হইতে রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত, দ্বিতীয় অংশ জায়গীর রূপে রাজকর্ম্মচারী গণ অধিকার করিত, তৃতীয় অংশ শাস্ত্রজ্ঞ লোকে ভোগ করিত এবং চতুর্থ অংশ বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগকে দান স্বরূপ প্রদত্ত হইত। রাজকর অতি সামান্য ছিল; সকলেই পৈতৃক ভূমি অধিকার ও কর্ষণ করিত ও রাজার নিকট হইতে বীজ প্রাপ্ত হইত এবং উৎপন্নের ষষ্ঠাংশ রাজাকে কর স্বরূপ দান করিত। নদী ও রাজপথের স্থানে স্থানে মাসুল আদায় হইত। রাজা ইচ্ছা করিলে প্রজাদিগকে উচিত বেতন দিয়া খাটাইতে পারিতেন। শান্তির সময় অল্পমাত্র সৈন্য থাকিত, তাহারা রাজ্যের সীমা রক্ষা করিত, ও রাজবাটী ও রাজাকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিত, ইহা ভিন্ন যুদ্ধের সময় বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ হইত। শাসনকর্ত্তা, মন্ত্রী, বিচারকর্ত্তা, সকলেই ভূমি অধিকার করিতেন, এবং তাহারই উৎপন্ন বেতন স্বরূপ ভোগ করিতেন। হুয়েন্ সাং হিন্দুদিগের বিচার-প্রণালীর অতিশয় সুখ্যাতি করিয়াছেন।

গ্রীকদিগের ন্যায় হুয়েন্ সাংও হিন্দুদিগের সরলতা ও সত্যবাদিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে হিন্দুগণ সভ্যতা-সোপানের অনেক দূর আরোহণ করিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে কত দূর উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল, তাহাই আলোচনা করা এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য।

জ্যোতিষশাস্ত্র ও বীজগণিত। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে খৃষ্টের জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ আকাশের যে পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই মত সকলে সমর্থন করেন না বটে, কিন্তু খৃষ্টের প্রায় চতুর্দ্দশ শত বৎসর পূর্ব্বে যে, জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন হইয়াছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। এই সময়ের যে জ্যোতিষগণনার উল্লেখ বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে আধুনিক জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ বেদসঙ্কলনের সময় নির্ণয় করিয়াছেন। পরন্তু প্রথম প্রসিদ্ধ হিন্দু জ্যোতির্ব্বেত্তা পরাশরও এই সময়ে জীবিত ছিলেন।

বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুগণ স্বচিন্তাবলে জ্যোতিষের আলোচনা করিয়াছিল; ও গ্রীকগণ বোধ হয়, হিন্দুদিগের নিকট হইতে প্রথমে জ্যোতিষশিক্ষা প্রাপ্ত হয়। পরে গ্রীকগণ এই বিদ্যায় অনেক উন্নতি লাভ করিলে, হিন্দুগণও তাহাদিগের

নিকট হইতে শিক্ষা পাইয়াছিল। হিন্দুগণ সপ্তবিংশ নক্ষত্র আপনারাই আবিষ্কার করিয়াছিল, কিন্তু রাশিচক্রের দ্বাদশটি চিহ্ন বোধ হয় গ্রীকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়। খৃষ্টের পর পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর হিন্দু জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ "যবন" দিগের জ্যোতিষের ও "রোমক সিদ্ধান্তের" অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

খৃষ্টের পর পঞ্চম শতাব্দীতে আর্য্যভট্ট জন্মগ্রহণ করেন, ও বীজগণিত শাস্ত্রের অনেক উন্নতিসাধন করিয়া আপন নাম স্মরণীয় করিয়াছেন। তিনি "আর্য্যভট্টীয়" "দশগীতিকা" ও "আর্য্যাষ্টশত" নামক তিনখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই সময়ে "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থ রচিত হয়। তাঁহার পর বরাহমিহির নামক আর এক জন জ্যোতির্ব্বেত্তা উজ্জয়িনীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি "বৃহৎসংহিতা" নামক গ্রন্থ রচনা করেন, ও তাঁহার পূর্ব্বের জ্যোতিষবিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন মত লইয়া "পঞ্চসিদ্ধান্তিকা" নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তাঁহার পর ব্রহ্মগুপ্ত জন্মগ্রহণ করিয়া এই শাস্ত্রের আরও উন্নতিসাধন করেন। তিনি "ব্রহ্মসিদ্ধান্ত" নামক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। শেষে খৃষ্টের পর দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য্য "বীজগণিত" ও "লীলাবতী" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। বীজগণিতশাস্ত্রে গ্রীকগণ কখনই হিন্দুদিগের সমকক্ষ হইতে পারে নাই; এমন কি, এই শাস্ত্রে হিন্দুগণ যে সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহা ইউরোপে কেবল সম্প্রতি আবিষ্কার হইয়াছে। খৃষ্টের পর ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে

প্রথম আবব বীজগণিতবেত্তা একখানি হিন্দুপুস্তক অনুবাদ কবিয়া আববীয ভাষায এই শাস্ত্রালোচনাব আরম্ভ কবেন। পবে ১২০২ খৃষ্টাব্দে পীসানগবীয এক জন ইতালীয় আরবদিগেব নিকট এই শাস্ত্র শিক্ষা কবিযা ইউবোপে প্রথম প্রচাব কবেন।

জ্যামিতি। এই শাস্ত্রেও হিন্দুগণ অনেক উৎকর্ষ লাভ কবিযাছিল। খৃষ্টেব পব পঞ্চম শতাব্দীতে ত্রিকোণ ও গোল পদার্থ সম্বন্ধে হিন্দুগণ যে সমস্ত নিযম আবিষ্কাব কবিযাছিল, ইউবোপে তাহা খৃষ্টেব পব ষোডশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কাব কবেন নাই।

অঙ্কবিদ্যা। অঙ্কবিদ্যায হিন্দুগণ জগতেব গুরু। ডেসিমাল নোটেশন্ (Decimal Notation) হিন্দুদিগেব নিকট হইতে আববগণ শিক্ষা কবে, আববদিগেব নিকট হইতে ইউবোপবাসীগণ শিক্ষা কবে। গ্রীকেবা এইটি জানিত না বলিযা অঙ্কবিদ্যায কখনও হিন্দুদিগেব সমকক্ষ হইতে পাবে নাই।

ষড়্‌দর্শন। ভাবতবর্ষে প্রথম বিজ্ঞান-আলোচনা বেদবর্ণিত সমযেই হইযাছিল। উপনিষদেব স্থানে স্থানে যে সমস্ত বিজ্ঞান-আলোচনা আছে, তাহা কেবল ভাবতবর্ষে কেন, বোধ হয, সমস্ত জগতেব মধ্যে আদি দর্শনশাস্ত্র। তথাপি এই আলোচনা সমুদয অসংলগ্ন ও প্রণালীবহিত; লেখকের মনে যখন যে চিন্তা উদয় হইযাছে, তাহাই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

পরে এই সমস্ত অসংলগ্ন আলোচনা হইতে প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রেব প্রথম সৃষ্টি হয়। কথিত আছে, বেদব্যাস স্বযং বেদের সাব অর্থ উদ্ধৃত করিয়া বেদান্ত রচনা করেন ও সেই দর্শনের

সৃষ্টি করেন। এ কথা অলীক হইলেও বেদান্তদর্শনের প্রথম সৃষ্টি এই সময়েই হইয়াছিল, তাহা অনুমিত হইতে পারে। এই-রূপে অপর অপর দর্শনের প্রথম আবির্ভাব এই সময়েই হয়।

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে যে চিন্তার উৎকর্ষ ও মানসিক উদারতা ঘটিল, তদ্দ্বারাই ভারতবর্ষে দর্শনশাস্ত্র প্রকৃত উন্নতিলাভ করিল। বিশেষ সাঙ্খ্যদর্শন ও বৌধর্ম্মের মধ্যে এত নিকট সম্বন্ধ যে, সেই দুইটিকে আর্য্যচিন্তার দুইটি যমজ কন্যা বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এ স্থানে ষড়-দর্শনের বিশেষ বিবরণ দিবার আবশ্যক নাই, কেবল নামগুলি উল্লিখিত হইবে যথা :—

(১) জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা।

(২) ব্যাসদেবের উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত।

(৩) গোতমের ন্যায়শাস্ত্র।

(৪) কণাদের বৈশেষিকশাস্ত্র।

(৫) কপিলের সাঙ্খ্যদর্শন।

(৬) পতঞ্জলির যোগদর্শন।

চিকিৎসা ও রসায়ন। চিকিৎসাবিদ্যায় সংস্কৃত ভাষায় চরক ও সুশ্রুতই প্রধান গ্রন্থ। চরক প্রথম গ্রন্থ, অন্যটি তাহার পর রচিত হয়। সুশ্রুতের একটি টীকা কাশ্মীরে খৃষ্টের পর দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়, সুতরাং প্রথম গ্রন্থটি তাহার কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। আরব গণ এই দুই পুস্তক নিজ ভাষায় অনুবাদ করে। গ্রীকগণ হিন্দুদিগের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে, তাহা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করে। উভয় চিকিৎসাবিদ্যা ও রসায়ন-বিদ্যায়

হিন্দুগণ অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল ও নানারূপ ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানিত *। ধাতু সেবন করিয়া পীড়া আরোগ্য করা তাহারাই প্রথমে আবিষ্কার করে। হিন্দুদিগের অতি পূর্ব্বকালেই ১২৭ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ছিল, ও তাহারা নারীর গর্ভ হইতে সন্তান বাহির করিতেও পারিত। বসন্তরোগ নিবারণার্থে টীকা দেওয়া ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে।

ভাস্করকার্য্য ও গৃহাদি নির্ম্মাণ। যাহারা প্রাচীন হিন্দুদিগের চিন্তা, ক্ষমতা ও কবিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হয়, তাহারা সেই জাতির ভাস্করকার্য্য ও গৃহনির্ম্মাণবিষয়ে দুর্ব্বলতা দেখিয়াও সেইরূপ বিস্মিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মন্দির, দেবালয় ও প্রাসাদে পরিপূর্ণ এলোরা ও এলিফাণ্টার গহ্বরে ও উড়িষ্যার খন্দগিরির ভিতর অসংখ্য প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তি আছে, সে সমস্ত যে কত পরিশ্রমে সাধিত হইয়াছে, তাহা অনুভব করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু এই অসংখ্য মূর্ত্তি ও হর্ম্ম্যাদির মধ্যে কোনটিও চিন্তা বা বিশেষ কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয় না কি জন্য? গ্রীক ও রোমীয়দিগের ন্যায় হিন্দুগণ সুন্দর কমনীয় প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে শিখে নাই কি জন্য? কত সহস্র বৎসরের অশেষ চেষ্টার পরও হিন্দুগণ প্রস্তর বা মৃত্তিকার "সং" ভিন্ন আর কিছু গড়িতে পারে না।

---

* Muriatic acid, Sulphuric acid, Nitric acid, Oxide of Copper, Oxide of Lead, Oxide of Iron, Oxide of Tin, Oxide of zinc, Sulphate of Copper, Zinc and Iron, Carbonate of Lead and Iron Sulphuret of Iron, Copper Murcury, Antimony and Arsenic &c.

কি জন্য? কাব্যে শকুন্তলার যে অতুল মিষ্টত্ব ও কমনীয়তা জগতে প্রকাশ পাইয়াছে, ভাস্করকার্য্যে সে মিষ্টত্ব কোথায়? চিন্তা ও কল্পনা হিন্দুকবিত্বে বর্ত্তমান আছে, ভাস্করকার্য্যে বা হর্ম্ম্যাদিনির্ম্মাণে বর্ত্তমান নাই কি জন্য?

ইহার কারণ অনুভব করা দুঃসাধ্য। আমাদিগের বোধ হয়, জাতিবিচ্ছেদ ইহার একটি প্রধান কারণ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভারতবর্ষের প্রভু, মিশ্রজাতিগণ তাহাদিগের অধীন, যুগে যুগে কখনও স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করে নাই, ভরসাও করে নাই। স্বাধীনতা ও পরাক্রমের সহিত মনোবৃত্তিগুলি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, অধীনতায় সেগুলি নিহত হইয়া যায়। স্বাধীন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-গণ চিন্তা ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিল, ও এই এই বিষয়ে যে পারদর্শিতা লাভ করিল, জগৎ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল। কিন্তু পদদলিত হীন মিশ্রজাতিগণ শিল্পকার্য্য অবলম্বন করিল, বৎসরে বৎসরে, যুগে যুগে ব্রাহ্মণাদেশে সেই কার্য্য করিতে লাগিল, কিন্তু মনের স্বাধীনতা নাই, হৃদয়ের বেগ নাই, সে অসংখ্য কার্য্যের কল্পনার পরিচয় নাই। ব্রাহ্মণাদেশে তাহারা মন্দির ও দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত, রাজাদেশে প্রাসাদ, দুর্গ ও প্রাচীর প্রস্তুত করিত, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনে মনের যে উৎকর্ষ সাধন হয়, তাহা হইল না। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করিতে শিখিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ বা মন্দির নির্ম্মাণ করিতে শিখিল, কিন্তু সে কার্য্যে বিশেষ কল্পনা বা চিন্তার পরিচয় নাই। ফীডিয়াস বা প্রকৃসিলীটীস গ্রীসে যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মাইকেল এঞ্জিলো বা র‍্যাফেল ইতালীতে যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভারতবর্ষে সে সম্মান ও সে পূজা চিন্তাপট বা অস্ত্রব্যব-

সায়ী ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়দিগের জন্য, শিল্পব্যবসায়ীদিগের জন্য নহে। সুতরাং শিল্পব্যবসায়ীগণও পরাধীনতা বশতঃ কখনও সে সম্মানের যোগ্য হইতে পারিল না।

হিন্দুসভ্যতার কয়েকটি অভাব। সকল দেশেই বিদ্যা ও অস্ত্রব্যবসায়ী লোক অন্য লোক অপেক্ষা প্রভুত্ব লাভ করে; কিন্তু সেই প্রভুত্বটি বংশানুগত হইলে অনিষ্ট ফল ফলে। সমাজের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটে; সামান্যব্যবসায়ী লোকগণ জন্মহেতুই আপনাদিগকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করিতে শিখে, সুতরাং কখনও উন্নত হইতে পারে না। উচ্চব্যবসায়ী লোক জন্মহেতুই আপনাদিগকে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিতে শিখে, সুতরাং নীচ লোকদিগের উপর অত্যাচার করে ও আপনাদিগের ক্ষমতা রক্ষার জন্য অন্যায় উপায় উদ্ভাবন করে, প্রবঞ্চনা অবলম্বন করে। ইউরোপে যে সমস্ত আবিষ্কার দ্বারা আধুনিক সভ্যতা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি অতি সামান্য লোকে করিয়াছে, ভারতবর্ষে সেটি নিষিদ্ধ; কয়েক সহস্র বৎসরের মধ্যে সামান্য লোকের চিন্তাশক্তি বা কার্য্যপরম্পরার চিহ্ন নাই। স্বাধীনচিন্তা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের একচাটিয়া; স্বাধীনচিন্তা নিম্ন লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ। যে বিদ্যা জীবনের জীবনস্বরূপ, এবং ক্ষমতার মূলীভূত কারণস্বরূপ, তাহাও ব্রাহ্মণগণ প্রথমে নিম্ন জাতিদিগের নিকট হইতে, পরে ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া একচাটিয়া করিল; বিদ্যাহীন নিম্ন জাতিগণ সুতরাং পদানত হইয়া পড়িল, তাহাদিগের মানসিক উন্নতির পথ রহিল না।

এক জাতি প্রভু ও অন্য জাতি দাস হইলে কেবল যে দাস

জাতির অমঙ্গল হয়, তাহা নহে প্রভুদিগেরও অমঙ্গল হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই আপনাদিগের প্রভুত্ব রক্ষার্থ ব্যস্ত থাকাতে সত্যের জন্য ততটা উৎসাহী ছিল না; জ্যোতিষ ও অন্যান্য শাস্ত্রে যত দূর উন্নতি সম্ভব ছিল, তত দূর হইয়া উঠিল না। সকল শাস্ত্রেই ব্রাহ্মণপ্রভুত্ব স্থিরীকৃত করিবার চেষ্টায় প্রকৃত সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা হ্রাস পাইল। এইরূপে জাতিবিচ্ছেদ হিন্দুসভ্যতা ও বিদ্যার গতি অনেকাংশে রুদ্ধ করিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার দ্বিতীয় একটি মহদ্দোষ ধর্ম্মভীরুতা (Superstition), উষ্ণ দেশীয় লোক প্রায়ই কল্পনাপটু ও ভাবপূর্ণ, সুতরাং ধর্ম্মভীরু হয়, এবং ভারতবর্ষের ধর্ম্মভীরুতারও এই আদি কারণ। আবার পূর্ব্বোল্লিখিত জাতিবিচ্ছেদ বশতঃ ধর্ম্মভীরুতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কেন না ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের প্রাধান্য রক্ষা বা লাভের জন্য নানারূপ কাল্পনিক নিয়ম করাতে, কাল্পনিক শাস্ত্র লিখাতে ও অন্যান্য জাতির বিদ্যাচর্চ্চা নিষিদ্ধ করাতে ক্রমেই সেই জাতিদিগের ধর্ম্মভীরুতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইটি করিতে আছে, এইটি করিতে নাই, এইটি সুলক্ষণ, এইটি কুলক্ষণ, এইরূপ মিথ্যা ও হাস্যজনক নিয়ম ভারতবর্ষে যত আছে, বোধ হয় জগতে কুত্রাপি তত নাই। ধর্ম্মভীরুতা হিন্দুসভ্যতার গতি অনেক রুদ্ধ করিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার আর একটি অভাব আমরা এই স্থানে নির্দ্দেশ করিব। হিন্দুদিগের সকল বিদ্যায় সমান অধিকার ছিল না। স্বভাবতঃ চিন্তাশীল ও কল্পনাপটু বলিয়া

তাহারা সামান্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই; আকাশের নক্ষত্র গণিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীর জীব বা উদ্ভিদ সম্বন্ধে সেরূপ আলোচনা করে নাই। দেবদেবীর কাল্পনিক উপন্যাস রাশীকৃত করিয়াছে, কিন্তু সামান্য মনুষ্যের কথা লিখে নাই, আপনাদিগের একখানি ইতিহাস লিখিয়া যায় নাই। এই সামান্য বিষয়ে দৃষ্টিই আধুনিক সভ্যতার মূলীভূত কারণ; বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতেছে, পাত্র হইতে ধূম উঠিতেছে, এই সামান্য বিষয়ই আধুনিক বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়ার কারণ।

কাব্য। কবিত্ব ও কল্পনাশক্তিতে হিন্দুদিগের সমতুল জাতি জগতে এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করে নাই। তাহাদিগের অসাধারণ কবিত্ব ও অনন্ত কাব্যের সম্যক্ সমালোচন এই অল্প স্থানের মধ্যে সম্ভবে না, সুতরাং আমরা কেবল কয়েকটি প্রধান প্রধান কাব্যের উল্লেখ করিব।

ঋগ্বেদের সংহিতা ভারতবর্ষে, বোধ হয়, জগতের মধ্যে আদিকাব্য; ইহার পূর্ব্বেও কবিতা ও গীত রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেরূপ পূর্ব্বরচিত কোন কাব্যের এক্ষণে নিদর্শন পাওয়া যায় না। সংহিতার কবিতা স্থানে স্থানে অতিশয় মনোহর; সরল পবিত্র অন্তঃকরণে ও ভক্তিভাবে আর্য্যগণ সূর্য্য বা উষার অগ্নিকে যে আহ্বান করিত, তাহা পাঠ করিলে এখনও হৃদয় আলোড়িত হয়।

বেদের ব্রাহ্মণ অংশে কবিত্ব অধিক নাই, উপনিষদ কেবল বিজ্ঞানচিন্তা ও তর্কপরিপূর্ণ।

তৎপরে রামায়ণ ও মহাভারত নামক যে দুইটি মহাকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহার তুল্য কাব্য বোধ হয়, জগতে নাই।

এই দুই অসাধারণ কাব্যের সম্যক্ সমালোচনা এ স্থানে সম্ভবে না। ইহাতে যে উদ্ভাবনশক্তি, যে বর্ণনাশক্তি, যে মধুরতা, করুণরস ও বীররস প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এ স্থানে সম্যক্ বর্ণনা করা যায় না। বৃদ্ধ, শোকার্ত্ত দশরথের চিত্র, পতিপরায়ণা সীতার জীবনব্যাপী শোক, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, সত্যপ্রিয়তা ও বীরত্ব প্রভৃতি রামায়ণে যে কতকগুলি অপূর্ব্ব চিত্র আছে, সেরূপ মনুষ্যকল্পনা হইতে বোধ হয় আর কখনও আবিষ্কার হয় নাই। মহাভারতেও সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী বিস্ময়কর কয়েকটি চিত্র আছে; ভীষণ অভিমানী দুর্য্যোধন, ক্রুদ্ধ, গর্ব্বিত, তেজঃপূর্ণ কর্ণ, প্রশান্তমূর্ত্তি প্রশান্তহৃদয়, ভক্তিভাজন, জগতে অতুল্য বীর পিতামহ ভীষ্ম; অসাধারণ তেজস্বী যুদ্ধাচার্য্য দ্রোণ; চতুর রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ; চতুর অস্ত্রজ্ঞ অর্জ্জুন; শান্ত ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির; পরাক্রান্ত সবলস্বভাব ভীম, এই কএকটি চিত্র এক একটি রত্ন;—কল্পনাসাগর হইতে এরূপ রত্ন আর কখনও উদ্ধৃত হয় নাই।

মহাভারতের পর যে অসংখ্য কাব্য রচিত হইয়াছে, এ স্থানে সে সমস্তের উল্লেখ করাও অসম্ভব। সুতরাং আমরা কেবল প্রধান দুইটি কবির বিষয় উল্লেখ করিব; সে দুইটি ভারতের শিরোরত্ন স্বরূপ;—কালিদাস ও ভবভূতি। কালিদাসের শকুন্তলার ন্যায় জগদ্বিখ্যাত নাটক আর একখানিও নাই; আমাদের মতে এ প্রকার সুললিত মধুর নাটকও জগতে আর নাই। পাঠ করিলে বোধ হয় যেন সে মধুরতা পুস্তকে ধরে না, যেন পত্রে পত্রে, পঙ্ক্তিতে পঙ্ক্তিতে উথলিয়া পড়িতেছে। কণ্বমুনির শান্ত আশ্রমে বল্কলবাসিনী শকুন্তলা, তাঁহার বন্য সঙ্গিনীগণ—

হরিণী, বনলতা, পুষ্পচারা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা, তাঁহার সরল শান্ত হৃদয়ের প্রথম অজ্ঞাত অব্যক্ত উদ্বেগ, তাঁহার চিরসঙ্গিনী-দিগের নিকট হইতে খেদপূর্ণ বিদায় গ্রহণ প্রভৃতি যে সমস্ত চিত্র এই গ্রন্থে অঙ্কিত আছে, সেরূপ ললিত, মধুর, হৃদয়গ্রাহী চিত্র আমরা কখনও কোন ভাষায় দৃষ্টি করি নাই। শকুন্তলা ভিন্ন কালিদাসের আর দুইখানি নাটক এখনও বিদ্যমান আছে। সে নাটকদ্বয়-বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র। এই দুই খানিতে, বিশেষতঃ বিক্রমোর্ব্বশীতে, কালিদাসের কল্পনার অতুল্য লীলা, কালিদাসের লেখনীর অসাধারণ মধুরতা দৃষ্ট হয়।

পুরূরবা রাজার স্বর্গীয় অপ্সরা উর্ব্বশীর সহিত প্রণয়, ও অগ্নিমিত্র রাজার সহিত রাজ্ঞী ধারিণীর এক জন পরিচারিকা মালবিকার সহিত প্রণয়, এই দুই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। মালবিকাগ্নিমিত্রে এক জন বৌদ্ধ পরিব্রাজিকার উল্লেখ আছে।

নাটক ভিন্ন কালিদাস অন্য কাব্যও কতকগুলি লিখিয়াছেন। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত কালিদাসরচিত, ঋতু-সংহার ও নলোদয় কালিদাসের কি না সন্দেহ। রঘুবংশে রাজাদিগের কীর্ত্তি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে; কুমারসম্ভবে উমার বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। হিমালয় পর্ব্বতে মহাদেবের তপ ও উমার সেবা, পরে নির্জ্জন বনে উমার কঠোর তপ ও শোক অতি আশ্চর্য্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মেঘদূতে দেশবর্ণনার চতুরতা বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়।

ভবভূতির মালতীমাধব অতি প্রসিদ্ধ নাটক। কালিদাসের লেখনী যেরূপ মধুময়ী, মালতীমাধব-রচয়িতার লেখনীও সেইরূপ তেজীয়সী। বিশেষতঃ কপালকুণ্ডলা ও অঘোরঘণ্টরক্ষিত

চামুণ্ডার মন্দিরে মালতীকে যখন বলি দিবার উদ্যোগ হইল,— মাধব যখন ভীষণ যুদ্ধের পর অঘোরঘণ্টকে নিহত করিয়া মালতীর উদ্ধার করিলেন, সেই স্থানের বর্ণনার ন্যায় তেজস্বিনী ভয়াবহ বর্ণনা বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় আর নাই। পুনরায় একবার কপালকুণ্ডলা মালতীকে লইয়া যায়, কিন্তু সৌদামিনীর সহায়তায় মাধব পুনরায় তাঁহার উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই নাটকে বৌদ্ধরমণী কামন্দকীর পরিচয় আছে। এই নাটক ভিন্ন ভবভূতি আরও দুইখানি নাটক লিখিয়াছেন। মহাবীরচরিতে রামরাবণের যুদ্ধ ও সীতা উদ্ধারের বর্ণনা আছে, উত্তররামচরিতে সীতার বনবাস বর্ণিত আছে। এই দুই নাটকই হৃদয়গ্রাহী, তন্মধ্যে মহাবীরচরিত বিশেষ করুণরসপূর্ণ।

কালিদাস ও ভবভূতির গ্রন্থ ভিন্ন ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়, মাঘের শিশুপালবধ, শ্রীহর্ষের নৈষধ, ও ভট্টিকাব্য প্রসিদ্ধ। নাটকের মধ্যে রত্নাবলী বা বাসবদত্তা, মুদ্রারাক্ষস ও বেণীসংহার প্রসিদ্ধ আছে। গদ্যকাব্যের মধ্যে কাদম্বরী ও দশকুমারচরিত প্রসিদ্ধ ও গীতিকাব্যের মধ্যে গীতগোবিন্দ বিখ্যাত।

অষ্টাদশ পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থের মধ্যেও অনেক উৎকৃষ্ট কবিত্ব আছে, কিন্তু তাহার বর্ণনা এ স্থলে সম্ভবে না। নীতিশাস্ত্রের মধ্যে পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ, ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনি ও মুগ্ধবোধ, ব্যবস্থার মধ্যে মনুসংহিতা, মিতাক্ষর ও দায়ভাগ প্রসিদ্ধ।

বাণিজ্য। মনুসংহিতার সময়ের পূর্ব্ব হইতে হিন্দু অর্ণবপোত আরবসমুদ্র ও বঙ্গসাগরে গমনাগমন করিত; কিন্তু তটভূমি হইতে কখনও সমুদ্রের ভিতর অধিক দূর যাইতে সাহস করিত

না। মলবার ও করোমণ্ডল-কূল দিয়া হিন্দু-বাণিজ্য পোত গমনাগমন করিত, আরবের সহিত বা ইউরোপের সহিত যে বাণিজ্য চলিত, তাহা প্রায় সমস্তই আরব-পোত ও আরব-নাবিকের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত।

বঙ্গসাগরে যে সকল নাবিক গমনাগমন করিত, তাহারা ক্রমে ক্রমে অধিক সাহসী হইয়া অবশেষে কূল ত্যাগ করিয়া এই সাগর অতিক্রম করিয়া মালে, যব ও সুমাত্রা পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিল। যবদ্বীপে কলিঙ্গ হইতে হিন্দুগণ খৃষ্টের জন্মের ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে যাইতে শিখিয়াছিল, এবং ক্রমে ক্রমে তথায় হিন্দু-উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, হিন্দু-হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। খৃষ্টের পর চতুর্থ শতাব্দীতে চীনদেশীয় যে ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনি লিখিয়াছেন যে, যবদ্বীপ হিন্দুপরিপূর্ণ, এবং হিন্দুগণ গঙ্গার মুখ হইতে সিংহলদ্বীপ পর্য্যন্ত, তথা হইয়া যব পর্য্যন্ত, তথা হইয়া চীন পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই অর্ণব-পোতে গমনাগমন করিত। যবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তৎপরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হয়; কিন্তু খৃষ্টের চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তথায় হিন্দুরাজ্য বিদ্যমান ছিল। পরে মুসলমানগণ যাইয়া সে রাজ্য ধ্বংস করে। মহাভারতের সমস্ত উপাখ্যান যবেতে অদ্যাপি বিদিত আছে; কেবল ভারতবর্ষের নগরী ও রাজা ও রাজ্যের পরিবর্ত্তে সেই দেশের স্থান ও রাজ্যগুলি উপাখ্যানে উল্লিখিত হয়।

সে সময়ে ভারতবর্ষ হইতে আরব ও ইউরোপে তূলার বস্ত্র, মলমল, ছিট, রেশম ও রেশমী বস্ত্র, নীল ও অন্যান্য রঙ্,

দারুচিনি ও অন্যান্য মসলা, চিনি, হীরক, মুক্তা ও বহুমূল্য প্রস্তর, ইস্পাত, ঔষধ, গন্ধদ্রব্য ও কখন কখন সুন্দরী দাসীগণ প্রেরিত হইত। পশ্চিম হইতে পশমী বস্ত্র, পিত্তল, টিন, সীসা, পলা, কাচ ও সুবর্ণ, রৌপ্য ও ইতালীয় মদিরা আনীত হইত।

সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে ভারতবাসীগণ প্রায় জগতে অতুল্য ছিল। তাহাদিগের সুবর্ণ ও রৌপ্যে কারুকার্য্য ও সূক্ষ্ম বস্ত্র, রোম প্রভৃতি পশ্চিম রাজ্যে অতিশয় আদৃত হইত।

উপসংহার। পূর্ব্বের পরিচ্ছেদগুলিতে হিন্দুজাতির জীবনের গতি একরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কোন জাতির জীবন সর্ব্বদা সমভাবে চলে না, কখন সবলতার, কখন দুর্ব্বলতার চিহ্ন লক্ষিত হয়। প্রাচীন হিন্দু-জীবন আলোচনা করিলে, চিন্তার বিপ্লব ও তীব্রতা এবং কার্য্যের সবলতা, বিশেষরূপে তিন চারিটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লক্ষিত হয়।

প্রথমে আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়া বর্ব্বরদিগের সহিত মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয়, ক্রমে অসভ্য জাতিকে দূর করিয়া পশ্চিম দিকে রাজ্য বিস্তার করে, বন পরিষ্কার করিয়া চাষ আরম্ভ করে ও গ্রাম ও নগরী নির্ম্মাণ করে, তখন তাহাদিগের জাতীয় জীবনে বিশেষ বল লক্ষিত হয়। বেদের সংহিতা সেই বেগের ছায়া মাত্র। সেই বলে যে উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সাধন হইয়া মেষপালকসমাজ ক্রমে জাতিবিচ্ছেদমূলক সভ্য হিন্দু-সমাজরূপ ধারণ করিল, তাহা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

জাতিবিচ্ছেদের অনেক পর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তাহার নিদর্শন উপনিষদে পাওয়া যায়।

বোধ হয় সে বার ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য স্বীকৃত হইল। উপনিষদে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণকে শিক্ষাদান করিতেছে, তাহার পরিচয় আছে। ক্ষত্রিয়গণ ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের আলোক উপনিষদে প্রথম উদ্দীপ্ত করিল। কিন্তু এই ক্ষত্রিয়প্রাধান্য কেবল চিন্তায় প্রকাশ হয় নাই; যে জনক রাজা উপনিষদের এক জন প্রধান শিক্ষাগুরু, তাঁহারই জামাতা রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ পরশুরামের ক্ষমতা চূর্ণ করেন, পরে অনার্য্য দাক্ষিণাত্য ভেদ করিয়া সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়-বিজয় বিস্তার করেন। ইহারই কয়েক শতাব্দীর পর মহাভারতবর্ণিত যুদ্ধে সেই ক্ষত্রিয়-বল পুনরায় বিকাশ পাইল। এইরূপে হিন্দু-জাতীয় জীবন দ্বিতীয় বার উৎকর্ষ লাভ করে, উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারত তাহার ছায়া মাত্র।

বহুকাল পরে এক জন ক্ষত্রিয় পুনরায় ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব অস্বীকার করিলেন ও মনুষ্যের সমতা প্রচার করিলেন। বুদ্ধের সেই শিক্ষাবলে ভারতবর্ষ পুনরায় উন্নতিসোপানে উঠিতে লাগিল। এই বৌদ্ধকালে অশোক আর্য্যাবর্ত্ত প্রায় একচ্ছত্র করিলেন। কালে ষড়দর্শন ও চিন্তাশক্তি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিল; এই কালে হিন্দু-নাবিকগণ বঙ্গসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যবদ্বীপ আবিষ্কার করিল, ও এই কালে শিল্পবিদ্যা উৎকর্ষ লাভ করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধ অট্টালিকা ও শিল্প-কার্য্যে আচ্ছাদিত করিল। হিন্দু-মন এই তৃতীয় বার আলোড়িত হইল।

পরে যখন খৃষ্টের পর পঞ্চম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের ভস্মরাশির উপর পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, তখন

চিন্তাক্ষমতা পুনর্বায় উৎকর্ষ লাভ করিল, সমগ্র ভারতবর্ষে চিন্তাস্রোত বহিতে লাগিল। এইটি ব্রাহ্মণ-প্রবর্ত্তিত বিপ্লব, ও এই বিপ্লবে ব্রাহ্মণদিগের অসাধারণ ধীশক্তি, কল্পনা ও মানসিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে কালিদাস, ভবভূতি ও বাণভট্ট আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত জীবিত ছিলেন। এই সময়েই ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্র পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ও চীনভ্রমণকারী ভারতবর্ষের অর্থ ও সভ্যতা দেখিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধনামা শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানসাগর মন্থন করিয়া অসংখ্য পুস্তক লিখিয়াছেন, বেদান্তদর্শনের নূতন রূপ দান করিয়াছেন ও দক্ষিণাপথে বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনঃস্থাপন করিয়াছেন। ইহার পরই ভাস্করাচার্য্য, লীলাবতী ও বীজগণিত প্রণয়ন দ্বারা আপন নাম চিরস্মরণীয় করেন। তাহার পর ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের করকবলিত হইল, সেই অবধি হিন্দু-মানসিক বেগের আর পরিচয় পাওয়া যায় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মুসলমান আক্রমণ ও বিজয়।

৬৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

মুসলমান ধর্ম্মের উৎপত্তি। আরবদেশ অনুর্ব্বর ও মরুভূমিপূর্ণ সুতরাং পূর্ব্বকাল হইতে অদ্যাবধি কখনই

বিশেষ সভ্যতা লাভ করে নাই আরবের লোক অতিশয় সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু এবং তাহাদিগের দেশের দারিদ্র্য ও আপনাদিগের সাহসবশতঃ কখনও অন্য জাতির অধীনতা স্বীকার করে নাই। ৬৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহারাও অন্য দেশ জয় করিবার উদ্যোগ করে নাই।

আরবগণ পৌত্তলিক ছিল ও নক্ষত্র-পূজা করিত, কিন্তু সময়ে সময়ে ইহুদী ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী লোক আরবদেশে আসিয়া বাস করাতে উক্ত ধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে আরবে প্রচারিত হইল।

মহম্মদ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পরিচয় পাইলেন ও ঐ ধর্ম্মের উৎকর্ষ দেখিতে পাইলেন। তিনি বাল্যাবধি অতিশয় চিন্তাশীল ছিলেন ও নির্জ্জনে অনেক চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে প্রকাশ করিলেন যে, এক জগদীশ্বরের পূজা প্রচারার্থ জগদীশ্বর তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। চত্বারিংশৎ বৎসরের অধিক বয়ঃক্রমের সময় তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন ও প্রচার করিবার যত্ন পাইলেন। দশ বৎসর পর্য্যন্ত মক্কাবাসীগণ এই শান্ত নিরীহ একেশ্বরবাদীকে উপহাস করিতে ও যন্ত্রণা দিতে লাগিল ও অবশেষে তাঁহার মৃত্যুসঙ্কল্প করিল। তখন মহম্মদ ৬২২ খৃষ্টাব্দে মদিনায় পলায়ন করিলেন ও শান্তমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ও বিক্রম দৃষ্টি করিয়া আরবজাতি ক্রমে তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বী হইল। মহম্মদের মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি সমস্ত আরবদেশ জয় করিয়া স্বধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় দূতের আদেশ ও উপদেশ অনুসারে তিনি ধর্ম্মপুস্তক কোরাণ লিখিয়া-

ছেন, এইরূপ প্রচার করিলেন। জগতে সমস্ত মুসলমানদিগেরও এইরূপ বিশ্বাস। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যু হয়।

অস্ত্রবলে ধর্ম্মপ্রচার বিধেয়, এই যে মহামন্ত্র মহম্মদ শিখাইলেন, আরবেরা তাহা ভুলিল না। ধর্ম্মবিপ্লবে যেন নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়া আরবের লোক আরবদেশ উত্তীর্ণ হইয়া চারি দিকে খড়্গহস্তে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিল। সিরীয়া, পারস্য, তাতার, মিশর, উত্তর আফরিকা, স্পেন, ফ্রান্সের একাংশ, সমস্তই অচিরে মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিল। মহম্মদের মৃত্যুর পর এক শত বৎসর না হইতেই পশ্চিমে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর হইতে পূর্ব্বে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত মুসলমান-রাজ্য বিস্তার হইল।

মুহালিব। মহম্মদের মৃত্যুর ৩২ বৎসর পর, অর্থাৎ ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে মুহালিব নামক একজন মুসলমান সেনাপতি সসৈন্যে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া, মুলতানপ্রদেশ ভেদ করিয়া অনেক বন্দী লইয়া গিয়াছিলেন, মুসলমানদিগের এই প্রথম ভারত আক্রমণ।

কাসিম। ৭১১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ কাসিম ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া সিন্ধুনদের মুখের নিকট দেবাল নামক প্রসিদ্ধ বন্দর আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণের কারণ এই যে, সেই বন্দরের হিন্দুগণ আরবদিগের একটি বাণিজ্যপোত কাড়িয়া লইয়াছিল। কাসিম অচিরে দেবাল নগর হস্তগত করিয়া প্রথমে ব্রাহ্মণাবাদ, পরে নিরুন, ও তৎপরে সেহওয়ান নগরে যাত্রা করিলেন, ও পরিশেষে শেষোক্ত নগর বেষ্টন করিলেন। সে নগরও হস্তগত করিয়া দাহির রাজার রাজধানী আলোর নগরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

দাহির রাজা পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া আপন ভগ্ন সৈন্যকে উৎসাহ দিতে দিতে সম্মুখরণে প্রাণদান করিলেন। কাসিম রাজধানী বেষ্টন করিলেন। রাজপুতগণ এক্ষণে রক্ষার উপায় না দেখিয়া আপনাদিগের চিরপ্রথা অবলম্বন করিল। নারীগণ উল্লাসের সহিত চিতারোহণ করিল, যোদ্ধাগণ খড়্গহস্তে নগরদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সকলে সম্মুখরণে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে আলোর মুসলমানের হস্তগত হইল, অচিরে সমগ্র মুলতান ও দাহির রাজার সমস্ত রাজ্য কাসিম অধিকার করিলেন।

এই সময়ে সহসা কাসিমের গতিরোধ হইল। কথিত আছে যে, তিনি রাজা দাহিরের দুই কন্যাকে অতিশয় লাবণ্যময়ী দেখিয়া উপঢৌকন স্বরূপ কালীফের নিকট পাঠাইয়া দেন। জ্যেষ্ঠা কালীফের নিকটে আনীতা হইয়া সাশ্রুনয়নে জানাইলেন যে, তিনি কালীফের প্রণয়ের অযোগ্যা, কেন না কাসিম পূর্ব্বেই তাঁহার সতীত্ব হরণ করিয়াছেন। কালীফ ক্রোধে সত্যমিথ্যাবিচারশক্তিরহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কাসিমের মৃত্যুর আদেশ প্রচার করিলেন ও অচিরে কালীফের আদেশানুসারে কাসিমের মৃতদেহ সেই রাজকন্যা-সমীপে আনীত হইল। তখন রাজকন্যা আনন্দে হাস্য করিয়া কহিলেন, কাসিম নির্দ্দোষী, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু ও বংশ-ধ্বংসের অদ্য প্রতিশোধ হইল!

এ গল্প সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, ভারতবর্ষে মুসলমান-বিজয় আপাততঃ ক্ষান্ত হইল। প্রায় ৪০ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হিন্দুগণ পুনর্ব্বার মুসলমানদিগের হস্ত

হইতে স্বদেশ কাড়িয়া লইল। তা[illegible]লমান অধিকার একবারে লোপ হইল।

ইহার পর দুই শত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত মুসলমান-গণ ভারত-বিজয়ের কোনও উদ্যম করে নাই।

আলপ্‌তগীন ও সবকৃতগীন। আলপ্‌তগীন নামক এক জন তুর্কীদেশীয় ক্রীতদাস কালীফের অধীনে খোরাসান দেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। কালক্রমে কর্ম্ম-চ্যুত হইয়া ৯৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি সসৈন্যে পলায়ন করিয়া গজনীতে একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ক্রীতদাস ও জামাতা সবকৃতগীন গজনী রাজ্যের রাজা হইলেন।

ভারতবর্ষের সন্নিকটে এই নূতন রাজ্য দেখিয়া হিন্দুগণ ঈর্ষ্যাযুক্ত হইল ও লাহোরাধিপতি জয়পাল অনেক সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পেশাবর হইতে কাবুল পর্য্যন্ত যে পর্ব্বত-উপত্যকা গিয়াছে, সেই পথ দিয়া জয়পাল যাত্রা করিয়া সবকৃত-গীনের শিবিরের সম্মুখীন হইলেন। কথিত আছে, সেই সময়ে অতিশয় ঝড় ও বৃষ্টি হওয়ায় হিন্দুগণ ভীত হইয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল এবং সবকৃতগীনকে ৫০টি হস্তী দান করিয়া ও বহু অর্থ দিবার অঙ্গীকার করিয়া সন্ধি ক্রয় করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

স্বদেশে আসিয়া জয়পাল অর্থদানে অসম্মত হইলেন; তাহাতে সবকৃতগীন ক্রুদ্ধ হইয়া হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিতে আসিলেন। জয়পাল অন্যান্য হিন্দুদিগের সহায়তায় এক লক্ষ সৈন্য জড় করিলেন, কিন্তু যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ করিল, ও

সবকৃতগীন সিন্ধুনদের পশ্চিম কূল পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিলেন, ও পেশাবরে দশ সহস্র সৈন্য রাখিয়া গজনী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৯৯৭ খৃষ্টাব্দে সবকৃতগীনের মৃত্যু হয়, ও তাঁহার পুত্র প্রসিদ্ধনামা মাহমুদ গজনীর রাজা হইলেন।

সুলতান্ মাহমুদ। মাহমুদ রাজত্বলাভের কতিপয় বৎসর পরে কালীফের অধীনতা অস্বীকার করিয়া আপন স্বাধীনতা প্রচার করিলেন ও সুলতান নাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে এই নাম কোন মুসলমান গ্রহণ করে নাই। পরে তিনি দ্বাদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া হিন্দু রাজাদিগকে বার বার যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া নগর-লুণ্ঠন, দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করেন। সেই প্রসিদ্ধ দ্বাদশ আক্রমণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে।

১০০১ খৃষ্টাব্দে মাহমুদ প্রথম বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। পেশাবরের নিকট লাহোররাজ জয়পালকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিলেন ও সিন্ধুনদ পার হইয়া বাতিণ্ডা নগর লুণ্ঠন করিলেন। পরে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বহু মুদ্রা লইয়া জয়পাল ও অন্য বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। জয়পাল এ অবমাননা তিরোহিত করিবার জন্য আপন পুত্র অনঙ্গপালকে রাজ্য দান করিয়া চিতারোহণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

ভাটিয়ার রাজা মাহমুদকে কর দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে মাহমুদ দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভাটিয়ারাজ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আত্মহত্যা করেন।

মুলতানের মুসলমান শাসনকর্ত্তা, মাহমুদের অধীনতা অস্বীকার করিয়া অনঙ্গপালের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাকে

শাস্তি দিবাব জন্ত মাহমুদ তৃতীয় বার ভারতবর্ষে প্রবেশ কবিলেন। পথে বাজা অনঙ্গপাল মাহমুদের গতি রোধ করিলেন, কিন্তু পেশাববেব যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন ও কাশ্মীবে পলাযন কবিলেন। মাহমুদ মুলতান বেষ্টন করিলেন, পবে মুলতানেব শাসনকর্ত্তা মাহমুদেব অধীনতা স্বীকার করিলে, স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন কবিলেন।

অনঙ্গপালকে শাস্তি দিবাব জন্ত মাহমুদ চতুর্থ বাব ভাবতবর্ষে প্রবেশ কবিলেন। অনঙ্গপালও মুসলমানেব বাব বার আক্রমণ বোধ কবিবার জন্ত উজ্জয়িনী, গোবালিযব, কালিঞ্জব, কান্যকুব্জ, দিল্লী ও আজমীরের ভূপতিদিগেব সহায়তা গ্রহণ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক সৈন্য জড় করিযা শত্রুর জন্য অপেক্ষা কবিতেছিলেন। মাহমুদ এত অধিক সৈন্য দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন, ও একবাবে আক্রমণ না কবাতে কয়েক দিন দুই দলেব সৈন্য পবস্পবের সম্মুখীন হইযা বহিল। অবশেষে যে তুমুল সংগ্রাম হইল, তাহাতে মুসলমানগণ পুনরায জয়লাভ কবিল; ও মাহমুদ পঞ্জাবে প্রবেশ কবিযা নগবকোটের প্রসিদ্ধ পর্ব্বত-মন্দিব লুণ্ঠন করিলেন। তথায় বহু সুবর্ণ, বৌপ্য, মণিমাণিক্য ও অর্থ প্রাপ্ত করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন কবিলেন।

মুলতানেব আফগান শাসনকর্ত্তাকে শাস্তি দিবাব জন্ত মাহমুদ পঞ্চম বার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন। এ বাব তাঁহাকে বন্দী কবিয়া গজনী লইয়া গেলেন।

ষষ্ঠ বাব আক্রমণে প্রায় যমুনার তীর পর্য্যন্ত আসিয়া থানেশ্বরের প্রসিদ্ধ [illegible] লুণ্ঠন করিয়া গেলেন।

সপ্তম ও অ[illegible]ন কাশ্মীরে প্রবেশ করি-
লেন। তথাক[illegible] বরফে তাঁহার অনেক
সৈন্যের প্রাণনা[illegible]

নবম বার [illegible]। কান্যকুব্জের সন্নিধানে
আসিয়া উপস্থি[illegible] রাজা সহসা শত্রুকে
নিকটে দেখিয়া [illegible] সপরিবারে মাহমুদের
অধীনতা স্বীকার[illegible]ই নম্রতায় সন্তুষ্ট হইয়া
কান্যকুব্জের উপর [illegible] তথা হইতে মথুরা
যাইয়া, তথায় বহুস[illegible]রিলেন ও লোক-হত্যা
করিলেন। পরে অ[illegible]কার করিয়া ও সমস্ত
প্রদেশ ছারখার ক[illegible]রিলেন। মাহমুদ
ও তাঁহার সঙ্গীগণ [illegible] দেখিয়া ও কান্যকুব্জ,
মথুরা প্রভৃতি নগরের [illegible] অসংখ্য হর্ম্ম্যাদি দেখিয়া
যৎপরোনাস্তি বিস্মিত [illegible] বিশেষতঃ কান্যকুব্জের
রাজপ্রাসাদ, হর্ম্ম্যাদি [illegible] অনেক মুসলমান
লেখকে লিখিয়া গিয়াছেন; [illegible]ক জন বাড়াইয়া
লিখিয়াছেন যে, এই স্থা[illegible]য়ের জন্য ত্রিংশৎ
সহস্র দোকান ছিল। [illegible] স্বয়ং গজনীর
শাসনকর্ত্তাকে লিখিয়াছি[illegible]মানধর্ম্মের ন্যায়
চিরস্থায়ী সহস্র প্রাসাদ [illegible]ধ্যে অধিকাংশই
মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত ; তদ্ভি[illegible] মন্দির আছে।
বহু লক্ষ দীনার ব্যয় না [illegible]র্মিত হয় নাই ;
এরূপ আর একটি নগরী [illegible] নির্ম্মিত হইতে
পারে না।”

নিজ সুহৃদ্ কান্যকুব্জরাজের সহায়তা করিবার জন্য মাহ-মুদ দশম বার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, কিন্তু মাহমুদ আসিবার পূর্ব্বেই সেই রাজা কালিঞ্জরাধিপতি কর্তৃক হত হয়েন। মাহমুদ এই রাজাকে শাস্তি দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিফল প্রযত্ন হইলেন। অনঙ্গপালের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় জয়পাল এ বার মাহমুদের গতি রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফল প্রযত্ন হইলেন না; সুতরাং মাহমুদ সমস্ত লাহোর প্রদেশ অর্থাৎ পঞ্জাব আপন অধীনে আনিলেন। সিন্ধুর পূর্ব্বদিকে মুসলমান-দিগের এই প্রথম স্থায়ী বিজয়।

কালিঞ্জরের রাজাকে শাস্তি দিবার জন্য মাহমুদ আর এক বার (একাদশ) ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু এ বারও বিফল প্রযত্ন হইলেন।

১০২৪ খৃষ্টাব্দে মাহমুদ শেষ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এ বার তিনি মরুভূমি পার হইয়া আজমীরে উপস্থিত হইলেন ও সেই প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া গুর্জ্জরের রাজধানী আন্হালবারায় উপস্থিত হইলেন। সহসা মুসলমানদিগের আগমন দেখিয়া তথাকার রাজা নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তথা হইতে মাহমুদ সোমনাথের প্রসিদ্ধ মন্দিরে আগমন করিলেন। দুই দিন পর্য্যন্ত মাহমুদের সৈন্যগণ বার বার প্রাচীর অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিল, হিন্দুগণ অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া, প্রাচীর ও মন্দির রক্ষা করিতে লাগিল। তৃতীয় দিবস আন্হালবারার রাজা ও অন্যান্য নিকটস্থ রাজগণ সোমনাথ রক্ষার্থ সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। মাহমুদ এই ঘোর বিপদেও ভগ্নোৎসাহ না হইয়া সেই আগন্তুকদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। রাজা-

দিগের পরাজয় দেখিয়া মন্দিরবাসীগণ ভীত হইয়া আর মন্দির রক্ষার চেষ্টা না করিয়া পোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্র দিয়া পলায়ন করিল; মাহমুদ সোমনাথে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছা লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। তথা হইতে মুলতান দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার পর মাহমুদ পারস্য প্রদেশও জয় করিলেন। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে এশিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাজা, পারস্য, কাবুল ও পঞ্জাবের অধিপতি সুলতান মাহমুদ প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার অসাধারণ সাহস যুদ্ধ-কৌশল ও মানসিক ক্ষমতা ছিল; অনেকগুলি সদ্‌গুণও ছিল, তাহার সন্দেহ নাই, তথাপি তিনি ভারতবাসীদিগের পক্ষে কৃতান্তস্বরূপ হইয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষে কেবল মনুষ্যহত্যা, নগর-লুণ্ঠন, দেব ও ধর্ম্মের অবমাননা ও নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়া আপনার নাম অপযশে পূর্ণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধনামা পারস্য-কবি ফর্দুসী সুলতান মাহমুদের সভাসদ্ ছিলেন।

গায়েসুদ্দীন গোরী ও সাহাবুদ্দীন্ গোরী।—

মাহমুদের মৃত্যুর পর প্রায় একশত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নাই। কিন্তু পঞ্জাব মুসলমানদিগের অধীনেই রহিল। এই সময়ের মধ্যে মাহমুদের রাজধানী গজনী নগরের ধ্বংসসাধন হইয়াছিল। গোর নগরের আল্লাউদ্দীনের সহিত গজ্‌নীরাজ বেহরামের কলহ হওয়ায় আল্লাউদ্দীন বিজয়লাভ করিয়া কয়েক দিন পর্য্যন্ত গজনী নগরী বহ্নি ও অসি দ্বারা ছারখার করিলেন, ও সেই প্রসিদ্ধ ও সুন্দর রাজধানী একেবারে ভূমিসাৎ করিলেন। ১১৫২ খৃষ্টাব্দে

গজনী ধ্বংশপ্রাপ্ত হইল, তাহার কিছু পরে গজনীরাজ্যও বিলুপ্ত হইল।

আল্লাউদ্দীনেব মৃত্যুর পর তাঁহাব পুত্র সৈযফুদ্দীন এক বৎসব কাল বাজত্ব কবেন। তৎপবে গায়েসুদ্দীন গোবী রাজ্য লাভ কবিযা আপন ভ্রাতা সাহাবুদ্দীনেব হস্তে, যুদ্ধভাব সমস্ত ন্যস্ত কবিলেন। প্রসিদ্ধনামা সাহাবুদ্দীনই ভাবতবর্ষ জয় কবেন। ইনি ইতিহাসে মহম্মদ গোবী নামেই বিশেষ খ্যাত।

সাহাবুদ্দীন প্রথমে পঞ্জাবে গজনীব বাজ্য ধ্বংশ করিযা সেই প্রদেশ আপন অধীনে আনিলেন পবে হিন্দুদিগেব সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে তিবৌবীব ক্ষেত্রে সাহাবুদ্দীনেব সহিত দিল্লীশ্বব পৃথুবায়েব সহিত যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে সাহাবুদ্দীন পবাজিত হইযা স্বদেশে পলাযন করিলেন। দুই বৎসব পবে সাহাবুদ্দীন পুনবায় ভাবতবর্ষে প্রবেশ কবিলেন; এবং এ বাব যুদ্ধে পৃথুবাযকে পবাস্ত করিযা দিল্লী ও আজমীর অধিকাব কবিলেন। কুতবুদ্দীন নামক দাসকে ভাবতবর্ষে বাখিযা স্বদেশে প্রত্যার্ত্তন কবিলেন, পববৎসর অর্থাৎ ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দীন কান্যকুব্জ রাজ্য জয কবিলেন। কুতবুদ্দীন গোবালিয়ব জয কবিলেন, ও তাঁহাব অধীনস্থ বখ্তিযাব খিলজী নামক একজন সেনা, বিহাব ও বঙ্গদেশ জয় কবিলেন।

১২০২ খৃষ্টাব্দে গাযেসুদ্দীন গোরীব মৃত্যু হইলে সাহাবুদ্দীনই বাজা হইলেন; চাবি বৎসর পরে সাহাবুদ্দীনেব মৃত্যু হইলে ১২০৬ খৃষ্টাব্দে কুতবুদ্দীন ভাবতবর্ষের স্বাধীন মুসলমান বাজা হইলেন।

মুসলমান বিজয়ের ফল।—বিদেশীয় বিজয় হইতে কখন কখন সুফল উৎপন্ন হয়। বিজেতাগণ যখন বিজিতদিগেব অপেক্ষা অনেক সুসভ্য হয়, তখন বিজিতদিগকে সভ্যতা দান করিয়া অনেক উপকাব সাধন করিতে পাবে। এইরূপে বোমীযগণ গল, ব্রিটেন প্রভৃতি অসভ্য দেশ জয় করিয়া সভ্যতার আলোক বিস্তাব করিয়াছিল; এবং এইরূপে ইউরোপীয়গণ প্রশান্ত মহাসাগবেব অসংখ্য দ্বীপেব অধিবাসীদিগকে সভ্য কবিতেছে। বিজেতাগণ যখন অধিকতব বলবান্ ও পরাক্রান্ত হয়, তখন নির্জ্জীব বিজিতদিগেব সহিত মিলিত হইয়া কখন কখন তাহাদিগকে বলবান্ কবিতে পাবে।

মুসলমান-বিজয় হইতে ভাবতবাসীদিগেব এ দুইটিব মধ্যে কোনও উপকাবই হয় নাই। মাহমুদ ও সাহাবুদ্দীনের স্বদেশীয় অপেক্ষা হিন্দুগণ অনেক সভ্য ছিল, সুতরাং বিজেতাদিগকে সভ্যতা দান কবিয়াছিল, কিছু গ্রহণ করিতে পাবে নাই। পবে যখন তৈমুববংশজগণ ভাবতবর্ষ জয় কবিল, তখন তাহাবাও ভাবতবর্ষ হইতে সভ্যতা লাভ কবিল, ভারতবর্ষকে সভ্যতা দান কবে নাই। পৃথিবীব মধ্যে সমস্ত মোগলবিজিত প্রদেশ অপেক্ষা আকবব-শাসিত প্রদেশ ও আকবরেব বাজধানী ও বাজসভা সভ্য ছিল; সে সভ্যতা মোগলগণ ভারতবর্ষে আনে নাই, সেটি ভাবতবর্ষে উৎপন্ন, ভাবতবর্ষে বিজিত হিন্দুদিগের নিকট শিক্ষিত।

দ্বিতীযতঃ মুসলমানগণ হিন্দুদিগের অপেক্ষা অনেক পরাক্রান্ত ছিল, তাহাব সন্দেহ নাই। কেবল তিবৌরীর যুদ্ধ ভিন্ন সমস্ত যুদ্ধে মুসলমান আক্রমণকারীগণ জয়লাভ করিয়াছিল, এবং

পরিশেষে কয়েক সহস্রমাত্র মুসলমান পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া অনায়াসে শাসন করিতে লাগিল; কয়েক কোটি হিন্দু এই বিজেতাদিগকে তাড়াইতে পারিল না। এইরূপ পরাক্রান্ত জাতি যদি হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইয়া যাইত, তাহা হইলে হিন্দুগণ অধিকতর বলবান্ ও রণপটু জাতি হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু মুসলমান বিজেতাগণ কোনও দেশের লোকের সহিত মিলিত হইতে পারে নাই, অন্য স্থানে যেরূপ, ভারতবর্ষেও সেইরূপ ধর্ম্মবিদ্বেষ ঘটাইয়াছে, সুতরাং তাহাদিগের বিজয় হইতে দুই জাতির একীকরণ হইল না, ভারতবর্ষ জাতীয় বলের উৎকর্ষ লাভ করিল না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বিদেশীয় বিজয় হইতে কখন কখন বিজিতদিগের উপকার হয়, কিন্তু প্রায়ই অতিশয় অনিষ্ট ও অপকার হয়। তাহার কারণ এই যে, বিজিতগণ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ ও জাতিমর্য্যাদা হারায়, বিজেতাদিগের অধিক পরাক্রম দেখিয়া নিরাশ হয় ও ক্রমে ক্রমে অধিকতর নির্জ্জীব হয়, অধীনতা ও অবমাননা সহ্য করিতে করিতে সাহস ও স্বাবলম্বন হারায়, শেষে বিজেতাদিগকে উৎকৃষ্ট ও আপনাদিগকে অপকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া কেবল অনুকরণ-পটু হয়, উদ্যম ও স্বচিন্তা একেবারে হারায়। বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মুসলমান-বিজয় হইতে ভারতবর্ষের এই সমস্ত অনিষ্ট উৎপাদন হইয়াছিল; মুসলমান-শাসনকালে ভারতবাসীদিগের জাতীয় বল যেরূপ হীন হইয়াছিল, চিন্তাবল, কার্য্যবল যেরূপ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, সেরূপ পূর্ব্বে কখন হয় নাই।

খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারত-

বর্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছিল। আর্য্য ভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি চিরস্মরণীয় ধীশক্তিসম্পন্ন লোক যে সমস্ত উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আধুনিক ইউরোপীয়গণও বিস্মিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য্য জগদ্বিখ্যাত লীলাবতী ও বীজগণিত রচনা করেন তাহার পর-শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমান-বিজয় ঘটিল; তৎক্ষণাৎ যেন মন্ত্রবলে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, বিজ্ঞানচর্চ্চা বিদূরিত হইল। তাহার কারণ রাজকীয় স্বাধীনতা না থাকিলে চিন্তার স্বাধীনতা থাকে না, জাতীয় সাহস ও বিক্রম ধ্বংশ হইলে চিন্তার বিক্রম ও সাহস ধ্বংশ হয়।

কাব্যেও এইরূপ। প্রসিদ্ধনামা কালিদাস বোধ হয়, খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন, বাণভট্ট সপ্তম শতাব্দী ও ভবভূতি অষ্টম শতাব্দীতে আপন আপন চিরস্মরণীয় পুস্তক রচনা করেন। অন্যান্য কবির কথায় আবশ্যক নাই, বঙ্গদেশে দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেন। তাহার পর শতাব্দীতে মুসলান-বিজয় ঘটিল, সহসা যেন মন্ত্রবলে কল্পনা সূত্র ছিন্ন হইল, কল্পনাশক্তির লোপ হইল। মুসলমান বিজয়ের পাঁচ শত বৎসর পর পর্য্যন্ত এক জন প্রসিদ্ধ-সুকবি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই; কালিদাস ও ভবভূতির উত্তরাধিকারী নাই। তাহার কারণ, জাতীয় স্বাধীনতা ও সাহসের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার স্বাধীনতার লোপ হয়।

চিন্তা ও কল্পনায় যেরূপ, কার্য্যেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। যে হিন্দুদিগের যুদ্ধশিক্ষা গ্রীক ও চীনগণ প্রশংসা করিয়াছে, যাহারা পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমান আক্রমণকারীদিগের

সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, মুসলমান-বিজয়ের পর তাঁহাদিগের যুদ্ধক্ষমতা ও সাহস যেন সহসা লোপ হইল, পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত (কেবল রাজপুত ভিন্ন) কোনও জাতি স্বাধীনতালাভের বা বিধর্ম্মীদিগকে দূরীকরণের বিশেষ চেষ্টা করিল না।

খৃষ্টের জন্মের সময়ে হিন্দুগণ যব দ্বীপ আবিষ্কার করিয়াছিল ও তাহার পর বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত সিংহল, যব, সুমাত্রা, চীন পর্য্যন্ত গমনাগমন করিয়া বাণিজ্য করিত। খৃষ্টের পর অষ্টম শতাব্দীতে হুয়েন সাঙ্ বঙ্গদেশে তাম্রলিপ্তি ও অন্যান্য বন্দর হইতে অর্ণব পোত সিংহল দ্বীপে গমনাগমন করিতেছে একপ দৃষ্টি করেন। বিদেশীয় বিজয়ে সহসা একপ বলহীনতা হইল যে, ইদানীং হিন্দুগণ সমুদ্র গমনের নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠিত, সমুদ্র-গমন করিলে জাতিভ্রষ্ট হইত।

ভাস্করকার্য্য, হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ ও শিল্প কার্য্যে হিন্দুগণের কল্পনাশক্তির অধিক পরিচয় নাই, তথাপি তাহারা যে অসাধারণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কার্য্য নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে, তাহার উপর যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারুকার্য্য রাখিয়া গিয়াছে, তাহা যিনি দেখেন, তিনিই বিস্মিত হয়েন। কিন্তু এ সমস্ত কার্য্যই হিন্দু-স্বাধীনতার সময়ে সাধিত হইয়াছিল, মুসলমান-বিজয়ের পর কার্য্যক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছিল। এলোরা ও এলিফাণ্টার বিস্ময়কর খোদিত গহ্বর, উড়িষ্যার চমৎকার খন্দগিরি ও অসংখ্য হর্ম্ম্যাদি হিন্দুশাসন-সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মুসলমান-শাসন-সময়ে মুসলমানগণ অনেক প্রাসাদ ও মস্‌জীদ প্রস্তুত করিয়াছেন, হিন্দুদিগের কার্য্যক্ষমতা লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল।

আর অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক। যে গুলি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মুসলমান-বিজয় হইতে ভারতবাসীগণ বিশেষ কোন উপকার গ্রহণ করে নাই; বরং তাহাদিগের জাতীয় জীবন দিন দিন ক্ষীণ ও বল-শূন্য হইয়াছিল, সুতরাং জীবনের সমস্ত বিকাশ, চিন্তা, কল্পনা, সাহস ও কার্য্যক্ষমতা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পাঠান-শাসন।

১২০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

দাসবংশ। ১২০৬—১২৮৮ খৃঃ অব্দ। (১) কুতবুদ্দীন, ১২০৬—১০। ইনি ক্রীতদাস ছিলেন, এজন্য তাঁহার বংশীয় রাজগণ দাসবংশ বলিয়া খ্যাত। সাহাবুদ্দীনের জীবদ্দশায়ই কুতবুদ্দীন ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; ১২০৬ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দীনের মৃত্যু হওয়ায় কুতবুদ্দীন স্বাধীন সম্রাট হইলেন। চারি বৎসর কাল সুশাসন করিয়া তিনি ১২১০ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হয়েন।

(২) আরাম, ১২১০। কুতবুদ্দীনের অযোগ্য পুত্র এক বৎসর কাল রাজত্ব করেন।

(৩) আলতামস, ১২১০-৩৫। তাহার পর তাঁহার ভগিনী

পাত শামসুদ্দীন আল্‌তামস শ্যালকের হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া স্বয়ং সম্রাট্‌ হইলেন। আল্‌তামস কুতবের ক্রীতদাস ছিলেন, পরে নিজ-ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে উন্নতি প্রাপ্ত হয়েন।

(ক) আল্‌তামসের রাজত্বকালে জঙ্গীস খাঁ ও তাঁহার মোগল সৈন্য ভীষণ বাত্যার ন্যায় এশিয়ার পূর্ব্ব অন্ত হইতে পশ্চিম অন্ত পর্য্যন্ত ও ইউরোপের কতক অংশ জয় করিয়াছিল ও সকল স্থানই নগরবিনাশ, দেশধ্বংশ ও নরহত্যার দ্বারা কলুষিত করিয়াছিল। খারিজমের রাজা স্বদেশ রক্ষার্থ প্রাণত্যাগ করেন; তাঁহার পুত্র জেলালুদ্দীন সিন্ধুতীরে মোগলদিগের নিকট পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া আলতামসের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধিমান্‌ আলতামস্‌ জেলালুদ্দীনকে সহায়তা দান করিলে মোগলদিগকে ভারতবর্ষে ডাকিয়া আনা হইবে মনে করিয়া, সাহায্য অস্বীকার করিলেন। জেলালুদ্দীন সিন্ধুপ্রদেশ জয় করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া, অবশেষে মোগল-ত্যক্ত পারস্যদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করিলেন।

(খ) এই ভয়ানক মোগলবিপ্লব ক্ষান্ত হইলে আলতামস সিন্ধুপ্রদেশ জয় করেন। তথাকার অধিপতি নাসীরুদ্দীন পলায়নকালে দৈবযোগে সিন্ধু নদীতে সপরিবারে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

(গ) তৎপরে বিহার ও বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা বখ্‌তিয়ার খিল্‌জীকে পরাস্ত করিয়া নিজের পুত্রকে সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। বখ্‌তিয়ার বিহার পুনরায় হস্তগত করিবার উদ্যম করেন ও সেই উদ্যমে হত হয়েন।

(ঘ) হিন্দুস্থানের মধ্য অংশ (মালবপ্রদেশ) এ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল, আল্‌তামস্ তাহাই জয় করিবার উদ্যোগ করিলেন। প্রথমে রিন্তাম্বর তৎপরে প্রসিদ্ধ মাণ্ডুনগরী হস্তগত করিলেন, বিদ্রোহী গোয়ালিয়র নগর পুনর্বায় জয় করিলেন, পরে ভীলসা ও পুরাতন উজ্জয়িনী নগর হস্তগত করিয়া মালব-বিজয় সমাপ্ত করিলেন। এইরূপে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত দিল্লীর বশীভূত করিয়া পঞ্চবিংশ বৎসর রাজ্যের পর আল্‌তামস্ ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে কাল-গ্রাসে পতিত হয়েন।

(৪) রুকনুদ্দীন, ১২৩৫-৩৬। আল্‌তামসের অযোগ্য ও বিলাসপটু পুত্র কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করিলেন।

(৫) রিজিয়া, ১২৩৬-৩৯। তৎপরে আল্‌তামসের কন্যা রিজিয়াবেগম সিংহাসন আরোহণ করেন। রিজিয়া বিদ্যাবতী ও কার্য্যক্ষম ছিলেন, তিনি পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া প্রত্যহ সিংহাসনে বসিতেন ও কখন কখন বিচারকার্য্য সম্পাদন ও শাসনবিধি লিপিবদ্ধ করিতেন। কিন্তু অবশেষে এক জন সামান্য কর্ম্মচারীর প্রতি অতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করাতে সকলে বিরক্ত হইলেন, ও বাতিণ্ডাদুর্গপতি আলটুনীয়া বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিলেন। রিজিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। কিছু দিন পরে আলটুনীয়া বন্দী রিজিয়ার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন ও দুই জনে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া এবার উভয়ে বন্দী হইলেন ও ১২৩৯ খৃষ্টাব্দে নিহত হইলেন।

(৬,৭) বেহরাম, ১২৩৯-৪১; মসায়ুদ, ১২৪১-৪৬। রিজি-

তার পর আল্‌তামসের পুত্র বেহরাম ও রুকনুদ্দীনের পুত্র মসায়ুদ ক্রমান্বয়ে দুই বৎসর ও পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহারা দুই জনই অযোগ্য ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের রাজ্যকালে মোগলেরা বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে।

(৮) নাসীরুদ্দীন, ১২৪৬-৬৬। আল্‌তামসের যে পুত্র বিহার ও বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র নসীরুদ্দীন মাহমুদ ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করিয়া বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। আল্‌তামসের এক জন ক্রীতদাস গীয়াসুদ্দীন আপন বুদ্ধি বলে উন্নতি লাভ করিয়া আল্‌তামসের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তিনি নাসীরুদ্দীনের মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত হইলেন। শান্তপ্রকৃতি নাসীরুদ্দীনের রাজ্যকালে কার্য্যক্ষম গীয়াসুদ্দীনই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন।

(ক) পশ্চিম হইতে মোগলদিগের আক্রমণ নিবারণার্থে গীয়াসুদ্দীন ভারতের পশ্চিম সীমার সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ একত্র করিয়া নিজ আত্মীয় সেরখাঁকে তাহার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন, তথাকার জায়গীরদারদিগকে নিজ নিজ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত রাখিতে বাধ্য করিলেন, এবং স্বয়ং সম্রাটকে এক বার পঞ্জাবে লইয়া গেলেন। সেরখাঁও নিজ কার্য্যের অনুপযুক্ত ছিলেন না; যত বার মোগলেরা আসিল, তত বার তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন, এবং অবশেষে মোগলনগরী গজ্‌নীও হস্তগত করিলেন।

(খ) হিন্দুস্থানের মধ্যে বিদ্রোহী প্রদেশ গুলিও গীয়াসুদ্দীন বশীভূত করিলেন। প্রথমে দিল্লী হইতে বুন্দেলখণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশের স্বাধীনতেচ্ছু হিন্দু রাজাদিগকে বশীভূত করি-

লেন; তৎপরে দিল্লী হইতে চম্বল নদ পর্য্যন্ত মেওয়াতপ্রদেশের পর্ব্বতবাসীগণকে বশ করিলেন। পরে নারওয়ার ও চন্দেরী দুর্গ অধিকার করিলেন, ও মালবপ্রদেশের বিদ্রোহ দমন করিলেন। তৎপরে সিন্ধু ও মেওয়াত প্রদেশের বিদ্রোহ দমন করেন।

কথিত আছে, নাসীরুদ্দীন তাপসের ন্যায় সরল ও বিলাসদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার একমাত্র রাজ্ঞী ছিল, তদ্ভিন্ন নর্ত্তকী বা অন্য ললনা কেহ ছিল না। কথিত আছে, তাঁহার রাজ্ঞী স্বহস্তে স্বামীর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিতেন; একদা অগ্নিতে হস্ত দগ্ধ হওয়ায় একটি দাসী রাখিবার মানস প্রকাশ করিলেন। সম্রাট উত্তর করিলেন যে, দেশের ধন তিনি নিজের সুখের জন্য ব্যয় করিতে পারেন না।

(৯) বুলবন, ১২৬৬-৮৬। নাসীরুদ্দীনের মৃত্যুর পর ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মন্ত্রী ও পিতৃস্বস্পতি গীয়াসুদ্দীন বুলবন আর বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি যুদ্ধপটু ও কার্য্যক্ষম, কিন্তু অতিশয় নিষ্ঠুর ছিলেন।

(ক) যমুনা ও গঙ্গাতীরস্থ হিন্দু-রাজগণ পুনরায় স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করিলেন, ও মেওয়াতদেশের পার্ব্বতীয় লোক পুনরায় বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত করিল। সম্রাট তাহাদিগের সকলকে জয় করিয়া বহুসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ করেন

(খ) বঙ্গদেশের মুসলমান তুগ্রল আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া প্রচার করায় গীয়াসুদ্দীন স্বয়ং রাজধানী সোণারগাঁ (আধুনিক ঢাকার নিকট) আসিয়া অতিশয় সাহসপ্রকাশ করিয়া

সমস্ত বঙ্গদেশ জয় করিলেন। তুগ্রল ও অসংখ্য লোক নিহত হইল।

(গ) তৎপরে মোগলেরা পুনবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল। গীয়াসুদ্দীনের পুত্র তাহাদিগকে বার বার পরাস্ত করিলেন, কিন্তু অবশেষে একটি যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া স্বয়ং নিহত হয়েন। সেই শোকে ও অতিশয় বার্দ্ধক্যবশতঃ গীয়াসুদ্দীন অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ভারতবর্ষ ভিন্ন প্রায় সমস্ত মুসলমান রাজ্য এক্ষণে মোগল-বশীভূত হইয়াছিল, এবং সেই দেশের রাজগণ স্বদেশচ্যুত হইয়া গীয়াসুদ্দীনের রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। গীয়াসুদ্দীনের রাজসভা বিদ্যালোচনা ও কবিত্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল; কবি আমীর খসরুর নাম এত দূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, পারস্যের জগদ্বিখ্যাত কবি সেখ সাদী আমীর খসরুর প্রশংসা-সূচক একখানি পত্র গীয়াসুদ্দীনের নিকট প্রেরণ করেন।

(১০) কৈকোবাদ, ১২৮৬-৮৮। গীয়াসুদ্দীনের পুত্র বাকারা খাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা থাকিতে তাঁহার পুত্র ও গীয়াসুদ্দীনের পৌত্র কৈকোবাদ দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন। এই অযোগ্য বিলাসপটু সম্রাটকে বিলাসে মগ্ন রাখিয়া, তাঁহার মন্ত্রী নিজামুদ্দীন ক্ষমতাপন্ন সমস্ত কর্ম্মচারী ও সভাসদ্‌কে হত্যা করিয়া বা নিজের বশীভূত করিয়া নিজে সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। পুত্রের অসচ্চরিত্র দেখিয়া বাকারা খাঁ অনেক সৈন্য লইয়া বঙ্গদেশ হইতে আগমন করেন; পিতার দর্শনে পুত্র অনুতাপ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু পিতা বঙ্গদেশে চলিয়া গেলে পুনরায় আমোদে রত হইলেন। এইরূপ জঘন্য বিলাসে

কৈকোবাদের শরীর দুর্ব্বল হইল, তখন অনুতাপাপন্ন হইয়া প্রথমে কুপবামর্শদাতা নিজামুদ্দীনকে হত্যা করিলেন; তাহার পব স্বয়ং হত হইলেন। তিনি দুই বৎসব মাত্র রাজত্ব কবিয়াছিলেন। ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় দাস-বংশের বাজত্ব লোপ হইল, খিল্‌জীবংশ দিল্লীর সাম্রাজ্য অধিকাব কবিল।

খিল্‌জীবংশ। ১২৮৮—১৩২১ খৃঃ অব্দ। (১) জেলালুদ্দীন, ১২৮৮-৯৫। কেহ কেহ সন্দেহ কবেন যে, জেলালুদ্দীন, খিল্‌জী কৈকোবাদকে হত্যা কবিযাছিলেন। এ কথা প্রকৃতই হউক বা অপ্রকৃতই হউক, কিন্তু জেলালুদ্দীনের ন্যায দযালু মুসলমান সম্রাট্ কখনও ভাবতবর্ষ শাসন কবেন নাই। তিনি শত্রু জয কবিযা তাহাদিগকে সসৈন্যে ছাড়িয়া দিতেন; একবাব মোগল আক্রমণকাবীগণকে পবাস্ত কবিযা, তাহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে ভাবতবর্ষ হইতে বহির্গত হইতে দিলেন; এবং তাহাব অধীনস্থ শাসনকর্ত্তাদিগকে এত অনুগ্রহ কবিতেন যে, তাহাবা যাহা ইচ্ছা, তাহাই কবিতে লাগিল; দেশেব শাসন-কার্য্য বিশৃঙ্খল হইল।

(ক) তাঁহাব বাজ্যকালে ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাব ভ্রাতুষ্পুত্র আল্লাউদ্দীন খিল্‌জী নর্ম্মদা ও বিন্ধ্যাচল পার হইয়া মহাবাষ্ট্র-দেশেব রাজধানী দেবগিবি আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন। দক্ষিণাপথে মুসলমানদিগেব এই প্রথম প্রবেশ। তথায় বিজয় লাভ কবিয়া আল্লাউদ্দীন পুনবায় হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ কবিলেন।

(২) আল্লাউদ্দীন, ১২৯৫-১৩১৬।

(ক) আল্লাউদ্দীন দিল্লীর অধীশ্বর হইয়া প্রথমে গুর্জ্জরদেশ জয় করিলেন, তথাকার স্বাধীন হিন্দু রাজা দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। গুর্জ্জরদেশ এই অবধি মুসলমানদিগের অধিকারে রহিল।

(খ) ইহার কয়েক বৎসর পরে এক দল পরাক্রান্ত মোগল সৈন্য ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত জয় করিল, কিন্তু আল্লাউদ্দীন তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষ রক্ষা করিলেন। ইহার পরও মোগলেরা আল্লাউদ্দীনের রাজ্য-কালেই বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল, কিন্তু কিছু করিতে না পারিয়া শেষে ক্ষান্ত হইল।

(গ) সম্রাট্ প্রায় এক বৎসরের বহু পরিশ্রম ও যত্নের পর রিস্তাম্বর অধিকার ও তথাকার হিন্দু রাজাকে সপরিবারে হত্যা করিলেন। নগরের সমস্ত লোকও নিহত হইল।

(ঘ) ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আল্লাউদ্দীন শিশোদীয় রাজপুতদিগের প্রসিদ্ধ নগর চিতোর আক্রমণ করেন। কথিত আছে, তিনি চিতোর-রাজ্ঞীর সৌন্দর্য্যবার্ত্তা শুনিয়া এই স্থান আক্রমণ করেন, ও চিতোর লইতে অক্ষম হইয়া, কেবল দর্পণে রাজ্ঞীর ছায়ামাত্র দেখিয়া চলিয়া যাইবেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চিতোর-রাজ সম্রাট্‌কে দুর্গের ভিতর লইয়া গেলেন এবং সম্রাট্ দর্পণে রাজ্ঞীর ছায়া দেখিয়া অধিকতর মুগ্ধ হইলেন। পরে ভদ্রতাচরণ হেতু রাজপুত রাজা যখন আল্লা-উদ্দীনের শিবিরে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, কপট আল্লা-উদ্দীন সন্ধিকথা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন, ও

রাজ্ঞীকে না পাইলে রাজাকে ছাড়িয়া দিবেন না, এইরূপ আদেশ করিয়া, রাজাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। রাজ্ঞী ও তাঁহার সহচরী আসিতেছেন রাজপুতগণ এইরূপ প্রচার করিল; এবং রাজপুত-রমণীর বেশে কয়েক শত রাজপুত সহসা কারাগার আক্রমণ করিয়া স্বীয় রাজাকে উদ্ধার করিল। তাহার পর আল্লাউদ্দীন পুনবায় চিতোর আক্রমণ পূর্ব্বক দুর্গ ধ্বংশ করিয়া ফেলিলেন, এবং মল্লদেব নামক এক জন রাজপুতের হস্তে রাখিয়া গেলেন, কিন্তু মৃত রাজার পুত্র হামির অচিরে পৈতৃক দুর্গ ও স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধার করিলেন।

(ঙ) এক্ষণে আল্লাউদ্দীন দক্ষিণাপথ-বিজয়ের সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেনাপতি মালিক কাফুর ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাপথে যাইয়া দেবগিরির রাজা রামদেবকে বন্দী করিয়া আনিলেন। রামদেব দিল্লীতে আসিয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার পর তিনি আর বিদ্রোহাচরণ করেন নাই। তিন বৎসর পরে কাফুর তৈলঙ্গ পর্য্যন্ত যাইয়া তথাকার হিন্দু রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন, ও বরঙ্গল দুর্গ কাড়িয়া লইলেন। রাজা দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিলেন ও বৎসর বৎসর কর দিতে স্বীকৃত হইলেন। পরবৎসর (১৩১০ খৃঃ অব্দ) কাফুর কর্ণাটপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজধানী দ্বারসমুদ্র হস্তগত করিলেন ও বল্লাল-বংশীয় রাজাদিগের বিনাশসাধন করিলেন। পরে ভারতবর্ষের অতি দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত জয় করিয়া, তথায় মুসলমান-বিজয় চিহ্নস্বরূপ একটি মসজীদ নির্ম্মাণ করাইলেন। দুই বৎসর পরে তিনি আর একবার দক্ষিণাপথ আক্রমণ করিয়া, সমস্ত মহারাষ্ট্র

ও কর্ণাট অতিক্রম করিলেন ও ঐ ঐ স্থানের রাজাদিগের নিকট কর সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। ইহার চারি বৎসর পরে ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে আল্লাউদ্দীনের মৃত্যু হয়। গুর্জ্জরের পরাজিত রাজার স্ত্রী কমলাদেবীকে আল্লাউদ্দীন বিবাহ করিয়াছিলেন ও বেগম-দিগের মধ্যে অতিশয় সম্মান করিতেন ও ভালবাসিতেন। কমলাদেবীর অনুরোধে গুর্জ্জরের শাসনকর্ত্তা আল্প খাঁ কমলার কন্যা দেবলদেবীকে অনেক অনুসন্ধানের পর এলোবার বিচিত্র গহ্বরে প্রাপ্ত হয়েন ও দিল্লীতে আনয়ন করেন; তথায় সম্রা-টের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজর খাঁ তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। এইরূপে কমলাদেবীর কন্যা মুসলমান-সংসারে আসিয়া মাতার পুত্রবধূ হইলেন!

(৩) মুবারক, ১৩১৬-২১। আল্লাউদ্দীনের পুত্র মুবারক পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভেই কাফুর হত হয়েন। আল্লাউদ্দীনের দুই পুত্রকে হত্যা করা হয়। পরে আল্লার কনিষ্ঠ পুত্র অন্ধ ও বন্দী হয়েন।

(ক) সম্রাট্ দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিয়া স্বাধীনতেচ্ছু দেব-গিরিরাজ হরপালকে বন্দী করিলেন ও অতি নৃশংসরূপে হত্যা করিলেন। রাজার জীবদ্দশাতেই তাঁহার শরীর হইতে চর্ম্ম ছিঁড়িয়া লওয়া হইল। এইরূপে মহারাষ্ট্রদেশ জয় করিয়া মুবারক দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন ও জঘন্য বিলাসে পুনর্বার মগ্ন হইলেন।

(খ) সম্রাটের উজীর খসরু খাঁ (যিনি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন) মলবারপ্রদেশ জয় করিলেন ও অচিরে সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। তিনি অনেক পরাক্রান্ত লোককে হত্যা

করিয়া আপনি সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, ও অবশেষে নৃশংস ও বিলাসপটু সম্রাটকে ১৩২১ খৃষ্টাব্দে হত্যা করিলেন ও দেবল-দেবীকে নিজ প্রাসাদে লইয়া গেলেন ও নিজে সম্রাট হইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু অচিরে গীয়াসুদ্দীন তুগলক কর্তৃক পরাস্ত ও নিহত হইলেন।

তুগলকবংশ। ১৩২১—১৪১৪ খৃঃ অব্দ। (১) গীয়াসুদ্দীন, ১৩২১-২৫।

গীয়াসুদ্দীন তুগলক, সম্রাট গীয়াসুদ্দীন বুলবনের এক দাসের পুত্র ছিলেন। তুগলকের মাতা এক জন হিন্দু-রমণী ছিলেন। গীয়াসুদ্দীন পরাক্রান্ত ও সচ্চরিত্র ছিলেন ও তাঁহার শাসনে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

(ক) তিনি পুত্র জুনা খাঁকে দক্ষিণাপথ-বিজয়ে প্রেরণ করিলেন। জুনা তৈলঙ্গ পর্য্যন্ত জয় করিলেন, কিন্তু তথায় বরঙ্গল দুর্গ লইতে অক্ষম হইলেন ও হিন্দুদিগের দ্বারা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। পরবৎসর তিনি পুনরায় দক্ষিণাপথে যাইয়া বিদর জয় করিলেন, ও বরঙ্গল অধিকার ও সমস্ত তৈলঙ্গপ্রদেশ জয় করিয়া, তথাকার রাজাকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া আনিলেন।

(খ) সম্রাট্ গীয়াসুদ্দীন স্বয়ং বঙ্গদেশে যাইলেন। তথায় সম্রাট্ কৈকোবাদের পিতা বাকারা খাঁ এখনও শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তুগলক তাঁহার পিতার দাসপুত্র, সুতরাং তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিলেন। সোণারগাঁএ (আধুনিক ঢাকা) বিদ্রোহ দমন করিলেন। ও দিল্লী-প্রত্যাগমনের সময় মিথিলা-দেশ জয় করিয়া তথাকার হিন্দু রাজাকে বন্দী করিয়া আনিলেন।

(২) মহম্মদ, ১৩২৫-৫১। গীয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর পর জুনা মহম্মদ তগলক নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সম্রাট হইলেন। তিনি অতিশয় বিদ্বান্ ছিলেন, কিন্তু বুদ্ধিমান ছিলেন না; তাঁহার ন্যায় অস্থিরমতি, যথেচ্ছাচারী সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে কখনও আরোহণ করেন নাই। তাঁহার সময়ে মোগলেরা পুনরায় ভারতবর্ষে দেখা দিল।

(ক) মহম্মদের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিত কার্য্যগুলি এক্ষণে আমরা বর্ণনা করিব। তিনি পারস্য-বিজয়ের সঙ্কল্প করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য জড় করিলেন; অনেক অর্থব্যয়ের পর সৈন্যগণ বেতনাভাবে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল ও সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

(খ) চীনদেশ জয় করিবার জন্য লক্ষ সৈন্য সংগৃহীত হইল ও হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু দুই দেশের সীমায় বহুসংখ্যক চীন সৈন্য দেখিয়া মুসলমান সৈন্য প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিল। পথে চীনদিগের আক্রমণে, পার্ব্বতীয় লোকদিগের শত্রুতায়, খাদ্যের অভাবে এবং বৃষ্টি ও জলপ্লাবনে এরূপ কষ্ট পাইল যে, এক জন সৈন্যও ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিল না।

(গ) এই সমস্ত ব্যয়ে রাজভাণ্ডার শূন্য হওয়ায় মহম্মদ তগলক তাম্রের মুদ্রা করাইয়া তাহাকে রৌপ্যমুদ্রার মূল্যে চালাইবার চেষ্টা করিলেন। কেহ সে মুদ্রা সে মূল্যে লইল না; সম্রাট পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ও দরিদ্র হইলেন।

(ঘ) শেষে প্রজাদিগের নিকট হইতে এরূপ কর লইতে লাগিলেন যে, প্রজাগণ দেশ ত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিল;

নগব শূন্য হইতে লাগিল। কৃষকগণ ক্ষেত্র ছাড়িয়া জঙ্গলে পলাইযা দস্যুবৃত্তি দ্বাবা প্রাণ ধারণ কবিতে লাগিল। মহম্মদ বিরক্ত হইয়া এরূপ অত্যাচার কবিতে লাগিল যে, জগতে বোধ হয় কোনও বাজা নিবপবাধী লোকেব উপর সেরূপ অত্যাচাব কবেন নাই। একদা মৃগযার্থ বহু সৈন্য লইয়া বহিষ্কৃত হইয়া, সেই সৈন্য দ্বারা প্রশস্ত প্রদেশ বেষ্টন কবিলেন, পবে আদেশ কবিলেন, আমি মনুষ্য শিকাব কবিতে আসিযাছি। সেই বেষ্টিত প্রদেশেব মধ্যস্থ নির্দোষী কৃষব ও পল্লীবাসী সকলে হত হইল। এইরূপ নৃশংস নবহত্যা অনেক বাব হইযাছিল, এক বাব কান্যকুব্জেব সমস্ত নগববাসী এইরূপে হত হয। এই ভয়ানক অত্যাচারে দুর্ভিক্ষ আবম্ভ হইল; দেশেব সে সমযেব ভযানক অবস্থা বর্ণনাতীত।

(ঙ) বিদ্রোহোন্মুখ দক্ষিণাপথেব বশীকবণ জন্য মহম্মদ দেশেব বাজধানী একবাব দিল্লী হইতে দেবগিবিতে লইযা যাইবাব সঙ্কল্প কবিলেন। তৎক্ষণাৎ দিল্লীব আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে দেবগিবিতে যাইবাব আদেশ দিলেন, ও দেবগিবি নাম পবিবর্ত্তন কবিয়া দৌলতাবাদ বাখিলেন। বাজাদেশে দিল্লী শূন্য হইল। নগববাসীগণ দেবগিবিতে যাইলে পর পুনবায দুই বাব দিল্লীতে আসিবাব অনুমতি প্রাপ্ত হয, পুনরায় দুই বাব দৌলতাবাদে যাইবাব আদেশ হয়। এইরূপ অত্যাচারে বহু লোকেব প্রাণ বিনাশ হয।

(চ) এইরূপ ঘোর অত্যাচাবী সম্রাটেব বিরুদ্ধে চাবি দিকে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ভাবতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্রোহপূর্ণ হইল, সে সকল বিদ্রোহের

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সম্ভবে না ; আমরা সেই বিদ্রোহের প্রধান প্রধান ফল কয়েকটি উল্লেখ করিব। ১৩৪০ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশের মুসলমান বিদ্রোহী স্বাধীনতা লাভ করিলেন, এবং সেই অবধি বহুকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে নাই।

(ছ) ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে করোমণ্ডলপ্রদেশে সৈয়দ হাসান এইরূপ স্বাধীনতা লাভ করিলেন।

(জ) কর্ণাটের হিন্দু রাজা স্বাধীনতা লাভ করিলেন। ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটরাজ বিজয়নগরে নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যেন হিন্দুবিদ্যার নির্ব্বাপিত আলোক পুনরায় প্রদীপ্ত হইল। এই রাজার মন্ত্রী মাধবাচার্য্য (যাঁহার অন্য নাম সায়নাচার্য্য) বেদের যে টীকা করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে। বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্য ইহার পর দুই শত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল।

(ঝ) তৈলঙ্গের হিন্দু রাজা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেন ও বরঙ্গল নগর পুনরায় অধিকার করিলেন।

(ঞ) জফীরখাঁ বা হাসানগাঙ্গু মোগল সেনাপতি ইমাদউল্‌মুলককে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দৌলতাবাদে ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিলেন। কথিত আছে, জফীরখাঁ এক ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছিলেন। ব্রাহ্মণ মুসলমান বালকের বুদ্ধি দেখিয়া তাহাকে স্বাধীন করিয়া দেন। পরে জফীরখাঁ রাজা হইলে, সেই ব্রাহ্মণকে আপন কোষাধ্যক্ষ করেন ; সেই জন্য জফীরের বংশ বাহমনী (ব্রাহ্মণীয়) বলিয়া খ্যাত।

ইহার চারি বৎসর পরে মহম্মদ তগলকের মৃত্যু হয়। ইহার প্রায় তিন শত বৎসর পর পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরগণ দক্ষিণাপথ-

বিজয়ের কোনও চেষ্টা করেন নাই। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যু হয়।

(৩) ফিরোজ, ১৩৫১-৮৯। মহম্মদের পর ফিরোজ তগলক ৩৮ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষ শান্তি লাভ করিল, ও খাল, পুষ্করিণী, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, সাঁকো সরাই প্রভৃতি অনেক হিতকর কার্য্য নির্ম্মাণ হইয়াছিল।

(৪,৫,৬) গীয়াসুদ্দীন, ১৩৮৯; আবুবেকর, ১৩৮৯-৯০; নাসীরুদ্দীন, ১৩৯০-৯৪। তৎপরে দ্বিতীয় গীয়াসুদ্দীন পাঁচ মাস, আবুবেকর এক বৎসর, ও নাসীরুদ্দীন চারি বৎসর রাজত্ব করেন।

(৭) মাহমুদ, ১৩৯৪-১৪১৪। তগলকবংশের শেষ রাজা মাহমুদ দিল্লীর সম্রাট হইয়া বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন।

(ক) তাঁহার সময়ে মালব, খন্দেশ ও গুর্জ্জরপ্রদেশ স্বাধীন হইল; দিল্লীর সাম্রাজ্য কেবল দিল্লী ও চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশে বিস্তারিত রহিল। ফলতঃ ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যে বিভক্ত হইল; প্রধান সম্রাট কেহ রহিল না।

(খ) ভারতবর্ষের এই অবস্থার ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ তৈমুরলঙ্গ এই দেশ আক্রমণ করিলেন। তিনি দেশধ্বংশ, নগরলুণ্ঠন ও নরহত্যা করিতে করিতে দিল্লী পর্য্যন্ত আসিলেন। সেই নগর অধিকার হইলে, পাঁচ দিন পর্য্যন্ত লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল; শেষে তৈমুর অসংখ্য অর্থ লইয়া ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। তৈমুর প্রায় সমস্ত এশিয়া এইরূপে জয় করেন। জেঙ্গিসের সময় হইতে এরূপ মনুষ্যজাতির শত্রু জগতে জন্মগ্রহণ করে নাই।

সৈয়দবংশ। ১৪১৪—১৪৫০ খৃঃ অব্দ। (১, ২ ৩, ৪) এই বংশের খিজীরখাঁ ৭ বৎসর, মুবারক ১৪ বৎসর, মহম্মদ ৯ বৎসর ও আল্লাউদ্দীন ৬ বৎসর দিল্লীর সম্রাট হইয়া রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁহারা নাম মাত্র সম্রাট। দিল্লী ভিন্ন অন্য স্থানে তাঁহাদিগকে কেহ মানিত না।

লোদীবংশ। ১৪৫০—১৫২৬ খৃঃ অব্দ। (১) বেহলুল, ১৪৫০-৮৮। ইনি নিজ পরাক্রমে দিল্লীর অধিকার পুনরায় বিস্তার করেন।

(ক) বেহলুল পূর্ব্বেই সমস্ত পঞ্জাব অধিকার করিয়াছিলেন; এক্ষণে ২৬ বৎসরের যুদ্ধের পর জোয়ানপুর অধিকার করিলেন ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও জয়লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই দিল্লীর সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে যমুনা পর্য্যন্ত ও বারাণসী হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

(২) সেকন্দর, ১৪৮৮-১৫১৬। তিনি বিদ্বান ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, কিন্তু অতিশয় মুসলমানধর্ম্মাসক্ত ও হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন।

(ক) তিনি বিহারপ্রদেশ জয় করিয়া দিল্লীর অধীনে আনেন।

(৩) ইব্রাহিম, ১৫১৬-২৬। ইনি লোদীবংশের শেষ সম্রাট।

(ক) ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে তৈমুর বংশোদ্ভব কাবুলাধিপতি বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন ও পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিমকে হত করিয়া দিল্লীর সাম্রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। পাঠানসাম্রাজ্য তিন শত বিংশতি বৎসরের পর বিলুপ্ত হইল; মোগলসাম্রাজ্য আরম্ভ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পাঠানশাসনের সময়ে ভারতবাসীদিগের অবস্থা।

১২০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে আমরা পাঠান সম্রাটদিগের কার্য্যপরম্পরায় যুদ্ধ, বিজয় ও পরাজয় সমালোচনা করিয়াছি। এই পরিচ্ছেদে আমরা ঐ সময়ের প্রজাদিগের অবস্থা সমালোচনা করিব। সম্রাটদিগের কার্য্যপরম্পরায় প্রকৃত ইতিহাস নহে, প্রজাদিগের অবস্থাই প্রকৃত ইতিহাস; অতএব আমরা অপেক্ষাকৃত অধিক মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রজাদিগের অবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবার চেষ্টা করিব।

উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষ। পশ্চিমে সিন্ধুনদের তট-দেশ হইতে পূর্ব্বে বারাণসী পর্য্যন্ত ও উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে যমুনানদী পর্য্যন্ত প্রশস্ত, উর্ব্বরা ভূমি, ও গঙ্গা, যমুনা ও সিন্ধুতীরবর্ত্তী সুন্দর প্রদেশখণ্ড দিল্লীর অধীন বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে। কেন না যদিও এই প্রদেশের মধ্যে স্থানে স্থানে হিন্দু রাজা বা মুসলমান সুলতানগণ দিল্লীশ্বরের হীনাবস্থার সময় বিদ্রোহাচরণ করিয়া সময়ে সময়ে স্বাধী-নতা লাভ করিতেন, তথাপি সে স্বাধীনতা অতিশয় ক্ষণ-স্থায়ী মাত্র; পরাক্রান্ত একজন সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে সে স্বাধীনতা লোপ করিতেন। পক্ষান্তরে দিল্লীর সম্রাট অতিশয় পরাক্রান্ত হইলে, উপরি উক্ত সীমা অতিক্রম করিয়া দিল্লীর আধিপত্য বিস্তার করিতেন বটে,

কিন্তু সে বিস্তৃতিও ক্ষণস্থায়ী মাত্র; পুনরায় অচিরে লোপ-প্রাপ্ত হইত। অতএব সিন্ধু হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত ও হিমালয় হইতে যমুনা পর্য্যন্ত প্রদেশখণ্ড পাঠান দিল্লীশ্বরদিগের অধীন প্রদেশ বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে।

এই বিস্তীর্ণ প্রদেশখণ্ডে দিল্লীশ্বরদিগের রাজ্যপ্রণালী ও প্রজাদিগের অবস্থা আমাদিগের জানা আবশ্যক। পাঠান দিল্লী-শ্বরগণ রাজসভায় বসিয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে দরখাস্ত গ্রহণ করিতেন ও বিচারকার্য্য সম্পাদন করিতেন। যদিও এরূপে প্রজাদিগকে দর্শন দিয়া তাহাদিগের অনুরাগভাজন হইতেন বটে, তথাপি তাঁহারা স্বয়ং অধিক কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন, তাহা সম্ভব নহে। দিল্লী ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশের বিচারকার্য্য প্রায় সমস্তই কাজীগণ ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীগণ নির্ব্বাহ করিতেন; দূরের প্রদেশে সেই সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহারাই প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতেন, তাঁহারাই বিচার করিতেন, তাঁহা-রাই যুদ্ধের সময় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সম্রাটের সহায়তা বা বিদ্রোহাচরণ করিতেন। ফলতঃ পঞ্জাবের ন্যায় দূর প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণই প্রকৃতপক্ষে সেই সেই প্রদেশের রাজা ছিলেন; কেবল সম্রাটকে কর পাঠাইয়া দিতেন মাত্র।

এই সমস্ত শাসনকর্ত্তাদিগের অধীনে অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত। তাহাদেরও কর আদায় করা ও যুদ্ধের সময় শাসনকর্ত্তাদিগের সহায়তা করা কার্য্য ছিল। শাসনকর্ত্তাগণ হিন্দুগণকে অবিশ্বাস করিতেন না; কর-আদায়-কার্য্য হিন্দু-দিগের দ্বারাই নির্ব্বাহ হইত, এবং প্রায় সমস্ত প্রদেশেই শাসন-

কর্ত্তাদিগের অধীনে হিন্দুরাজগণ পৈতৃক ভূমিতে শাসন করিত ও কর সংগ্রহ করিত। যতদিন তাহারা শাসনকর্ত্তাদিগকে নিয়মিত কর দান করিত ও যুদ্ধের সময় সহায়তা করিত, তত দিন তাহাদিগের উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিত না।

সম্রাট, শাসনকর্ত্তা ও রাজপুরুষগণ যে, সর্ব্বদাই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, এবং সময়ে সময়ে প্রজাদিগের উপর অতিশয় অত্যাচার ও উপদ্রব করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। রাজপুরুষদিগের স্বেচ্ছাচারিতা, ভারতবর্ষ ও জগতের সমস্ত উষ্ণদেশের চিরন্তন প্রথা; তথাপি ভারতবাসীগণ এরূপ অত্যাচার সহ্য করিলেও তাহাদিগের অবস্থা যে, নিতান্ত মন্দ ছিল, এরূপ বোধ হয় না। শান্তকৃষক ও পল্লিবাসীগণ ভারতবর্ষের চিরপ্রথা অনুসারে নিজ নিজ গ্রামের কার্য্য নিজে নিজে নির্ব্বাহ করিত। তাহাদিগের বিবাদ ও বিরোধ তাহাদিগের গ্রাম্য মণ্ডলেরা নিষ্পত্তি করিয়া দিত; তাহাদিগের প্রয়োজনীয় শস্য বা অন্য খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র বা উপকরণ দ্রব্য তাহারা আপনারা প্রস্তুত করিত; তাহাদিগের কুটীরে বাস করিয়া তাহারা পৈতৃক ভূমি চাষ করিত; ও রাজার কর একত্র করিয়া মণ্ডলের হস্তে রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট পাঠাইয়া দিত। রাজাদিগের সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ ছিল না। যখন যিনি সম্রাট বা সুলতান হইতেন, তখন তিনি কর আদায় করিতেন। বিদ্রোহে বা যুদ্ধে তাহারা ব্যতিব্যস্ত না হইয়া পৈতৃক শান্ত ব্যবসায় দ্বারা জীবন যাপন করিত। প্রকৃতপক্ষে এক একটি গ্রামকে এক একটি ক্ষুদ্র কৃষকরাজ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যুদ্ধের পর যুদ্ধে হিন্দুস্থান ও দক্ষিণাপথ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে, বংশের পর বংশ বিনষ্ট হইয়াছে; কিন্তু

এই সুন্দর ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি বিনষ্ট হয় নাই। দেশের যুদ্ধের সময় গ্রামবাসীগণ আপন আপন গ্রাম প্রাচীরদ্বারা বেষ্টন করে। বিনাশক সৈন্য যখন দেশ দিয়া চলিয়া যায়, গ্রামবাসীগণ সাবধানে গোমেষাদি সেই প্রাচীরের ভিতর আনিয়া নিরাপদে রাখে এবং সৈন্যকে বিরক্ত করে না, সৈন্য চলিয়া যাইলে আপনাদিগের শান্ত ব্যবসায় পুনরায় আরম্ভ করে। যদি কখন শত্রু বা সৈন্য আসিয়া তাহাদিগের গ্রাম ধ্বংশ করে, গ্রামবাসীগণ পরিবার ও গোমেষাদি লইয়া নিকটস্থ গ্রামে পলাইয়া যায় ও লুকাইয়া থাকে; লুণ্ঠন ও অত্যাচারকাণ্ড যখন শেষ হয়, শত্রু বা সৈন্য যখন চলিয়া যায়, তখন পুনরায় আপন গ্রামে আসিয়া নিশ্চিন্তে পৈতৃক ব্যবসায় আরম্ভ করে। দশ কি বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত যদি যুদ্ধ বা অত্যাচার বশতঃ গ্রাম পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, সে সময় অতিবাহিত হইলে, পুনরায় গ্রামের লোক বা তাহাদিগের সন্ততিগণ আসিয়া নিজ নিজ ব্যবসায় আরম্ভ করে। এইরূপে পাঠান সম্রাট ও শাসনকর্ত্তাদিগের অসংখ্য যুদ্ধ ও অনন্ত অত্যাচার সত্ত্বেও কৃষকরাজ্যস্বরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য গ্রাম গুলি ধ্বংশপ্রাপ্ত হয় নাই; গ্রামবাসীগণ সকল বিপদ হইতে নিস্তার পাইয়া পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নিজের ও সাম্রাজ্যের অভাব যোগাইত।

এই রূপ কারণ বশতঃ নগরগুলির অবস্থাও নিতান্ত মন্দ ছিল না। অনন্ত যুদ্ধে অনেক সৈন্যের প্রাণ বিনাশ হইত, কিন্তু কদাচ নগর ধ্বংশ হইত। নগরে শাসনকর্ত্তাগণ বা তাহাদিগের কর্ম্মচারীগণ বাস করিত; হিন্দু ধনাঢ্যগণ আপন আপন দেবালয় প্রস্তুত করিত ও দেবপূজার ব্যয় নির্ব্বাহ

করিত; মুসলমান ধনাঢ্যগণ মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার আবশ্যক ব্যযের জন্য অর্থ রাখিয়া যাইত, রাজ্যের ধন সে বিষয়ে প্রায় ব্যয় হইত না। নগরে বণিক ও ব্যবসায়ীগণ বাস কবিত ও আপন আপন বাণিজ্যকর্ম্ম করিত। কাজী বিচাব করিত। প্রধান প্রধান নগবীগুলিতে সম্রাট বা শাসনকর্ত্তাদিগের সৈন্যও, বাস কবিত। ভাবতবর্ষে অতি সুন্দব ও সমৃদ্ধিশালী নগবী অনেক ছিল এবং বাণিজ্যেব বিস্তর ঘটাও ছিল, তাহা পঞ্চদশ শতাব্দীর ভ্রমণকারী কন্টী ও ষোড়শ শতাব্দীর ভ্রমণকারী বার্বোসা ও বার্টেমা দেখিযা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সুতবাং পাঠান সম্রাটদিগেব অনন্ত যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের বিষয় পাঠ কবিলে দেশেব যেরূপ ভয়ানক অবস্থা অনুমান হয়, বাস্তবিক সেরূপ ভয়ানক অবস্থা ছিল না। যুদ্ধে কেবল সৈন্যেব বিনাশ হয়; হত্যাকাণ্ডে কেবল প্রাসাদবাসীগণ বা প্রধান প্রধান আমীব ও ওমবাগণ লিপ্ত থাকিত; তাহাদিগের কার্য্যই সমস্ত ইতিহাস বলিযা আমাদিগেব সর্ব্বদা ভ্রম হয়। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস পাঠ কবিলে, অর্থাৎ প্রজাদিগেব অবস্থা সম্যক সমালোচনা কবিলে ও তাৎকালিক ভ্রমণকাবীদিগের পুস্তক অধ্যয়ন করিলে, বোধ হয় যে, সে অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। পল্লিবাসীগণ চাবি দিকে উপদ্রবেব মধ্যেও কতকটা নিশ্চিন্ততা ভোগ করিযা নিজ নিজ পৈতৃক কার্য্য করিত। নগর সকল সর্ব্বদা অত্যাচার-পীড়িত হইলেও সুন্দর, সমৃদ্ধিশালী ও বাণিজ্যপূর্ণ ছিল; ভাবতবাসীগণের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না।

তথাপি স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের মানসিক ক্ষমতা

অন্তর্হিত হইয়াছিল। পাঠান রাজাদিগের অধীনে হিন্দুগণ শাসনকার্য্য, কর-আদায়-কার্য্য ও বাণিজ্যের অনেকটা ভাগ পাইত বটে, যুদ্ধেও তাহারা সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিত ও তাহাদিগের সামাজিক ও রাজকীয় অবস্থা মন্দ ছিল না বটে, তথাপি হিন্দুগণ পাঠানদিগের অধীন; সেই জন্য মানসিক বল, উদ্ভাবন-ক্ষমতা স্বাধীন-চিন্তা-শক্তি, সুন্দর কল্পনা-শক্তি, এ সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া ছিল।

দক্ষিণাপথ।—অতি প্রাচীন কাল হইতে দক্ষিণাপথে দ্রাবিড়, কর্ণাট, তৈলঙ্গ ও মহারাষ্ট্র, এই চারিটি প্রধান স্বাধীন প্রদেশ ছিল। এই চারিটি প্রদেশের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গুলি রাজ্য ছিল। আধুনিক মান্দ্রাজের দক্ষিণে ভারতবর্ষের যে অংশ, সেইটি দ্রাবিড়প্রদেশ ছিল ও সেই প্রদেশে অনার্য্য তামিল ভাষা পূর্ব্ব হইতে এক্ষণ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। আধুনিক ত্রিবাঙ্কোর ও কর্ণাটিক প্রাচীন দ্রাবিড়ের অন্তর্গত। দ্রাবিড়ের উত্তরে তৈলঙ্গ ও কর্ণাট, এই দুইটি প্রদেশ; তৈলঙ্গ পূর্ব্ব দিকে, অর্থাৎ বঙ্গসাগরের উপকূলে এবং কর্ণাট পশ্চিম দিকে, অর্থাৎ আরবসাগরের উপকূলে। তৈলঙ্গে তৈলঙ্গী বা তেলেগু নামক অনার্য্য ভাষা এখনও প্রচলিত আছে; কর্ণাটে কর্ণাটী বা কানারীস ভাষা প্রচলিত আছে। আধুনিক মহীশূরপ্রদেশ প্রাচীন কর্ণাটের অন্তর্গত ছিল, ও আধুনিক নিজামের রাজ্য তৈলঙ্গের অন্তর্গত। কর্ণাটের উত্তরে পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রদেশ; তাহাতে মহারাষ্ট্রীয় নামক সংস্কৃতমূলক ভাষা প্রচলিত আছে। অতি দক্ষিণে তামিল ও তেলেগু নামক অনার্য্য ভাষা প্রচলিত থাকিবার কারণ বোধ হয় এই যে, তত

দক্ষিণে বহুসংখ্যক আর্য্য যাইয়া উপনিবেশ করে নাই; সুতরাং দ্রাবিড় ও তৈলঙ্গের রাজ-সভায় সংস্কৃতের আলোচনা হইলেও সামান্যলোক পূর্ব্বমত আপন ভাষায় কথা কহিত। আদিম ভাষা কখনও সংস্কৃত কর্ত্তৃক তিরোহিত হয় নাই। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, তৈলঙ্গ ও দ্রাবিড়ের হিন্দু-গণ স্বাধীন ছিল।

১২৯৪ হইতে ১৩৪৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ শতাব্দী কাল দক্ষিণাপথের হিন্দুগণ স্বাধীনতার জন্য দিল্লীশ্বর মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়াছিল। এই কালের মধ্যে প্রথমে আল্লাউদ্দীন মহারাষ্ট্রপ্রদেশ (১২৯৪), তৎপর তাঁহার সেনাপতি কাফুর মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, কর্ণাট ও দ্রাবিড়প্রদেশ (১৩০৬-১৩১২), তৎপর মুবারক মহারাষ্ট্রপ্রদেশ (১৩১৮), তৎপর গীয়াসুদ্দীন তগলকের পুত্র জুনা তৈলঙ্গপ্রদেশ (১৩২৩) ও তৎ-পর সেই জুনা সম্রাট হইয়া মহম্মদ তগলক নাম ধারণ করিয়া সমস্ত দক্ষিণাপথ আক্রমণ করেন। হিন্দু-রাজগণ বার বার পরাস্ত ও বন্দী হইয়াও একবারে স্বাধীনতা হারান নাই। ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে বহু যুদ্ধের পর তৈলঙ্গের হিন্দুরাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল, ও কর্ণাট ও দ্রাবিড় ব্যাপিয়া বিজয় নগর নামক একটি নূতন পরাক্রান্ত হিন্দু-রাজ্য স্থাপিত হইল। কিন্তু চতুর্থ প্রদেশটি, মহারাষ্ট্রদেশ আর স্বাধীন হইল না। পঞ্চাশৎ বৎসরের যুদ্ধে তথাকার হিন্দুগণ হীনবল হইয়াছিল, অনেক মুসলমানও সেই প্রদেশে আসিয়াছিল; এক্ষণে সেই মুসলমানগণ তথায় একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিল; বাহ-মনী-বংশের প্রথম রাজা হাসানগাঙ্গু মহারাষ্ট্রপ্রদেশে স্বাধীন

মুসলমানরাজ্য স্থাপন করিলেন (১৩৪৭); ও দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন করিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে হিন্দুস্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল। অতএব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য সময়ে দক্ষিণাপথে তৈলঙ্গ ও বিজয়নগর, এই দুইটি স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য ও দৌলতাবাদে একটি স্বাধীন মুসলমান-রাজ্য সংস্থাপিত হইল। ইহার পর প্রায় তিন শত বৎসর দিল্লীশ্বরগণ দক্ষিণাপথ জয় করিবার চেষ্টা করেন নাই।

কিন্তু এই বিপদ হইতে নিস্তার পাইলেও দক্ষিণে হিন্দু-সাম্রাজ্য বিপদশূন্য ছিল না। দক্ষিণাপথের হিন্দুগণ গৃহের মধ্যে দৌলতাবাদ স্বরূপ মুসলমান-রাজ্যকে স্থান দিয়াছিলেন; সেই দৌলতাবাদ রাজ্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তৈলঙ্গ রাজ্য ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল, ও ১৪২১ খৃষ্টাব্দে তৈলঙ্গের রাজধানী বরঙ্গল দৌলতাবাদের অধীন হইল। ক্রমে বিজয়নগরের অনেক অংশও দৌলতাবাদের অধিকৃত হইল। অতএব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণাপথে পরাক্রান্ত মুসলমান রাজ্য দৌলতাবাদ ও হীনবল হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর, এই দুইটি মাত্র রাজ্য ছিল।

কালক্রমে দৌলতাবাদ রাজ্য হইতে আহমদনগর, বিজয়পুর ও গলখন্দ, এই তিনটি স্বাধীন মুসলমান-রাজ্য উৎপন্ন হইল, ও ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে দৌলতাবাদ রাজ্য বিলুপ্ত হইল। অতএব এই বৎসরে, অর্থাৎ যে বৎসর বাবর দিল্লী জয় করিলেন, সে বৎসরে দক্ষিণাপথে বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহমদনগর, এই তিনটি মুসলমান-রাজ্য ও বিজয়নগর নামক একটি হিন্দুরাজ্য ছিল।

ইহার ৩৮ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ একত্র হইয়া তেলিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগরের সৈন্য পরাস্ত করিয়া সেই অবশিষ্ট হিন্দুরাজ্যের লোপ সাধন করিল। তথাপি বিজয়নগরের অন্তর্গত কর্ণাট ও দ্রাবিড় প্রদেশ জয় করিল না; সেই সেই দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা বা পলীগারগণ শাসন করিতে লাগিলেন; তাঁহারা নামে বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনতা স্বীকার করিতেন। অতএব ষোড়শ শতাব্দীর শেষে দক্ষিণাপথে বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহমদনগর, এই তিনটি স্বাধীন মুসলমান প্রদেশ ছিল; কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের হিন্দুরাজগণ উক্ত মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণাপথে মুসলমান-রাজ্য ছিল না; মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, তৈলঙ্গ ও দ্রাবিড়, এই চারিটি প্রধান হিন্দু প্রদেশ ছিল। তিনশত বৎসর পরে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণাপথে হিন্দু-রাজ্য ছিল না; আহমদনগর, বিজয়পুর ও গলখন্দ, এই তিনটি মুসলমান-রাজ্য ছিল। কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা ও পলীগারগণ নামে এই মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন। কিরূপে তিন শত বৎসরের মধ্যে ক্রমে মুসলমান-ক্ষমতা বিস্তৃত হইয়া হিন্দু-ক্ষমতা লোপ করিল, তাহা পূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, এবং সেটি বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ফলতঃ ঐ তিন শত বৎসরের মধ্যে পাঁচটি নির্দ্ধারিত সময়ে দক্ষিণাপথের পাঁচ প্রকার অবস্থা স্মরণ রাখিলেই মুসলমান-ক্ষমতা বিস্তারের সমস্ত ইতিহাস স্মরণ থাকিবে। পাঠকদিগের সুবিধার জন্য সেই পাঁচ অবস্থা নিম্নে ক্রমান্বয়ে প্রদর্শিত হইল।

১২৯৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে	মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, কর্ণাট ও দ্রাবিড, এই চারিটি প্রধান হিন্দু-প্রদেশ। মুসলমান-রাজ্য নাই।
১৩৪৭ খৃষ্টাব্দের পর	দৌলতাবাদের মুসলমান-রাজ্য এবং তৈলঙ্গ ও বিজয়নগরের হিন্দু-রাজ্য।
১৪২১ খৃষ্টাব্দের পর	দৌলতাবাদের মুসলমান রাজ্য ও বিজয়নগরের হিন্দু-রাজ্য।
১৫২৬ খৃষ্টাব্দের পর	আহমদনগর, বিজয়পুর ও গলখন্দের মুসলমান-রাজ্য ও বিজয়-নগরের হিন্দু-রাজ্য।
১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের পর	আহমদনগর, বিজয়পুর ও গলখন্দের মুসলমান-রাজ্য। হিন্দু রাজ্য নাই ;—কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা ও পলীগারগণও বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনতা স্বীকার করিত।

পৌরাণিক সময়ে ভারতবর্ষের হিন্দুরাজ্যসমূহের যেরূপ অবস্থা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র ও তৈলঙ্গ, কর্ণাট ও দ্রাবিড, এই চারিটি প্রদেশের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্যসমূহের সেইরূপ অবস্থা ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। সেই রাজ্যসমূহের মধ্যে দ্রাবিড়ের অন্তর্গত মধুরানগরে পাণ্ড্যরাজ্য ও কাঞ্চীনগরে চোলরাজ্য ও আরব্য-সমুদ্রকূলে চের ও কেরলরাজ্য প্রসিদ্ধ ছিল। তদ্ভিন্ন তৈল-

ঙ্গের অন্তর্গত অন্ধ্ররাজ্য ও পূর্ব্বে কলিঙ্গরাজ্য ও প্রসিদ্ধ ছিল। রাজসভায় সংস্কৃত আলোচনা হইত, এবং ব্রাহ্মণেরা বিচার-কার্য্য, মন্ত্রিত্বকার্য্য ও অন্যান্য কার্য্য সম্পাদন করিত। রাজ-কর্ম্মচারীগণ, সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও গ্রামের শাসনকর্ত্তাগণ বেতন-স্বরূপ অর্থ অথবা জায়গীর ভোগ করিতেন। ক্ষেত্রবেষ্টিত সুন্দর পল্লিতে শান্ত কৃষকগণ শস্য উৎপাদন করিত ও ষষ্ঠাংশ বা তদপেক্ষা অল্প অংশ রাজকোষে বা নিজ নিজ জায়গীরদারকে দান করিত।

১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের নূতন রাজ্য-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে যেন সহসা হিন্দুবল পুনরায় উৎকর্ষ লাভ করিল। কথিত আছে, রাজপুত্র বুক্করায় এবং প্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্যের সহায়-তায় এই রাজ্য সংস্থাপন করেন। এই রাজ্য কৃষ্ণা নদী হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এবং সমৃদ্ধি ও পরাক্রমে বোধ হয় দিল্লী ভিন্ন ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য কোনও রাজ্য অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। নূতন হিন্দুরাজ্য-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুশাস্ত্রালোচনা পুনরায় বল প্রাপ্ত করিল। প্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্য বা সায়নাচার্য্য বেদের টীকা করিয়া ও দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে পুস্তক রচনা করিয়া অনন্ত কীর্ত্তি লাভ করিয়া-ছেন। বিদেশীয় ভ্রমণকারীগণ বিজয়নগরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। আবদুর রজ্জাক নামক তৈমুরের এক পৌত্রের এক জন দূত ভারতবর্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বিজয়নগরের যে বর্ণনা করিয়াছেন, আরব্য উপন্যাসে তদপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধির বর্ণনা আছে কি না সন্দেহ। ইতালীয় ভ্রমণকারী কণ্টী বাড়াইয়া লিখিয়াছেন যে, ইহার চারি দিকের পরিধি

ত্রিংশৎ ক্রোশ। বার্টেমা নামক অন্য এক জন ইতালীয় ভ্রমণকারী এই নগরের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া স্বদেশের মিলান-নগরের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন।

এই রাজ্যের স্থাপনাবধি ইহার সহিত প্রথমে দৌলতাবাদের, তৎপরে আহমদনগর, বিজয়পুর ও গলথন্দের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ হইতে লাগিল। হিন্দুগণ কখনই বলে মুসলমানদিগের সমকক্ষ ছিল না, সুতরাং ক্রমে পরাস্ত হইতে লাগিল। তথাপি ২২০ বৎসর পর্য্যন্ত এই অসম যুদ্ধ শেষ হয় নাই। অবশেষে দক্ষিণাপথের সমস্ত মুসলমান সুলতানগণ একত্র হইয়া ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে তেলিকোটের যুদ্ধে এই সমৃদ্ধিশালী হিন্দুরাজ্যের ধ্বংশ সাধন করিলেন। সাহসী বৃদ্ধ রাজারাম বন্দী হইলেন। মুসলমানেরা তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া, তাঁহার মস্তক বিজয় চিহ্নস্বরূপ দ্বিশত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত বিজয়পুরে রাখিয়াছিল। বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংশ হইল; রাজারামের ভ্রাতা দক্ষিণ-পূর্ব্বে চন্দ্রগিরিতে যাইয়া ক্ষুদ্র রাজা স্বরূপ বাস করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহারই এক জন সন্ততি ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে প্রথম আগন্তুক ইংরাজদিগকে মান্দ্রাজে বাস করিবার অনুমতি পত্র দান করেন।

যখন মুসলমানেরা ক্রমে দক্ষিণাপথ জয় করিল, তখন তাহাদিগের অধীনে দেশীয় লোকদিগের, অর্থাৎ হিন্দুদিগের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা আমাদিগের জানা আবশ্যক; মুসলমান-রাজ্যের অধীনে অর্থাৎ প্রথমে দৌলতাবাদের, পরে আহমদনগর, বিজয়পুর ও গলথন্দের অধীনে হিন্দুদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। বস্তুতঃ মুসলমানদিগের দেশ-শাসন-কার্য্য অনেকটা হিন্দু-

বুদ্ধিবলেই পরিচালিত হইত। প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি সরকারে ও প্রত্যেক সরকার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল। সেই সমস্ত সরকার ও পরগণায় কখন কখন মুসলমান শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু অধিক সময়ে হিন্দু-কর্ম্মচারীগণই কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। মহারাষ্ট্রদেশ পর্ব্বত-সঙ্কুল, ও সেই সমস্ত পর্ব্বত-চূড়ায় অসংখ্য দুর্গ নির্ম্মিত ছিল। মুসলমান সুলতানগণ সেই সকল পর্ব্বত-দুর্গ, মুসলমান ও কখন কখন হিন্দু জায়গীরদারদিগের হস্তে ন্যস্ত রাখিতে সঙ্কুচিত হইতেন না; কিল্লাদারগণ কখন কখন রাজকোষ হইতে বেতন পাইতেন, কখন বা চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমির জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তাহারই আয় হইতে দুর্গরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় করিতেন। এই সমস্ত কিল্লাদার ও দেশমুখ ভিন্ন মুসলমান সুলতানদিগের অধীনে অনেক হিন্দু মনসবদার ছিলেন। তাঁহারা শত কি দ্বিশত কি পঞ্চশত কি সহস্র কি তদধিক অশ্বারোহীর সেনাপতি; সুলতানের আদেশমতে সেই সেই পরিমাণ সৈন্য লইয়া যুদ্ধসময়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন, ও সৈন্যের বেতন ও প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য এক একটি জায়গীর ভোগ করিতেন। মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সেনা শীঘ্র-গতিতে ও ত্বরিত-যুদ্ধে অদ্বিতীয়। ইহারা নিজ নিজ সুলতানদিগকে যুদ্ধসময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিত; সময়ে সময়ে ইহারা আপনাদের মধ্যেও ঘোরতর বিবাদে লিপ্ত হইত। বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে চন্দ্ররাও মোরে দ্বাদশ সহস্র পদাতিকের সেনাপতি ছিলেন, ও সুলতানের আদেশে নীরা ও বার্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। সুলতান পরিতুষ্ট হইয়া সেই দেশ চন্দ্র-

রাওকে অল্প মাত্র কর ধার্য্য করিয়া জায়গীর স্বরূপ দান করেন ও চন্দ্ররাওয়ের সন্ততিগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজা খেতাবে সেই প্রদেশ স্বচ্ছন্দে সুশাসন করেন। এইরূপ রাওনায়েক নিম্বালকরবংশ পুরুষানুক্রমে ফুলতন দেশের দেশমুখ হইয়া সেই দেশ শাসন করেন। এইরূপে ঘাটিগীবংশ মল্লওরীপ্রদেশে, মনয়বংশ মুম্বরপ্রদেশে, যবপুরীয়বংশ কাপসী ও মুধোলপ্রদেশে, ডুফ্লেবংশ ঝট্রপ্রদেশে ও শবন্তবংশ ওয়াবিপ্রদেশে অবস্থিতি করিয়া,পুরুষানুক্রমে বিজয়পুরের সুলতানের কার্য্যসাধন করিতে থাকেন। ইহাঁরা সময়ে সময়ে আপনাদিগের মধ্যেই তুমুল সংগ্রাম করিতেন। জ্ঞাতি বিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই; পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণ ও মহারাষ্ট্রপ্রদেশের সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালেই স্থানীয় বড় বড় বংশে আত্মবিরোধ দৃষ্ট হইত ও পর্ব্বতকন্দরে ও উর্ব্বরা উপত্যকায় সর্ব্বদাই মহা-যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইত। বহু শোণিতপাত হইলেও, সে গুলি কুলক্ষণ নহে, সে গুলি সুলক্ষণ, পরিচালনা দ্বারা আমাদের শরীর যেরূপ সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হয়, সর্ব্বদা কার্য্য, উপদ্রব ও বিপর্য্যয় দ্বারা জাতীয় বল ও জাতীয় জীবন সেইরূপ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। দক্ষিণাপথে মুসলমান-দিগের অধীন হিন্দুগণ এইরূপ শাসনকার্য্যে ও যুদ্ধকার্য্যে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকাতে একবারে দুর্ব্বল বা জীবনহীন হয় নাই; সুতরাং মুসলমান-রাজ্যের অবনতির সময়, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে পুনরায় সহসা পরাক্রান্ত ও স্বাধীন হইয়া উঠিল।

মধ্যভারতবর্ষ। গুর্জ্জর, মালব প্রভৃতি প্রদেশ গুলি দিল্লীর সমধিক নিকটবর্ত্তী বলিয়া সর্ব্বদাই দিল্লীশ্বরদিগের লোভের দ্রব্য হইয়া উঠিয়াছিল। দিল্লীশ্বর দুর্ব্বল হইলে এই

রাজ্যগুলি স্বাধীন হইয়া উঠিত, এবং ক্ষমতাপন্ন সম্রাটগণ পুনরায় সেই স্বাধীনতার লোপ সাধন করিতেন।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে অনেক বার মুসলমান কর্ত্তৃক গুর্জ্জর-বিজয়ের কথা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত গুর্জ্জর কখনও বিজিত হয় নাই। গুর্জ্জরের উপদ্বীপ অংশে নয় কি দশটি ভিন্ন জাতীয় হিন্দু স্বাধীনভাবে বাস করিত; তাহারা পূর্ব্বকাল হইতে ইংরাজদিগের সময় পর্য্যন্ত কখনও অধীনতা স্বীকার করে নাই। আবার পশ্চিম দিকে দুরূহ পর্ব্বতশ্রেণীর উপর ঝালোর, সিরোহী, ইদর, চম্পানীর, দোঙ্গারপুর, ভান্সোযারা প্রভৃতি স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত রাজগণও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন; এবং কোন কোন স্থলে কেবল ভীল, কুলী প্রভৃতি পার্ব্বতীয় অসভ্যগণ বাস করিত। সুতরাং যে গুর্জ্জরবিজয়ের জন্য দিল্লীর সম্রাট এত ব্যস্ত ছিলেন, সে কেবল সুরাতনগরীর নিকটে ও উত্তরে উর্ব্বরা কতক প্রদেশ মাত্র, তাহার পূর্ব্বদিকে ঘাট পর্ব্বতশ্রেণী ও পশ্চিম দিকে আরব সমুদ্র।

এই প্রদেশের শেষ হিন্দু রাজা, আল্লাউদ্দীনের শাসনকালে ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, এবং তাঁহার রমণী আল্লার বেগম হয়েন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

পরে মহম্মদ তগলকের মৃত্যুর পর যখন গুর্জ্জরপ্রদেশ পুনরায় স্বাধীন হয়, তখন একজন মুসলমান সুলতান সেই স্বাধীনতা লাভ করে, হিন্দু-রাজ্য আর সংস্থাপিত হয় নাই। যতদিন পাঠানগণ দিল্লীর সম্রাট রহিলেন, গুর্জ্জরের স্বাধীনতা ততদিন বিলুপ্ত হয় নাই। এই কালের মধ্যে গুর্জ্জরের সুলতানগণ ঝালোর, সিরোহী, ইদর ও চম্পানীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু

রাজাদিগকে বশীকরণের জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন ও মালবের সুলতান ও মিবারের হিন্দুরাজার সহিত সর্ব্বদাই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। অবশেষে ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ বাবর কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান বিজয়ের পাঁচ বৎসর পরে) গুর্জ্জরের সুলতান বাহাদুর শাহ সমস্ত মালবপ্রদেশ জয় করিয়া গুর্জ্জরের অন্তর্গত করিলেন। ইহার একচত্বারিংশৎ বৎসর পরে আকবর গুর্জ্জরপ্রদেশ জয় করিয়া পুনরায় দিল্লীর অধীনে আনেন।

মালবদেশে হিন্দুস্বাধীনতা ১২৩১ খৃঃ অব্দে, অর্থাৎ আলতমসের শাসনকালে বিলুপ্ত হয়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। মহম্মদ তগলকের মৃত্যুর পর চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের শেষে এই প্রদেশের মুসলমান সুলতান দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হন। সেই সময় হইতে ১৫৩১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মালব রাজ্য স্বাধীন থাকে ও তৎপরে গুর্জ্জরের অন্তর্গত হয়।

গুর্জ্জর ও মালব ভিন্ন মধ্যভারতবর্ষে খন্দেশপ্রদেশ, পশ্চিমে মুলতান ও সিন্ধুপ্রদেশ ও পূর্ব্বে (বিহারের নিকট) জৌনপুরপ্রদেশ মুসলমান সুলতানদিগের অধীনে সময়ে সময়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল।

এই সকল প্রদেশ ভিন্ন মধ্যভারতবর্ষে আর একটি ক্ষমতাপন্ন বিস্তীর্ণ সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ ছিল। সে স্থানের হিন্দুস্বাধীনতা পাঠান সম্রাটগণ লোপ করিতে পারেন নাই; পরে মোগল সম্রাটগণও সে দেশ সম্যক্‌রূপে জয় করিতে পারেন নাই। এমন কি, অদ্য পর্য্যন্ত সেই গৌরবান্বিত প্রদেশের হিন্দুগণ ইংরাজদিগের করপ্রদ মাত্র হইয়া আপন আপন হিন্দু রাজাদিগের অধীনে আপন আপন রীতি, নীতি, বিধি ও শাসনপ্রণালী

অনুসারে স্বাধীনভাবে বাস করিতেছে। সে প্রদেশটি রাজস্থান, অর্থাৎ রাজপুতদিগের বাসস্থান।

সমস্ত রাজস্থান কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যে বিভক্ত ছিল, ও প্রত্যেক রাজ্যে এক একটি ভিন্ন-জাতীয় রাজপুত বাস করিত। তাহাদিগের মধ্যে মিবারবাসী শিশোদীয়গণ ও মাড়বারবাসী রাঠোরগণ সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও পরাক্রান্ত। শিশোদীয়গণ গুর্জ্জর হইতে আসিয়া খৃষ্টের পর অনুমান অষ্টম শতাব্দীতে চিতোরে আপনাদিগের রাজধানী স্থাপন করে ও আপনাদিগকে রঘুবংশোদ্ভব শ্রীরামচন্দ্রের সন্ততি বলিয়া পরিচয় দেয়। যে সময়ে শাহাবুদ্দীন বা মহম্মদ গোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সে সময়ে চিতোরের রাজা সমরসিংহ অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি দিল্লীর পৃথুরায়ের ভগিনীপতি ছিলেন; এবং যে যুদ্ধে পৃথুরায় অবশেষে পরাস্ত হয়েন, সেই যুদ্ধে সমরসিংহ অতিশয় বিক্রম প্রকাশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। দিল্লী, কান্যকুব্জ প্রভৃতি প্রদেশ শাহাবুদ্দীনের হস্তগত হইল, কিন্তু পর্ব্বতসঙ্কুল ও মরুভূমি-রক্ষিত রাজস্থান স্বাধীন রহিল।

পরে আল্লাউদ্দীন চিতোর বিজয়ের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। চিতোর রক্ষার্থ শিশোদীয়গণ যার-পর নাই চেষ্টা করিয়াছিল, পরে যখন চিতোর-রক্ষা দুঃসাধ্য বোধ হইল, তখন সমস্ত যোদ্ধা সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিল ও তাহাদিগের সমস্ত পরিবার চিতানলে প্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করিল, তথাপি মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিল না। চিতোর অধিক দিন শত্রুহস্তে রহিল না; আল্লাউদ্দীনের জীবদ্দশাতেই হামির পৈতৃক দুর্গের উদ্ধার করিলেন।

তুগলকবংশের শাসনকালে গুর্জ্জর ও মালবপ্রদেশ স্বাধীনতা লাভ করিলে পর, ঐ ঐ দেশের মুসলমান সুলতানদিগের সহিত চিতোরের হিন্দু রাজাদিগের সর্ব্বদাই যুদ্ধ হইত, তাহাতে কখন হিন্দুগণ, কখন মুসলমানগণ পরাস্ত হইত। অবশেষে হিন্দুস্থানে পাঠান-সাম্রাজ্য-বিলোপের সময় মহাবলপরাক্রান্ত সংগ্রামসিংহ চিতোরের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি ১৫১৯খৃষ্টাব্দে মালবের সুলতানকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া, পরে আপন উদারতার প্রমাণস্বরূপ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন; পরে গুর্জ্জর দেশ আক্রমণ করিয়া আহমদাবাদ নগর পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া আসিলেন। তাঁহার অশীতি সহস্র অশ্বারোহী অসংখ্য যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল, এবং গুর্জ্জর হইতে যমুনা-তীর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতাপ ও রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। অবশেষে বাবর দিল্লীর সম্রাট হইলে সংগ্রামসিংহের সহিত বাবরের একটী ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাতে সংগ্রামসিংহ পরাস্ত হইলেন ও কিছু কাল পরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

১১১৪ খৃষ্টাব্দে শাহাবুদ্দীন বা মহম্মদ গোরী যখন কান্যকুব্জ জয় করিলেন, তখন তথাকার রাঠোরদিগের মধ্যে এক অংশ, মুসলমানদিগের অধীনে বাস করিয়া, সময়ে সময়ে স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, আর এক অংশ দেশ ত্যাগ করিয়া মাড়বারে জাঠদিগকে পরাস্ত করিয়া তথায় স্বাধীন রাঠোররাজ্য স্থাপন করিল। যোধপুর তাহাদিগের রাজধানী।

এইরূপে অম্বর বা জয়পুর, যশল্মীর, আজমীর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজপুত জাতি আপন আপন

স্বাধীন রাজ্যে বাস করিত। গুর্জ্জরের নিকট সিরোহী ও ঝালোর, এবং যমুনার নিকট মেওয়াট, গোবালিয়র, নারওয়ার, চন্দেরী প্রভৃতি অনেক দুর্গে রাজপুতবংশীয় রাজগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, যমুনার নিকটের এই সকল স্থান লইবার জন্য দিল্লীশ্বরগণ বার বার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজপুতগণ বার বার পরাস্ত হইয়াও স্বাধীনতা একবারে হারায় নাই।

রাজপুতদিগের শাসনপ্রণালী অনেকাংশে ইউরোপের ফিউ-ডল রাজ্যতন্ত্রের ন্যায়। রাজার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন কুলেশ্বর-গণ আপন আপন দুর্গে বাস করিয়া আপন আপন প্রদেশখণ্ড অধিকার করিতেন, আবার তাঁহাদিগের অধীনে সেই কুলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোদ্ধাগণ নিজ নিজ দুর্গে বাস করিতেন ও নিজ নিজ ভূমি অধিকার করিতেন। ফিউডল রাজ্যতন্ত্র হইতে রাজপুত রাজ্যতন্ত্র এই মাত্র বিভিন্ন যে, রাজস্থানে অধীনস্থ যোদ্ধাগণ উচ্চ পদস্থ যোদ্ধাদিগের সহিত একই বংশজ, সুতরাং যোদ্ধাদিগের মধ্যে প্রভু ও দাসের সম্বন্ধ অপেক্ষা পারিবারিক সম্বন্ধ সমধিক প্রবল ছিল। ফলতঃ প্রভু ও দাসের সম্বন্ধ স্বাধীনতাপ্রিয় রাজপুত যোদ্ধাদিগের মধ্যে প্রবল ছিল না; মাড়বারের যোদ্ধাগণ একবার রাজার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,' যখন আমা-দিগের সহায়তা আবশ্যক হয়, তখন তিনি আমাদিগের প্রভু; নচেৎ আমরা সকলে ভ্রাতা ও আত্মীয় ও নিজ নিজ ভূমি অধিকার করি।" যুদ্ধের সময় সকল যোদ্ধা আপন আপন সৈন্য লইয়া কুলেশ্বরদিগের নিকট এবং কুলেশ্বরগণ রাজার নিকট উপস্থিত হইতেন, এবং রাজা এইরূপে দেশের সমস্ত সৈন্য-

বেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ করিতেন। রাজার সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন কুলের যোদ্ধাগণ আপন আপন বীরত্ব দেখাইবার জন্য অনির্ব্বচনীয় সাহস প্রকাশ করিত। রাজপুতগণ অতিশয় সাহসী, যতক্ষণ রাজা বা কুলপতিগণ যুদ্ধ করিতেন, ততক্ষণ তাহারা সহস্র বিপদেও ভীত হইত না, মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিত। ফলতঃ তাহাদিগের অপেক্ষা সাহসী, নির্ভীক যোদ্ধা, বোধ হয় জগতে নাই। সমস্ত রাজপুত সৈন্য, সংখ্যায় দশ গুণ শত্রুর সহিত সম্মুখরণে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এরূপ ইতিহাসে বার বার পাঠ করা যায়। কিন্তু সাহসে অদ্বিতীয় হইলেও যুদ্ধনিপুণতায় ও কষ্টসহিষ্ণুতায় ও বলে, বোধ হয়, তাহারা মুসলমানদিগের সমকক্ষ ছিল না। এই জন্যই সমান যুদ্ধে প্রায়ই রাজপুতগণ পরাস্ত হইল এবং পর্ব্বত সঙ্কুল ও মরুভূমি-রক্ষিত রাজস্থান এবং স্থানে স্থানে কয়েকটি পর্ব্বত-দুর্গ ভিন্ন প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের অধিকৃত হইল।

রাজপুতদিগের সত্য প্রিয়তা ও যুদ্ধের উদার নিয়মগুলি যেরূপ চমৎকার, অন্য কোনও জাতির বোধ হয় সেরূপ নাই। রাজপুতগণ সত্য করিলে প্রায়ই পালন করিত। মুসলমান ও রাজপুতদিগের যুদ্ধের সময় মুসলমানদিগের প্রতারণা ও রাজপুতদিগের সরলতা ও সত্যপ্রিয়তা বার বার লক্ষিত হয়। যুদ্ধে ও রাজ্যলোভ বশতঃ হত্যাকাণ্ড ও নৃশংসতা মুসলমান ইতিহাসে যেরূপ দৃষ্ট হয়, রাজপুত ইতিহাসে সেরূপ দৃষ্ট হয় না; এবং কখন কখন রাজপুতগণ যুদ্ধে পরাস্ত হইত, তথাপি যুদ্ধবিষয়ক শাস্ত্রের সরল উদার নিয়মগুলি লঙ্ঘন করিত না।

শত বিজয়ে ও পরাজয়ে ও চারণ অর্থাৎ রাজপুত কবিদিগের যুদ্ধ-গীতে রাজপুতদিগের বীরত্ব প্রোৎসাহিত হইত, গৌরবাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত এবং কুলেশ্বর ও রাজাদিগের প্রতি ভক্তি উৎকর্ষ লাভ করিত। রাজপুতগণ রমণীদিগকে অতিশয় সম্মানের সহিত ব্যবহার করে, এবং রাজপুত রমণীগণও সে সম্মানের অযোগ্য নহেন। স্বামী যুদ্ধে পরাস্ত হইলে, রাজপুত রমণী তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন না, পুনরায় যুদ্ধে প্রেরণ করিতেন বা স্বামীর পতনে স্বয়ং নগর-রক্ষা করিতেন, এইরূপ ইতিহাসে অনেক উদাহরণ আছে। এবং যখন শত্রুদিগের আক্রমণ আর রোধ করিতে পারিতেন না, তখন রাজপুত রমণী হাসিয়া চিতারোহণ করিয়া, জাতি, ধর্ম্ম ও সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, তাহারও অনেক উদাহরণ আছে।

পূর্ব্ব-ভারতবর্ষ।—১২০৩ খৃষ্টাব্দে কুতবুদ্দীনের সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী বঙ্গ ও বিহারদেশ জয় করিয়া হিন্দু-স্বাধীনতার লোপ করেন। সেই বৎসর হইতে আকবরের সময় পর্য্যন্ত এই দুই প্রদেশে আফগান বা পাঠানেরা রাজত্ব করে। ইহারা কখন কখন দিল্লীর সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিত, কখন কখন বা সময় পাইলেই স্বাধীনভাব অবলম্বন করিত। ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তগলকের সময় বঙ্গদেশের আফগানগণ বিদ্রোহী হইয়া যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, দিল্লীতে পাঠান-শাসনকালের মধ্যে সে স্বাধীনতা আর বিলুপ্ত হয় নাই। বঙ্গীয় পাঠানদিগের রাজ্যতন্ত্র অনেকাংশে ইউরোপীয় ফিউডল রাজ্যতন্ত্র সদৃশ ছিল। দেশের সিংহাসন শূন্য হইলেই কখন কখন সেনাপতিগণ আপনা-

দিগের মধ্যে কাহাকেও রাজা স্থির করিতেন, কখন বা কোন সেনাপতি আপন বাহুবলে সিংহাসনে আরোহণ করিতেন। দেশের অধিপতি কোন একটি উৎকৃষ্ট জেলা আপন অধীনে রাখিতেন, অন্যান্য জেলা প্রধান প্রধান সেনানী ও জায়গীরদার গণ ভোগ করিত। তাহাদিগের অধীনে আবার কর্ম্মচারী ও জমীদারগণ খণ্ড খণ্ড জমী করিত ও অধীনস্থ কৃষক বা তালুক-দারদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিত। সেনানী ও জায়-গীরদারগণ কখন বঙ্গাধিপতির অধীনতা স্বীকার করিত, আবার সময় পাইলেই আপন আপন জেলায় স্বাধীনভাব অব-লম্বন করিত। বঙ্গদেশের হিন্দুগণ সাহস ও শারীরিক বলে হীন; সুতরাং দক্ষিণাপথের মহারাষ্ট্রীয়গণ যেরূপ সুলতানদিগের অধীনে বহু সৈন্য চালনা করিত ও যুদ্ধ ব্যবসায়ে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিত, বঙ্গদেশের হিন্দুদিগের সেরূপ ক্ষমতা বা সৈন্য বা যুদ্ধ-পটুতা ছিল না। তথাপি হিন্দুদিগের বুদ্ধি ও কার্য্য-ক্ষমতা দেখিয়া পাঠান-রাজগণ তাহাদিগকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে লিপ্ত করিতেন, এবং তাহাদিগকে জায়গীর ও জমীদারী দিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতেন। সময়ে সময়ে দুই এক জন হিন্দু জমীদার ও জায়গীরদার অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেন; এমন কি, স্বাধীন পাঠান রাজাদিগের মধ্যে আমরা এক জন হিন্দুর নামও দেখিতে পাই। বঙ্গদেশ স্বাধীন হইবার অষ্টাদশ বৎসর পর, অর্থাৎ ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে কংশরাজা বঙ্গদেশের অধিপতি হইয়া সাত বৎসর নিরাপদে রাজত্ব করেন; তিনি পূর্ব্বে জমীদার ছিলেন, আপন সাহস ও পরাক্রম-বলে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম অব-

লম্বন করেন, এবং তাঁহার বংশ সর্ব্বশুদ্ধ চত্বারিংশৎ বৎসর বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। এই সমস্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বঙ্গদেশের হিন্দুগণ সচরাচর যুদ্ধপটু না হইলেও পাঠানদিগের অধীনে প্রভূত ক্ষমতা ভোগ করিত। দেশস্থ জমীদার ও জায়গীরদারদিগের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন। প্রধান প্রধান জমীদারদিগের কিছু কিছু সৈন্যও থাকিত ও তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও যুদ্ধ করিতেন।

পাঠান অধিকারকালে জমীদার ও জায়গীরদারদিগের নিজ নিজ জেলা বা জমীদারীতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহারা দুষ্ট ও দুশ্চরিত্র লোকদিগের অর্থ-দণ্ড বা কায়িক দণ্ড বা প্রাণ দণ্ড করিতে পারিতেন ও আপন আপন এলাকার মধ্যে শান্তিরক্ষা করিয়া কর আদায় করিতেন। প্রজাগণ তাঁহাদিগকে প্রকৃত রাজার তুল্য জ্ঞান করিত, ও জমীদারদিগের সম্পূর্ণ অধীন ছিল, সুতরাং জমীদার ও প্রজাদিগের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা ছিল না। বঙ্গদেশের শান্ত কৃষকগণ, ক্ষেত্রবেষ্টিত বৃক্ষাচ্ছাদিত শান্ত গ্রামে বাস করিয়া, পৈতৃক কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, "রাজার" দেয় কর দিয়া, বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া একরূপেই জীবন যাপন করিত। দেশের অধিপতি পাঠানই হউক বা হিন্দুই হউক, তাহাদিগের পক্ষে সমান; তাহারা "রাজা" স্বরূপ নিজ নিজ জমীদারের অধীনে থাকিয়া তাঁহাকেই কর দান করিত।

বঙ্গদেশের প্রায় অসংখ্য নদীতীরে ও সমুদ্রতীরে অনেক নগর ছিল, এবং সে সমস্ত নগরের অবস্থা মন্দ ছিল না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নিকোলো ডি কণ্টী বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং ঐই দেশের সুন্দর বৃক্ষবেষ্টিত সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী

বহুসংখ্যক নগর ও তাহার বাণিজ্যের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তথাপি মুসলমানাধীনে হিন্দুদিগের সাহস ও বাণিজ্যোৎসাহ হ্রাস হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যাহারা পূর্ব্বে সমুদ্র-পথে গমনাগমন করিত, তাহাদিগের সন্ততিগণ সমুদ্রের নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

পূর্ব্বদেশে অর্থাৎ আসাম ও ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব অংশে হিন্দুগণ স্বাধীনাবস্থায়ই বাস করিত। পাঠানগণ কখন কখন সেই প্রদেশ জয় করিতে যাইত, এবং সময়ে সময়ে যুদ্ধ হইত; কিন্তু ঐ প্রদেশে পাঠান-ক্ষমতা কখনই স্থিরকাপে স্থাপিত হয় নাই। ইংরাজদিগের অধীন ত্রিপুরা জেলা ত্রিপুরারাজেরই অধীন ছিল আধুনিক কুমিল্লা নগরে তাহার দুই তিন ক্রোশ পশ্চিমে ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণীতে হিন্দু-রাজ-খনিত অনেক দীর্ঘিকা দেখিতে পাওয়া যায় ও অনেক সুন্দর উপন্যাসও শুনিতে পাওয়া যায়।

পাঠান অধিকারকালে বঙ্গবাসীদিগের মানসিক ক্ষমতার কয়েকটি লক্ষণ অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে। অধীন জাতীর প্রকৃত বীররসাত্মক কোন রচনা সম্ভবে না; কিন্তু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের অনন্ত-প্রেমের সুললিত হৃদয়গ্রাহী গীত রচনা করিয়া বঙ্গবাসীদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এই বিষয় স্বাধীন বঙ্গের শেষ কবি জয়দেব গাহিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে মুসলমানাধীন বঙ্গদেশে পুনরায় সেই প্রেমগীত শ্রুত হইল, সেই ভক্তিতরঙ্গ বহিতে লাগিল। সে স্রোত সহসা শেষ হইল না, কবির পর কবি ললিত বঙ্গভাষায় কৃষ্ণপ্রেম গাহিতে লাগিলেন; অবশেষে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে নিমাই বা বিশ্বম্ভর, গৌরাঙ্গ বা কৃষ্ণ-চৈতন্য সেই কৃষ্ণপ্রেমের কথা

যমুনা হইতে কাবেরীতীর পর্য্যন্ত প্রচার করিলেন। গৌরাঙ্গের মত বঙ্গদেশে সকলেই জানেন; কৃষ্ণ-প্রেমের ভক্ত হইলে অন্য পূজার বা দেবের আবশ্যকতা নাই, হিন্দু ও মুসলমানে বিচ্ছেদ নাই, হরিনাম গাহিয়া সকলেই উদ্ধার হইতে পারে।

হিন্দু-দেবশ্রেণীর মধ্যে দুর্গা বা শক্তি ও বিষ্ণু বা কৃষ্ণ, এই দুইটি দেবই বঙ্গদেশের মধ্যে অধিক আরাধ্য, ও এই দুই দেবের পূজকদিগের মধ্যে, অর্থাৎ শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চৈতন্যের বহু দিন পূর্ব্ব হইতে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। চৈতন্য যে মত প্রচার করিলেন, তাহা বৈষ্ণব মতের উৎকর্ষ মাত্র, তথাপি তাঁহার অপরিসীম ভক্তি দ্বারা বঙ্গদেশে প্রকৃত একটি ধর্ম্মবিপ্লব সঙ্ঘটিত হইল। ধর্ম্মবিপ্লব চিন্তার উদ্রেক করে, সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে চারিদিকে চিন্তার উৎকর্ষ দৃষ্ট হইল। এই শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। এই শতাব্দীতে রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্র সঙ্কলন করিয়া যে বিধি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি তাহা প্রচলিত রহিয়াছে, এবং এই শতাব্দীতে সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণ প্রথমে কৃত্তিবাস কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হয়, মুকুন্দরাম চণ্ডী প্রণয়ন করেন, ও পরশতাব্দীতে কাশীরাম মহাভারত অনুবাদ করেন।

শক্তি ও বিষ্ণুর পূজা সম্বন্ধে আর এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, অধুনাও বঙ্গদেশের হিন্দুগণ এই দুই দেবপরায়ণ। ভদ্র-লোক প্রায়ই শাক্ত; ইতর লোক প্রায়ই সংসারী বৈষ্ণব।

বঙ্গ ও বিহারদেশের ন্যায় উড়িষ্যা পাঠানদিগের অধীনতা স্বীকার করে নাই, বরং মোগল সম্রাট্ আকবরের সময় পর্য্যন্ত

এই প্রদেশ স্বাধীন ছিল। উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস গল্প-বিজড়িত, কিন্তু খৃষ্টের পর পঞ্চম শতাব্দী হইতে এই প্রদেশের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়। ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে যযাতিকেশরী যবনদিগকে পরাস্ত ও বিদূরিত করিয়া উড়িষ্যা উদ্ধার করিলেন, এবং তাঁহার পর তাঁহার বংশের পঞ্চত্রিংশৎ জন রাজা ৬৫০ বৎসর উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। পরে তাম্রলিপ্তি বা মেদিনীপুর হইতে গঙ্গা-বংশীয় একজন রাজপুত্র ১১৩১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার রাজধানী অধিকার করেন। এই বংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালে ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। তিন শত বৎসর পরে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক রাজপুত বংশ উড়িষ্যা অধিকার করেন। পাঠানগণ যত দিন দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন, এই বংশীয় রাজগণ তত দিন উড়িষ্যা শাসন করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহারা বার বার দক্ষিণাপথ ভেদ করিয়া আপনাদিগের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজপুতবংশীয় রাজাদিগের সৈন্য কাঞ্চী বা কঞ্জেবারম ও মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত গিয়াছিল, এবং এক জন উড়িষ্যারাজ স্বয়ং তৈলঙ্গরাজের সহায়তার্থ দৌলতাবাদের মুসলমান সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে এক জন তৈলঙ্গ-যোদ্ধা উড়িষ্যা অধিকার করেন, এবং তাঁহার অষ্টাবিংশ বৎসর পর আকবরের সৈন্য এই প্রদেশ জয় করে। এইরূপে উড়িষ্যা মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করে।

উড়িষ্যায় হিন্দু স্বাধীনতা তিনশত বৎসর মাত্র বিলুপ্ত হইয়াছে। এই তিন শত বৎসরের মধ্যে অধীনতার বিষময় ফল

উড়িষ্যায় যেরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সেরূপ বোধ হয়, জগতে আর কোথাও হয় নাই। স্বাধীন উড়িষ্যাবাসীদিগের সাহস ও যুদ্ধোৎসাহের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি; তাহাদিগের হর্ম্ম্যনির্ম্মাণক্ষমতা, তাহাদিগের অসংখ্য দেবালয় ও প্রকাণ্ড অবিনশ্বর গিরিগহ্বর জগতের বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে। সেই জাতি তিন শত বৎসর মাত্র পরাধীন হইয়া আছে, এক্ষণে সেই উড়িষ্যাবাসীদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, উৎসাহ ও উন্নতির অভাব দেখিলে কে দুঃখ সম্বরণ করিতে পারে?

উপসংহার। এই অধ্যায়ে পাঠান-শাসনের সময়, সমস্ত ভারতবর্ষের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি কর। পশ্চিমে সিন্ধুতীর হইতে পূর্ব্বে বারাণসী পর্য্যন্ত ও উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে যমুনা ও রাজস্থানের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত উর্ব্বরা প্রদেশখণ্ড দেখিতে পাইবে। এই প্রদেশের জল বায়ু অতি উত্তম, মৃত্তিকা অতি উৎকৃষ্ট। প্রথমে আর্য্যগণ এই প্রদেশে বাস করিয়াছিল, প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ রাজগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু ও সিন্ধুর পঞ্চ শাখা এই প্রদেশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। এই প্রশস্ত প্রদেশখণ্ড পাঠানদিগের অধীন ছিল। দিল্লী ও তাহার নিকটস্থ প্রদেশ দিল্লীশ্বর ও তাঁহার মন্ত্রী ও কর্ম্মচারীগণ শাসন করিতেন, পঞ্জাব প্রভৃতি দূর প্রদেশে শাসনকর্ত্তাগণ নিযুক্ত হইতেন। দিল্লীশ্বর ক্ষীণবল হইলে শাসনকর্ত্তাগণ ও অধীনস্থ হিন্দুরাজগণ স্বাধীনতা লাভ করিতেন, পুনরায় পরাক্রান্ত সম্রাট্ তাঁহাদিগকে

অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতেন। নগরে কাজীগণ বা অন্য রাজকর্ম্মচারীগণ বিচার করিতেন; বণিকগণ সমৃদ্ধিশালী নগর-সমূহে বাণিজ্য করিত; পল্লীগ্রামে শান্ত গ্রামবাসীগণ সহস্র রাজ-উৎপাত সত্ত্বেও বংশানুক্রমে পৈতৃক ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত, আপনাদিগের বিবাদ বিসম্বাদ ও সমস্ত ব্যাপার আপনারা নিষ্পত্তি করিত, ও মণ্ডলদিগের দ্বারা সমস্ত গ্রামের কর একীকৃত করিয়া রাজকোষে পাঠাইয়া দিত।

এই প্রশস্ত প্রদেশের পূর্ব্বে বিহার, বঙ্গ ও উড়িষ্যা, এই তিনটি প্রদেশ দেখিতে পাইবে। বঙ্গ ও বিহার প্রদেশে দিল্লীর অধীনস্থ শাসনকর্ত্তাগণ শাসন করিতেন ও দূরতাবশতঃ প্রায়ই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদিগের অধীন জায়গীরদার ও জমীদারগণ নিজ নিজ জিলায় বা জমীদারীতে প্রায় স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজ্য করিতেন, কেবল শাসনকর্ত্তাকে কর দিতেন ও যুদ্ধের সময় সহায়তা করিতেন। শাসনকর্ত্তাগণ হিন্দুদিগকে বিশ্বাস করিতেন; অনেক প্রশস্ত জমীদারী ও জায়গীর হিন্দুগণ ভোগ করিত, সুতরাং তাহাদিগের অবস্থা মন্দ ছিল না। তাহাদিগের অধীনে শান্ত প্রজাগণ নিজ নিজ ক্ষেত্র চাষ করিত, ও জমীদারকে কর দিত। তাহারা জমীদারদিগের সম্পূর্ণরূপে অধীন ছিল, দুষ্টদমন ও শিষ্টপালনের ক্ষমতা জমীদারদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকিত, সুতরাং জমীদার ও প্রজার মধ্যে বিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। উড়িষ্যা স্বাধীন ছিল, ও অতিশয় ক্ষমতাপন্ন রাজ্য ছিল, এবং এই রাজ্যের সৈন্য বার বার দক্ষিণাপথ ভেদ করিয়া আপনাদিগের বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল।

পাঠান-শাসিত প্রদেশের দক্ষিণে গুর্জ্জর ও সিন্ধু প্রদেশ হইতে বুন্দেলখন্দ পর্য্যন্ত যে মধ্য ভারতবর্ষ দেখিতে পাইতেছ, তাহাতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু ও মুসলমান রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলি বশীকরণ জন্য দিল্লীশ্বরগণ বার বার চেষ্টা করিতেন, সুতরাং এই স্থানের যুদ্ধ প্রায় শেষ হইত না। ইহার মধ্যে গুর্জ্জর ও মালব প্রদেশের মুসলমান সুলতানগণ প্রবল ছিলেন, এবং পরস্পরে সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিতেন, অবশেষে মালব বিজিত হইয়া গুর্জ্জরের অন্তর্গত হইল। রাজস্থানে অনেক গুলি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য ছিল, তথায় শিশোদীয়, রাঠোর প্রভৃতি জাতি নিজ নিজ রাজা ও নিজ নিজ কুলেশ্বরদিগের অধীনে বাস করিয়া ভূমি অধিকার করিত, এবং অনন্ত যুদ্ধকার্য্যে জীবন যাপন করিত। জাঠ প্রভৃতি অধীনস্থ জাতিগণ ভূমি কর্ষণ করিত, ও রাজপুত প্রভুদিগকে কর দান করিত। রাজপুতদিগের বীরত্বের ইতিহাস বিস্ময়কর। পাঠান দিল্লীশ্বরগণ তাহাদিগের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। ইহা ভিন্ন পশ্চিমে ঝালোর সিরোহী. ও পূর্ব্বে মেওয়াট, চন্দেরী ও গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে স্বাধীন রাজপুতগণ রাজত্ব করিত।

বিন্ধ্যাচল ও নর্ম্মদার দক্ষিণে যে প্রশস্ত প্রদেশ দেখিতে পাইতেছ, উহা দক্ষিণাপথে পাঠান আমলের প্রারম্ভে চারিটি স্বাধীন হিন্দু-প্রদেশ ছিল। অতি দক্ষিণে দ্রাবিড়, তাহার উত্তরে কর্ণাট. তাহার উত্তরে মহারাষ্ট্র, ও কর্ণাট ও মহারাষ্ট্রের পূর্ব্বে বঙ্গসাগর পর্য্যন্ত তৈলঙ্গ। পূর্ব্ববর্ণিত হিন্দু-রীতি অনুসারে এই চারিটি প্রদেশের বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজগণ. এই স্থানে

রাজত্ব করিতেন; ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারীগণ কর-আদায় ও বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রানুশীলন করিতেন। সমস্ত দক্ষিণাপথ সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পূর্ণ ছিল এবং অসংখ্য পল্লীগ্রামে শান্ত গ্রামবাসীগণ শস্য উৎপাদন করিয়া রাজার প্রাপ্য অংশ রাজাকে বা জায়গীরদারকে দিত। কিন্তু মুসলমান-বল ক্রমে এই হিন্দু প্রদেশে বিস্তার পাইতে লাগিল। প্রথমে মহারাষ্ট্র বিলুপ্ত হইয়া (১৩৪৭) দৌলতাবাদে মুসলমান-রাজ্য স্থাপিত হইল, তৎপরে (১৪২১) তৈলঙ্গ রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া দৌলতাবাদের রাজ্য বিস্তৃত হইল, তৎপরে একটি দৌলতাবাদের স্থানে (১৫২৬) বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহম্মদনগর নামক তিনটি মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইল; তৎপরে (১৫৬৪) শেষ হিন্দু-রাজ্য বিজয়নগর (কর্ণাট ও দ্রাবিড) ধ্বংস প্রাপ্ত হইল ও সেই দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা পলীগারগণ মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিল। অন্য স্থানে যেরূপ, দক্ষিণাপথেও সেইরূপ মুসলমানদিগের অধীনে হিন্দুদিগের ক্ষমতা একবারে লোপ পায় নাই, বিশেষ দক্ষিণাপথে রাজকার্য্য প্রায়ই অধীন হিন্দুদিগের বলে নির্ব্বাহিত হইত; এবং অনেক হিন্দু বহুসংখ্যক সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া প্রশস্ত জায়গীর ও অনেক পর্ব্বত-দুর্গ অধিকার করিয়া মুসলমান সুলতানদিগের অধীনে বাস করিত, ও যুদ্ধ কালে সাহায্য দান করিত।*

* দুইটি প্রদেশের কথা বলা হয় নাই। কাশ্মীর হইতে ভুটান পর্য্যন্ত উত্তরের পার্ব্বতীয় প্রদেশ স্বাধীন ছিল, তাহার মধ্যে কাশ্মীরের হিন্দুগণ সুসভ্য ও শাস্ত্রজ্ঞ ও শৈব ছিল। উড়িষ্যা ও তৈলঙ্গের মধ্যে গাণ্ডোয়ানা

উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, পাঠানদিগের অধীনে হিন্দুদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। বিজিত হইলেও তাহারা রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ-কার্য্যের উচিত অংশ পাইত, এবং অনেক বিস্তীর্ণ জায়গীর ও দুরাক্রম্য পর্ব্বত-দুর্গ অধিকার করিয়া মুসলমানদিগকে কর দিয়া অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিত। তথাপি "আমরা নিকৃষ্ট ও পরাধীন" এই চিন্তা, মনের বল, সাহস ও উদারতা হরণ করে, সুতরাং ভারতবর্ষে দিনে দিনে পরাধীনতার ফল ফলিতে লাগিল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের মানসিক বল ও উদ্ভাবনশক্তি, স্বাধীন-চিন্তা, কার্য্যক্ষমতা ও সুন্দর কল্পনাশক্তি বিলুপ্ত হইল। ধর্ম্মভীরুতা (Superstition) বৃদ্ধি পাইল, দেবসংখ্যা ও পূজার আড়ম্বরের বৃদ্ধি হইল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়দিগের মর্য্যাদা হ্রাস হইল; ধর্ম্মভীরুতার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নাই ব্রাহ্মণগণই কেবল বেদ-পাঠের ও উপবীত ধারণের অধিকারী অন্য সকল জাতি শূদ্র বা শূদ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের দাস এই অস্বাস্থ্যকর মত প্রচার হইল। আপনাদিগের আধিপত্য অধিকতর স্থিরীকরণার্থ ব্রাহ্মণগণ হিন্দুদিগের পুরাতন শাস্ত্র স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল, নূতন নূতন শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে লাগিল, এবং সেই গুলি বেদব্যাস-রচিত এইরূপ প্রচার করিতে লাগিল। বিশ্রী তন্ত্র ও পূজা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং

নামক যে প্রদেশ দেখিতেছ, তাহা জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, ও তথায় জঙ্গল বাসী অসভ্য জাতিগণ স্বাধীনভাবে বাস করিত।

বলহীন পরাধীন জাতি দিনে দিনে চেষ্টাহীন হইয়া সহস্র মন্দিরে কেবল পূজা ও ক্রন্দনে শান্তি লাভ করিতে লাগিল।

পাঠান-শাসন কালের প্রজার অবস্থার এই সংক্ষিপ্ত চিত্রটি বোধ হয় আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। নচেৎ কেবল সম্রাট দিগের ইতিহাস ও যুদ্ধ-বিবরণ অভ্যাস করা অনাবশ্যক। সম্রাট দিগের কার্য্যপরম্পরা প্রকৃত ইতিহাস নহে; অধিবাসী জাতি-দিগের অবস্থা, উন্নতি ও অবনতিই প্রকৃত ইতিহাস।

দশম পরিচ্ছেদ।

মোগল-রাজ্যের উন্নতি।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

বাবর। ১৫২৬-১৫৩০। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের পানিপথের যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া বাবর দিল্লী ও তৎপরেই আগ্রা অধিকার করিলেন।

(ক) চিতোরের সংগ্রামসিংহ সে সময়ে অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন, এবং গুর্জ্জর হইতে যমুনাতীর পর্য্যন্ত আপন বিজয় বিস্তার করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সসৈন্যে আগ্রার দিকে আসিতে লাগিলেন ও আগ্রা হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে বায়ানার দুর্গ বেষ্টন করিলেন। বাবর এই পরাক্রান্ত হিন্দু রাজার আগমনে সসৈন্যে আগ্রা হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। আগ্রা

হইতে দশ ক্রোশ দূরে শিক্রীতে একটি যুদ্ধে বাবরের সৈন্য পরাস্ত হইল। ইহাতে বাবরের সমস্ত সৈন্য ভীত হইল, কিন্তু বাবর ইতিপূর্ব্বে অনেক বিপদে পড়িয়া সাহস ও অধ্যবসায় শিখিয়াছিলেন; তিনি সৈন্যদিগকে সাহস দিয়া পুনরায় শিক্রীতে যুদ্ধ দান করিলেন। এ বার সংগ্রামসিংহ পরাস্ত হইলেন; ইহার অল্প পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সংগ্রামসিংহের ন্যায় পরাক্রান্ত রাজা রাজস্থানে কখনও রাজত্ব করেন নাই। বাবরের নিকট পরাস্ত না হইলে তিনি সম্ভবতঃ দিল্লীশ্বর হইতে পারিতেন ও হিন্দু-স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইতেন।

(খ) চন্দেরী দুর্গের রাজপুত রাজা মেদিনীরায়কে বাবর তৎপরে আক্রমণ করিলেন। রাজপুতগণ তাহাদিগের নৈসর্গিক সাহসের সহিত দুর্গ রক্ষা করিল; অবশেষে আর রক্ষা অসম্ভব দেখিয়া সমস্ত রাজপুত-রমণী চিতারোহণ করিল, ও সমস্ত যোদ্ধা সম্মুখরণে প্রাণত্যাগ করিল। বাবর দুর্গ অধিকার করিলেন।

(গ) অযোধ্যার বিহার ও তাহার অধিনস্থ আফগানগণ বিদ্রোহী হইয়াছে শুনিয়া, বাবর তথায় যাইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন ও পরে সমস্ত বিহার জয় করিলেন।

পরবৎসর মাহমুদ লোদী পুনরায় বিহার অধিকার করেন ও একলক্ষ সৈন্য জড় করেন, কিন্তু বাবরের আগমনে তিনি বিহার ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। এ বার বাবর বিহার জয় করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না, তিনি গঙ্গা পার হইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। গোগরা নদী পার হইবার সময় বঙ্গদেশের সৈন্য তাঁহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সক্ষম হইল না; অচিরে বঙ্গদেশের নবাব নসব খাঁর সহিত বাবর সন্ধি স্থাপন

করিলেন। আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাঁহার সৈন্য পুনবায় বিবান ও বিদ্রোহী পাঠানদিগকে পরাস্ত করিল।

ইহার দেড় বৎসর পরে বাবরের মৃত্যু হয়। কথিত আছে যে, তাঁহার পীড়িত পুত্র হুমায়ুনকে বাঁচাইবার জন্য তিনি সেই পীড়া আপনার শরীরে লইয়া পুত্রকে বাঁচাইলেন, কিন্তু আপনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

হুমায়ুনের প্রথম শাসন। ১৫৩০-১৫৪০।

বাবরের চারি পুত্রের মধ্যে কামরাণ কাবুল ও পঞ্জাবের রাজা হইলেন এবং হুমায়ুন হিন্দুস্থানের সম্রাট্ হইলেন। হুমায়ুনের আর দুই জন ভ্রাতা হিন্দাল ও মির্জা আস্কারী সম্বল ও মেওয়াট প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইলেন।

(ক) কালীঞ্জর দুর্গ বেষ্টন করিয়া আছেন, এমন সময়ে হুমায়ুন শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার পিতার শত্রু বিবান ও বায়জীদ পুনরায় জৌনপুরে বিদ্রোহী হইয়াছে। হুমায়ুন তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন ও চুনার দুর্গের শের খাঁকে অধীনতা স্বীকার করাইলেন।

(খ) তৎপরে হুমায়ুন স্বাধীন প্রদেশ গুর্জ্জরের সুলতান বাহাদুর খাঁকে শাস্তি দিবার মানসে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। হুমায়ুনের আগমনে বাহাদুর মন্দেশ্বরের শিবির হইতে গোপনে একাকী মাণ্ডু নগরে, তথা হইতে চম্পানীর দুর্গে, ও তথা হইতে কাম্বে নগরে পলায়ন করিলেন। হুমায়ুন সেস্থান পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গেলেন, কিন্তু তিনি আসিবার পূর্ব্বেই বাহাদুর দায়ু নগরে পলায়ন করিলেন। বাহাদুরকে ধরিতে না পারিয়া হুমায়ুন গুর্জ্জর প্রদেশ ও দুরাক্রম্য পর্ব্বতদুর্গ চম্পানীর জয়

করিলেন। কিন্তু এ সকল বিজয়ের কোনও স্থায়ী ফল হইল না, হুমায়ুন গুর্জ্জর হইতে চলিয়া যাইবার অচিরকাল পরেই গুর্জ্জরের সমস্ত বিজয়ও মালব প্রদেশ মোগল হস্ত হইতে পুনবায় স্খলিত হইল।

(গ) চম্পানীর জয়ের পরই হুমায়ুন শুনিলেন যে, চুনারের শের খাঁ সমস্ত বিহারের অধিপতি হইয়া বঙ্গ দেশ আক্রমণ করিয়াছেন। হুমায়ুন তৎক্ষণাৎ গুর্জ্জর ত্যাগ করিয়া বিহারে আসিয়া চুনার বেষ্টন করিলেন; শের খাঁ তখন বঙ্গের রাজধানী গৌড় বেষ্টন করিয়াছিলেন। এ দিকে হুমায়ুন চুনার অধিকার করিলেন, অপর দিকে শের খাঁ গৌড় অধিকার করিলেন। আবার যখন হুমায়ুন চুনার লইয়া সের খাঁকে আক্রমণ করিবার জন্য বঙ্গদেশে আসিলেন, বুদ্ধিমান শের খাঁ তখন বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া পুনবায় বিহার প্রদেশে আসিলেন। এ দিকে হুমায়ুন বঙ্গদেশে গৌড় অধিকার করিলেন, অপর দিকে শের খাঁ বিহার প্রদেশে চুনার পুনরুদ্ধার করিলেন। বর্ষার আগমনে হুমায়ুন বঙ্গদেশে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন; শের খাঁ সমস্ত বিহার অধিকার করিলেন, ও হুমায়ুনের আগ্রা-প্রত্যাবর্ত্তনের পথ অবরোধ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সে উদ্যোগ ব্যর্থ হয় নাই। বর্ষার শেষে যখন হুমায়ুন আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, শের খাঁ তাঁহাকে যুদ্ধে এরূপ পরাস্ত করিলেন যে, হুমায়ুনের সমস্ত সৈন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইল ও হুমায়ুন স্বয়ং বহু কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া আগ্রায় পলায়ন করিলেন।

এই অবমাননার প্রতিশোধের জন্য হুমায়ুন পরবৎসর পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। কান্যকুব্জের নিকট-যুদ্ধে হুমায়ুন

পুনরায় পরাস্ত হইলেন ও তৎপরেই দিল্লী ও আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। শের খাঁ হিন্দুস্থানের সম্রাট্ হইলেন।

হুমায়ুন বহু কষ্টে রাজস্থানের মরুভূমি পার হইয়া অমরকোটে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে এই কষ্টের মধ্যে তাঁহার পুত্র প্রসিদ্ধনামা আক্‌বরের জন্ম হয়। তথা হইতে সিন্ধু প্রদেশ জয় করিবার মানস করেন, কিন্তু ব্যর্থপ্রযত্ন হইয়া প্রথমে কান্দাহারে ও তৎপরে পারস্য দেশে যাত্রা করেন। আপাততঃ তিনি পারস্য দেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শের শাহ। ১৫৪০-১৫৪৫। শের শাহ অতিশয় বুদ্ধিমান্, কার্য্যদক্ষ ও প্রজার হিতকারী সম্রাট্ ছিলেন, এবং তাঁহার অল্প রাজত্বসময়ের মধ্যে সমস্ত হিন্দুস্থান সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রজার হিতের জন্য যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বঙ্গদেশ হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত যে, প্রশস্ত রাজপথ করিয়াছিলেন, সেইটিই প্রসিদ্ধ। ইহার স্থানে স্থানে মস্‌জীদ, স্থানে স্থানে সরাই ও হিন্দু ও মুসলমানদিগের আহারাদির সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

(ক) তিনি আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করিবার কিছুকাল পরেই হুমায়ুনের ভ্রাতা কামরাণ পঞ্জাব ত্যাগ করিয়া কাবুলে পলায়ন করিলেন, সুতরাং পঞ্জাব শের শাহের অধিকৃত হইল।

(খ) বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইলে, শের শাহ তাঁহাকে বশে আনিয়া বঙ্গদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে এক জন করিয়া শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, সুতরাং কাহারও বিদ্রোহিতার পথ রহিল না।

(গ) পরবৎসর শের শাহ মালব প্রদেশ জয় করিলেন।

(ঘ) পরবৎসর হিন্দুরাজরক্ষিত রৈসিন দুর্গ জয় করিলেন, এবং সন্ধির কথা বিস্মৃত হইয়া নৃশংসভাবে সমস্ত হিন্দু নগরবাসীকে হত্যা করিলেন! এই নৃশংস নরহত্যা শের শাহের সুযশে মহৎ কলঙ্কস্বরূপ।

(ঙ) এইরূপে প্রায় সমস্ত হিন্দুস্থান অধীনে আনিয়া শের শাহ রাজস্থান বিজয়ের চেষ্টা পাইলেন। প্রথমে তিনি অশীতি সহস্র সৈন্য লইয়া মাড়বার আক্রমণ করিলেন, কিন্তু মাড়বারাধিপতি মালদেব পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন শুনিয়া, অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। সম্মুখ যুদ্ধে সাহস না করিয়া তিনি জাল পত্র দ্বারা মালদেবের মনে অধীনস্থ সেনানীদিগের প্রতি সন্দেহ জন্মাইবার চেষ্টা করিলেন। এই মন্ত্রণা সফল হইল। মালদেব কতকগুলি এইরূপ জালপত্র পাইয়া শের শাহের চক্রান্ত না বুঝিতে পারিয়া, আপন সেনানীদিগের প্রতি সন্দেহ করিলেন, এবং যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া পলায়নতৎপর হইলেন। যে সমস্ত সেনানীর প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ পড়িয়াছিল, তাঁহারা মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইলেন; এবং এক জন আপন নির্দ্দোষিতা দেখাইবার জন্য আপনার কেবল ১২,০০০ সৈন্য লইয়া এরূপ বেগে শের শাহের শিবির আক্রমণ করিলেন যে, শের শাহ অতি কষ্টে পরিত্রাণ পাইলেন। শের শাহ অবশেষে সেই অল্পসংখ্যক রাজপুতকে পরাস্ত করিলেন, কিন্তু মাড়বার বিজয়ের উদ্যম ত্যাগ করিলেন, ও মাড়বারের মৃত্তিকার অনুর্ব্বরতা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আমি এক মুষ্টি শস্যের জন্য আর একটু হইলেই ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য হারাইয়াছিলাম।

(চ) ইহার পর তিনি মিবারের রাজাকে বশীকৃত করিলেন।

(ছ) তৎপরে কালীঞ্জর দুর্গ আক্রমণ করিলেন, এবং এই আক্রমণে দুর্গের গোলায় হত হইলেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে দুর্গ হস্তগত হইয়াছে শুনিয়া, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

সলীম শাহ্, ১৫৪৫-১৫৫৩। সলীম শের শাহের পুত্র। তাঁহার শাসনের প্রারম্ভেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদীলের ও পরাক্রান্ত ওমরাহদিগের নিষ্ফল বিদ্রোহ ভিন্ন তাঁহার রাজ্যকালের মধ্যে আর কোনও ঘটনা ঘটে নাই।

মহম্মদ আদীল শাহ্, ১৫৫৩-১৫৫৬। সলীমের পুত্রকে হত্যা করিয়া সলীমের শ্যালক, মহম্মদ আদীল শাহ নাম ধারণ করিয়া সম্রাট্ হইলেন। তিনি অকর্ম্মণ্য ও জঘন্য বিলাস পটু ছিলেন, রাজ্যের ধন অনায়াসে অপব্যয় করিতেন ও পুরাতন সাহসী ভৃত্যদিগের জায়গীর কাড়িয়া লইয়া আপনার লোকদিগকে দিতেন। এইরূপ অন্যায় ও জঘন্য আচরণে শীঘ্র সমস্ত সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সম্রাটের কেবল এক জন বিশ্বস্ত, অতিশয় সাহসী ও কার্য্যদক্ষ ভৃত্য ছিল, তাঁহার নাম হিমু, তিনি জাতিতে হিন্দু।

চুনারের বিদ্রোহ-দমনার্থে সম্রাট্ তথায় যাইলে, এ দিকে ইব্রাহিম সুর নামক সম্রাটের এক জন আত্মীয় দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। সেকন্দর সুর নামক আর এক জন পঞ্জাবে রাজপদ গ্রহণ করিলেন, পরে ইব্রাহিমকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। আবার এই সুযোগে হুমায়ুন ভারতবর্ষে পুনঃ প্রবেশ করিয়া সেকন্দরকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী ও আগ্রায় পুনরায় মোগল অধিকার স্থাপন করিলেন।

এই সময়ে হিমু সুপ্ত ছিলেন না। সেকন্দর সুরের নিকট পরাস্ত হইয়া ইব্রাহিম সম্রাটকে আক্রমণ করিতে আসিতেছিলেন; হিমু প্রথমে তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। তৎপরে বঙ্গদেশের বিদ্রোহী শাসনকর্তা মহম্মদ সুরকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গ দেশে আপন প্রভুর অধিকার স্থাপন করিলেন। পরে হুমায়ুনের আগমনবার্তা শুনিয়া হিমু অকর্ম্মণ্য প্রভুকে চুনারে রাখিয়া আগ্রার দিকে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই হুমায়ুনের মৃত্যু হয় (১৫৫৫), ও আকবর সম্রাট হন। হিমু আগ্রা বেষ্টন করিয়া অধিকার করিলেন, পরে তর্দীবেগকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন; পরে মোগলদিগের একবারে বিনাশ সাধন করিবার জন্য লাহোরের দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পানিপথের যুদ্ধে আকবরের সেনাপতি বৈরামের নিকট পরাস্ত হইয়া তৎকর্ত্তৃক নিহত হয়েন (১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ)।

ইহার অচির পরে মহম্মদ আদীল শাহ বঙ্গদেশে হত হয়েন। আকবর শাহ নিষ্কণ্টকে দিল্লীর সম্রাট হইয়া রহিলেন।

হুমায়ুনের দ্বিতীয় শাসন, ১৫৫৫। ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়া হুমায়ুন প্রথমে কান্দাহারে, পরে পারস্যদেশে গিয়াছিলেন। পারস্যরাজের সহায়তায় তিনি অচিরে কান্দাহার অধিকার করিলেন; পরে ভ্রাতা কামরাণের সহিত অনেক যুদ্ধের পর কাবুলের রাজা হইলেন ও নিষ্ঠুররূপে কামরাণের দুই চক্ষু অন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর কিরূপে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘটনার ছয় মাস পরেই একটি সোপান হইতে পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

আকবর শাহ, ১৫৫৫-১৬০৫। আকবরের ন্যায় সুযোগ্য, উদারমনা ও বিচক্ষণ সম্রাট কখনও দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। তিনি যেরূপ সাহস ও ক্ষমতার সহিত সমস্ত হিন্দুস্থান বশীকৃত করেন ও সুশৃঙ্খলরূপে শাসন করেন, সেরূপ পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার উদারতা ও সৌজন্যে হিন্দু-রাজগণ যেরূপ তাঁহার বশীভূত ও প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন, মুসলমানাধিকৃত ভারতবর্ষে পূর্ব্বে বা পরে কখনও সেরূপ দৃষ্ট হয় নাই।

(ক) আকবর সম্রাট হইবার পরেই তাঁহার সেনাপতি বৈরামের সহিত পাঠান সম্রাট মহম্মদ আদীলের সেনাপতি হিমুর পানিপথে যে যুদ্ধ হয়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সে যুদ্ধে পাঠানদিগের পরাজয় হয়; কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই সেই পাঠান রাজবংশের সেকন্দর সুর পঞ্জাবে বিদ্রোহী হইলে, আকবর তথায় যাইয়া সেই প্রদেশ বশীভূত করিলেন। আট মাস বেষ্টনের পর আকবর মানকোটের দুর্গ হস্তগত করিলেন, কিন্তু সেকন্দরকে ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপে হিন্দুস্থানে পাঠান-ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল (১৫৫৬ খৃঃ অব্দ)।

(খ) বৈরাম অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন সেনানী ও এ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কর্কশ ব্যবহার ও অত্যাচার সকলের অসহ্য হইয়াছিল, সুতরাং আকবর এক্ষণে রাজ্যভার বৈরামের হস্ত হইতে আপন হস্তে লইলেন। বৈরাম ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া কতক ইতস্তত করিয়া অবশেষে পঞ্জাবে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিলেন, কিন্তু অচিরে আকবরকর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া আকবরের শরণাগত হইলেন।

আকবর তাঁহাকে শাস্তি না দিয়া যথোচিত সম্মান করিলেন। তাহার পর বৈরাম মক্কায় যাইবার জন্য গুর্জ্জর প্রদেশে যাইলে এক জন আফগান তাঁহাকে হত্যা করে। অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে আকবর এক দিনে (১৫৬০ খৃঃ অব্দ) প্রকৃত সম্রাট্ হইলেন।

(গ) কিন্তু তাঁহার বিপদরাশি এখনও শেষ হয় নাই। মোগলদিগের ক্ষমতা এখনও হিন্দুস্থানে সম্যক্‌রূপে স্থাপিত হয় নাই, বিশেষতঃ বালককে সিংহাসনে দেখিয়া তাঁহার আপন কর্ম্মচারীগণও চারি দিকে বিদ্রোহী হইতে লাগিল। তাঁহার ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্ত্তা হাকিম পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন; এবং জৌনপুর, মালব, অযোধ্যা, এলাহাবাদ প্রভৃতি প্রদেশে বিদ্রোহ উত্থাপিত হইল। কিন্তু আকবর আপন অসাধারণ সাহস, বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রকারিতা গুণে এ সমস্ত বিদ্রোহ শীঘ্র দমন করিলেন। হাকিম পুনরায় কাবুলে পলায়ন করিলেন। পঞ্জাব হইতে জৌনপুর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ আকবরের অবিভক্ত অধিকার স্বীকার করিল (১৫৬৭ খৃঃ অব্দ)। তখন আকবর অন্য স্বাধীন প্রদেশ-বিজয়ের অভিলাষ করিতে লাগিলেন।

(ঘ) এ পর্য্যন্ত কোনও সম্রাট রাজস্থান বশীকৃত করিতে পারেন নাই। আকবর সদাচরণ ও বুদ্ধিবলে তাহা কতক দূর সম্পাদন করিলেন। অন্যান্য সম্রাটদিগের ন্যায় তিনি হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন না, বরং তাহাদিগকে মুসলমানদিগের ন্যায় সমান সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন, ও স্বয়ং জয়পুর ও মাড়বারের দুই রাজকন্যাকে বিবাহ করেন, ও জয়পুরের আর একটি রাজকন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দেন। এইরূপ

কুটুম্বিতাসূত্রে বদ্ধ হইযা ও সম্রাটেব উদাব আচরণে তদপেক্ষা অধিক বশীভূত হইযা বাজপুত বাজগণ সম্রাটের অধীনতা স্বীকাব কবিলেন, এবং আপন আপন বাজপুত সৈন্য লইযা সম্রাটেব কার্য্য সাধন কবিতে লাগিলেন।• এই রাজপুত-সহাযতায আকববেব অল্প উপকাব হয নাই। তিনি আপন শাসন কালে ক্রমে গুর্জ্জব হইতে বঙ্গ ও উড়িষ্যাদেশ পর্য্যন্ত যে বিজয় বিস্তাব কবিযাছিলেন, তাহা অনেকটা বাজপুত বাজা-দিগেব সহাযতায। সে বিষয ক্রমে বর্ণিত হইবে।

এইরূপে প্রধান প্রধান বাজপুত বাজগণ সম্রাটেব অধীনতা স্বীকাব কবিলেন বটে, কিন্তু মিবাবপ্রদেশেব মহাবাণা (বাজা) তাহা স্বীকাব কবিলেন না। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে আকবব মিবাবেব বাজধানী চিতোব আক্রমণ কবিলেন। সংগ্রামসিংহেব অযোগ্য পুত্র উদযসিংহ তখন বাণা ছিলেন। তিনি দুর্গ ত্যাগ কবিয়া পলাইলেন; কিন্তু মিবাবেব যোদ্ধাগণ যত দূব সাধ্য, সেই দুর্গ বক্ষা কবিলেন। শেষে আব যুদ্ধ অসম্ভব দেখিযা, নাবীগণ চিতাবোহণ কবিলেন, যোদ্ধাগণ সম্মুখবণে প্রাণত্যাগ করিলেন। চিতোব আকববেব হস্তগত হইল।

উদযসিংহেব মৃত্যুব পর তাঁহাব পুত্র প্রাতঃস্মরণীয় বীর প্রতাপসিংহ পর্ব্বতে ও কন্দবে বাস কবিযা, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সপবিবাবে তাড়িত হইয়াও আকববের অধীনতা স্বীকাব কবিলেন না; ববং বৎসর বৎসর আকববেব অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রথম বৎসবে (১৫৭৬ খৃঃঅব্দে) হলদীঘাটায় অম্বরের রাজপুত রাজা মানসিংহ ও আকবরের পুত্র সলীম প্রতাপকে পরাস্ত করেন, ও কমলমার

ও গোগুন্দ দুর্গ অধিকার করেন। এইরূপে বৎসর বৎসর পরাস্ত ও দুর্গচ্যুত হইয়াও প্রতাপ অধীনতা স্বীকার করিলেন না; অনেক বৎসর পর্য্যন্ত অসাধারণ বীরত্ব ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া অবশেষে মোগলদিগকে দেওয়ীরের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পুনরায় মিবার কাড়িয়া লইলেন। প্রতাপের অসামান্য অধ্যবসায় ও বীরত্ব দেখিয়া আকবরও তাঁহার সাধুবাদ করিলেন, এবং মিবারবিজয়ের আর উদ্যোগ করিলেন না।

(ঙ) ১৫৭২ ও ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে বহু যুদ্ধের পর আকবর স্বাধীন গুর্জ্জর রাজ্য জয় করিয়া দিল্লীর অধীনে আনেন। অন্য যুদ্ধে যেরূপ, এই যুদ্ধেও আকবর সেইরূপ অসাধারণ সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। একবার ১২৬ জন মাত্র সৈন্য লইয়া ১০০০ শত্রুকে আক্রমণ করিয়া মহাসঙ্কটে পড়িলেন, কেবল জয়পুরাধিপতি ভগবান্‌দাস ও তাঁহার পোষ্যপুত্র মানসিংহের অসাধারণ সাহস ও প্রভুভক্তিবশতঃ রক্ষা পাইলেন। গুর্জ্জরের যুদ্ধে হিন্দু সেনাপতি টোডরমল্লও আকবরের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন; ধোলকার যুদ্ধে সেনাপতি উজীর খাঁ পলায়নতৎপর হইয়াছিলেন; কিন্তু টোডরমল্লের অপূর্ব্ব সাহসেই আকবরের সৈন্য জয় লাভ করিল।

(চ) ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের শেষ পাঠান রাজা দাযূদ খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন, ও তাহার পরবৎসরই আকবর সেই প্রদেশ জয় করিবার অভিলাষ করেন। তিনি স্বয়ং পাটনা নগর বেষ্টন ও অধিকার করিয়া, মনাইম খাঁকে সেনাপতি রাখিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু মনাইম খাঁ

নাম মাত্র সেনাপতি ছিলেন, টোডরমল্লই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন ও বার বার দায়ুদ খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে কটকের মহাযুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। দায়ুদ খাঁ তখন সন্ধি দ্বারা (১৫৭৪) বঙ্গ ও বিহার আকবরকে অর্পণ করিয়া কেবল উড়িষ্যা মাত্র আপন অধীনে রাখিলেন। ইহার পর টোডরমল্ল দিল্লী যাত্রা করিলে দায়ুদ খাঁ পুনরায় বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আকবর হোসেনকুলী খাঁকে সেনাপতি করিয়া বঙ্গদেশে পাঠাইলেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় টোডরমল্লই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। দ্বিতীয় বার বঙ্গদেশে আসিয়া টোডরমল্ল দায়ুদ খাঁকে রাজমহলের যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন, এবং সেই যুদ্ধে দায়ুদ খাঁ হত হইলেন। হোসেনকুলী বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইলেন; টোডরমল্ল পুনরায় দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। হোসেনের পর মজফ্ফর খাঁ শাসনকর্ত্তা হইলেন, কিন্তু ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পাঠানগণ পুনরায় বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিল, এবং মজফ্ফর নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। আকবর এ বার টোডরমল্লকেই শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন। টোডরমল্ল বিহারে আসিয়া মুঙ্গেরে পাঠানকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া কয়েক মাস রহিলেন। কিন্তু তিনি হিন্দু জমীদারদিগকে স্বপক্ষে আনিয়া অবশেষে পাঠানদিগকে পরাস্ত করিলেন ও তৃতীয় বার বঙ্গদেশ জয় করিলেন; দুই বৎসর বঙ্গদেশ শাসন করিলে পর তাঁহার অধীনস্থ মোগলগণ অসন্তোষ প্রকাশ ও বিদ্রোহ উপস্থিত করায়, আকবর তাঁহাকে ডাকাইয়া লইলেন, ও আজীম খাঁকে বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

এ দিকে আফগানগণ নিশ্চেষ্ট রহিল না। কতলু খাঁ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে দামোদর নদীর দক্ষিণ পর্য্যন্ত জয় করিলেন। আজীম খাঁর পর জয়পুরের মানসিংহ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি আধুনিক কলিকাতার নিকট শিবির-সন্নিবেশ করিলেন, এবং তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ একটি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পাঠানদিগের বন্দী হইলেন। মোগলপক্ষের সৌভাগ্যবশতঃ কতলু খাঁর এই সময়ে (১৫৯০) মৃত্যু হয় এবং তাঁহার নাবালক পুত্রদিগের রক্ষক ইসা মানসিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। তদ্দ্বারা বঙ্গ ও বিহার মোগলদিগেরই রহিল, উড়িষ্যায় কতলুর পুত্রগণ আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর পর ইসার মৃত্যু হইলে পাঠানদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ হয়, এবং মানসিংহ দ্বিতীয় বার বঙ্গদেশে আসিয়া অবশেষে উড়িষ্যা জয় করেন (১৫৯২ খৃঃ অব্দ)। ইহার আট বৎসর পর কতলুর পুত্র ওস্মান বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আর একবার বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কোনও ফললাভ হইল না।

(ছ) আকবরের ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্ত্তা হাকিম ১৫৮১ খৃঃ অব্দে পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন, এবং তথাকার শাসনকর্ত্তা মানসিংহ (যিনি পরে বঙ্গদেশ-শাসন করেন) হাকিমের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আকবর স্বয়ং পঞ্জাবে আসিলেন, এবং সিন্ধুনদ পার হইয়া কাবুল অধিকার করিলেন; পরে ভ্রাতার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, তাঁহাকে পুনবায়

কাবুলের শাসনকর্ত্তা করিলেন। রাজা মানসিংহের পিতা রাজা ভগবান্‌দাস পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। ইহার ৪ বৎসর পরে ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে হাকিমের মৃত্যু হইলে, মানসিংহ কাবুলের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

(জ) কাশ্মীরদেশের হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে খৃষ্টের পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল; কিন্তু ঐ সময়ে এক জন মুসলমান সেই প্রদেশ জয় করে। সেই সময় হইতে আকবরের সময় পর্য্যন্ত মুসলমান রাজগণ স্বাধীন-ভাবে কাশ্মীর শাসন করিতেন; কিন্তু ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আকবর এই প্রদেশ জয় করিলেন। সেই অবধি এই জগতে অতুল্য সুন্দর পর্ব্বত-প্রদেশ মোগল সম্রাটদিগের গ্রীষ্মকালের আমোদ ও লীলা-স্থান হইল।

(ঝ) পেশাবরের নিকটস্থ পর্ব্বতবাসী আফগানগণ অতিশয় কঠোর ও দুর্দ্দমনীয়। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে আকবর, জৈন খাঁ ও বীর-বলকে তথায় প্রেরণ করিলেন, কিন্তু উভয়েই পর্ব্বতের ভিতর শত্রুকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া পরাস্ত হইলেন, এবং বীরবল হত হই-লেন। বীরবল ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং আকবরের অতিশয় প্রিয় পারিষদ ছিলেন; বীরবলের মৃত্যুবার্ত্তা শুনিয়া আকবর বহু দিন অবধি শোকবিহ্বল হইয়া রহিলেন। বীরবলের মৃত্যুর পর কাবুলের শাসনকর্ত্তা মানসিংহ এবং টোডরমল্ল সেই পার্ব্বতীয়-দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই পার্ব্বতীয় আফগানগণ আজ পর্য্যন্ত কোনও সম্রাট্ বা কোনও জাতির সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করে নাই।

(ঞ) ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে আকবর সিন্ধুপ্রদেশ জয় করিলেন।

(ট) ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে আকবর কান্দাহারপ্রদেশ জয় করিলেন।

(ঠ) এইরূপে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও কাবুল আপন অধীনে আনিয়া আকবর দক্ষিণাপথ-বিজয়ের কল্পনা করিতে লাগিলেন। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আহমদনগর রাজ্যে গৃহবিচ্ছেদ হওয়ায়, আকবর সেই প্রদেশ জয় করিবার জন্য মোরদ ও খানখানানকে পাঠাইলেন। তাঁহারা আহমদনগর বেষ্টন করিলেন; কিন্তু নাবালক সুলতানের পিতৃব্যপত্নী চাঁদ সুলতানা অসাধারণ সাহস ও অধ্যবসায়ের সহিত নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং বর্ম্ম ও অসি ধারণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধ দান করিলেন। নারীর সাহস দেখিয়া সমস্ত নগরবাসীগণ এরূপ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, আকবরের সৈন্য বিফলপ্রযত্ন হইল। অচিরে আহমদনগরের সুলতান কেবল বেরারপ্রদেশ মাত্র সম্রাটকে অর্পণ করিয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন।

কিন্তু এ সন্ধি চিরস্থায়ী হইল না; অচিরে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এ বার আহমদনগরের ভিতর দলাদলি হইতেছিল; বিপক্ষদলকর্ত্তৃক চাঁদ সুলতানা হত হইলেন, ও অচিরে আহমদনগর (১৬০০ খৃঃ অব্দ) মোগলহস্তে পতিত হইল। রাজধানী ধ্বংশ হইল বটে, কিন্তু তথাপি আহমদনগর রাজ্য মোগলদিগের অধীনতা স্বীকার করিল না। আকবরের শাসনকালে সে রাজ্য দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে নাই।

(ড) ১৬০৮ খৃঃ অব্দে খন্দেশপ্রদেশ আকবরের হস্তগত হইল। আকবর নিজ পুত্র দানীয়েলকে খন্দেশ ও বেরারের শাসনকর্ত্তার পদে ও খানখানানকে মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত করিলেন,

এবং প্রসিদ্ধ "আকবরনামা" লেখক আবুলফজলকে আহমদ-নগর রাজ্য-বিজয়ের জন্য নিযুক্ত করিলেন। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, সে রাজ্য আকবরের জীবিতকালের মধ্যে বিজিত হয় নাই।

(ঢ) আকবরের শেষাবস্থায় তাঁহার পুত্র সলীম বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন। আকবর এই আচরণে অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সময় সলীম ভিন্ন অন্য কোনও পুত্র জীবিত ছিল না, সুতরাং তিনি সলীমকেই উত্তরাধিকারী করিয়া গেলেন। ১৬০৫ খৃঃ অব্দে আকবরের মৃত্যু হয়; মৃত্যুর পূর্ব্বে পিতাপুত্রের মিলন হয়। সলীম সজলনয়নে আপন দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পিতার প্রতি উচিত অনুরাগ ও ভালবাসা প্রদর্শন করেন।

আকবরের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসনে কখনও আরোহণ করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। তাঁহার অপরিসীম সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতা, তাঁহার প্রতাপ ও দেশবিজয়, বিজিত শত্রুর প্রতি তাঁহার দয়া ও উদার ব্যবহার, হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহার সদ্ব্যবহার, এবং তাঁহার বিচক্ষণ শাসন পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি প্রকৃত মুসলমান ছিলেন না, একেশ্বরবাদী ছিলেন; পয়গম্বর মানিতেন না, সুতরাং কাফেরদিগের প্রতি মুসলমানদিগের যেরূপ ঘৃণা থাকে, আকবরের তাহা ছিল না। ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ উদার মত ও আচরণ ছিল, সাহিত্যেও সেইরূপ; তিনি সংস্কৃত আলোচনা করিতেন, ও মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি কাব্য এবং ভাস্করাচার্য্যের বীজগণিত লীলাবতী ও অন্যান্য সংস্কৃত পুস্তক অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

তিনি হিন্দু-বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেন, এবং সতীর চিতারোহণ-প্রথা একবারে বন্ধ করিয়া দেন। হিন্দু-দিগের উপর যে জিজিয়া-কর স্থাপিত ছিল, তিনি তাহা উঠাইয়া দেন। নিজে যুক্তি-সঙ্গত ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন; অন্য কোনও ধর্ম্মের বিদ্বেষী ছিলেন না।

দেশ-শাসন-সম্বন্ধে তিনি টোডরমল্লের সহায়তায় যে সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

জাহাঙ্গীর, ১৬০৫-১৬২৭। আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সলীম, জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

(ক) তাঁহার পুত্র খসরু (রাজা মানসিংহের ভাগিনেয়) আগ্রা হইতে পলায়ন করিয়া, পঞ্জাবে যাইয়া লাহোর নগর অধিকার করিলেন; কিন্তু অচিরে পিতার সৈন্য দ্বারা যুদ্ধে পরাস্ত হই লেন এবং কাবুলে পলায়নের সময় ধৃত হইলেন। জাহাঙ্গীর বন্দীদিগকে খসরুর সম্মুখে অতিশয় নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত করিলেন।

(খ) গীয়াসুদ্দীন নামক এক জন পারসীকের কন্যা নুর-জাহান অতিশয় লাবণ্যময়ী ছিলেন, এবং বিবাহের পূর্ব্বে মাতার সহিত সর্ব্বদা সম্রাট আকবরের বেগমদিগের নিকট যাইতেন। জাহাঙ্গীর (তখন যুবরাজ সলীম) নুরজাহানকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাহাতে আকবর পুত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া শের আফগান নামক এক জন পারসীকের সহিত নুরজাহানের বিবাহ দেওয়াইলেন ও তাঁহাকে বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন।

পরে জাহাঙ্গীর সম্রাট হইলে, বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা কুত-বুদ্দীনকে সেই রমণী আনিয়া দিবার আদেশ করেন। শের আফগান কুতবুদ্দীনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া আপন কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন। তৎপরে কুতবুদ্দীন শের আফগানকে হত্যা করিবার উদ্যম করিলে তৎকর্ত্তৃক নিজে হত হইলেন; কিন্তু কুতবের অনুচরকর্ত্তৃক শেরও তৎক্ষণাৎ হত হইলেন; নুর-জাহান দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন।

নুরজাহান স্বামীর হত্যাকারক জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইলেন; জাহাঙ্গীরও কএক বৎসর নুরজাহানকে ভুলিয়া রহিলেন। কিন্তু ১৬১১ খৃঃ অব্দে সম্রাট পুনরায় নুরজাহানের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। নুরজাহান যেরূপ রূপবতী ছিলেন, সেইরূপ অসাধারণ বুদ্ধিমতীও ছিলেন, সুতরাং অচিরে স্বামীকে বশ করিয়া ভারতশাসনকার্য্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন।

(গ) আকবর রাজস্থানের সমস্ত রাজাদিগকে একরূপ অধী-নতা স্বীকার করাইয়াছিলেন, কিন্তু মিবারের মহারাণা প্রতাপ-সিংহকে বশ করিতে পারেন নাই। প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অমরসিংহের সহিত জাহাঙ্গীরের যুদ্ধ চলিতে লাগিল; প্রথমে মহাবৎ খাঁ, তৎপরে আবদুল্লা খাঁ মিবার আক্রমণ করি-লেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে যুবরাজ কুর্ম্ম (পরে যিনি শাহজহান নামে সম্রাট হয়েন), সেই প্রদেশ পুনরায় আক্রমণ করিলেন। অমরসিংহ আর না পারিয়া ১৬১৪ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু সে নাম মাত্র

অধীনতা; অন্যান্য রাজপুত রাজাদিগের ন্যায় তিনি স্বরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

(ঘ) আকবর আহমদনগর রাজ্য জয় করিবার অনেক চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। জাহাঙ্গীরের সময়েও এইরূপ অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টাও নিষ্ফল হয়। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি খানখানানের মোগল সৈন্যের মধ্যে বিরোধ হওয়ায় আহমদনগর-রাজ্যের আবিসিনীয় মন্ত্রী মালিক অম্বর আহমদনগর সহর পুনরায় হস্তগত করিলেন। ১৬১২ খৃঃ অব্দে আবদুল্লা গুর্জ্জর হইতে ও যুবরাজ পরবেজ, খানজেহান ও মানসিংহ খন্দেশ হইতে একবারে আহমদনগর আক্রমণ করিবেন, সম্রাট এইরূপ আদেশ দিলেন। কিন্তু এ উদ্যমও ব্যর্থ হইল। আবদুল্লা সর্ব্বপ্রথমে যুদ্ধস্থানে আসিয়া পরাস্ত হইলেন, পরে সম্রাটের দ্বিতীয় সৈন্য লব্ধবিজয় মালিক অম্বরকে আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। শেষে ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ কুর্ম্ম দক্ষিণাপথে যাইয়া কতকটা জয়সাধন করিলেন; মালিক অম্বর আহমদনগর প্রভৃতি যে যে স্থান জয় করিয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া দিলেন, এবং নাম মাত্র সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেন। ইহার চারি বৎসর পর মালিক অম্বর পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং নর্ম্মদা নদী পার হইয়া মাণ্ডুনগর দগ্ধ করেন; কিন্তু যুবরাজ কুর্ম্মকর্ত্তৃক পুনরায় পরাস্ত হয়েন। তথাপি আহমদনগর সম্যক্‌রূপে জয় হইল না।

(ঙ) যুবরাজ কুর্ম্মই এত দিন পিতার দক্ষিণ হস্তের ন্যায় ছিলেন, কিন্তু নূরজাহানের কুমন্ত্রণায় তিনি এখন পিতার শত্রু

হইয়া উঠিলেন। নুরজাহান পূর্ব্ব-স্বামী শের আফগান-জাত কন্যাকে জাহাঙ্গীরের এক পুত্র শাহরীয়রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন; এবং তিনি যাহাতে জাহাঙ্গীরের পর সম্রাট হয়েন, এইরূপ চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। নুরজাহানের পরামর্শে জাহাঙ্গীর যুবরাজ কুর্ম্মের জাগীর কাড়িয়া শাহরীয়রকে দিলেন, এবং শাহরীয়র কান্দাহার-বিজয়ার্থ যাইবেন, কুর্ম্মের অধিকাংশ সেনা তাঁহার সঙ্গে যাইবে, এইরূপ আদেশ দিলেন। কুর্ম্ম বিদ্রোহী হইয়া তৈলঙ্গে পলায়ন করিলেন, ও তথা হইতে আসিয়া বঙ্গ ও বিহার অধিকার করিলেন। কিন্তু অচিরে সম্রাটের সেনাপতি মহাবৎ খাঁ দ্বারা পরাস্ত হইয়া কুর্ম্ম পুনরায় দক্ষিণাপথে পলায়ন করিলেন ও পুরাতন শত্রু মালিক অম্বরের সহিত এক্ষণে যোগ দিলেন। কিন্তু তাহাতেও সফলপ্রযত্ন না হইয়া অবশেষে শ্রান্ত, পীড়িত ও সৈন্য দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া পিতার অধীনতা স্বীকার করিলেন। ফলে, নুরজাহানই জিতিলেন।

(চ) কিন্তু নুরজাহান ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে চাহিতেন; কুর্ম্মের ক্ষমতা ধ্বংশ করিয়া, মহাবতের ক্ষমতা ধ্বংশ করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সম্রাটের প্রাপ্য অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন, এই অভিযোগে মহাবৎ অভিযুক্ত হইলেন ও সম্রাট-সম্মুখে আসিবার আদেশ পাইলেন। মহাবৎও সমস্ত বুঝিতে পারিয়া সহসা সসৈন্যে আসিয়া সম্রাটকে বন্দী করিলেন। বীর-রমণী নুরজাহান শত্রু-সম্মুখে বিপাশা নদী পার হইয়া স্বামীর উদ্ধারার্থ মহাবতের সহিত যুদ্ধ দান করিলেন, এবং স্বয়ং রণহস্তীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তথাপি অকৃতপ্রযত্ন

হইলেন না। অবশেষে ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বামীর সহিত আপনিও বন্দী হইলেন, এবং আপন অসাধারণ বুদ্ধিবলে অচিরে স্বামীর উদ্ধারসাধন করিলেন। সম্রাট পুনর্বার স্বাধীন হইলেন; নুরজাহানের ক্ষমতার ইয়ত্তা রহিল না। মহাবৎ দক্ষিণাপথে পলায়ন করিয়া কুর্ম্মের সহিত যোগ দিলেন।

১৬২৭ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইল; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নুরজাহানের সমস্ত ক্ষমতালুপ্ত হইল, যুবরাজ কুর্ম্ম শাহ জহান নামে সম্রাট হইলেন।

শাহ্ জহান, ১৬২৭-১৬৫৭। শাহজহান সম্রাট হইয়া ভ্রাতা শাহরীয়র ও পিতৃব্যপুত্রদিগকে হত্যা করিলেন। তাঁহার পুত্র আরংজীব পরে তাঁহার এই নৃশংস আচরণ অনুকরণ করিয়াছিলেন। নুরজাহান বন্দীভাবে আরও বিংশতি বৎসর জীবিত রহিলেন; তাঁহার ব্যয়ের জন্য সম্রাট তাঁহাকে বৎসরে বৎসরে পঞ্চবিংশতি লক্ষ টাকা দিতেন।

(ক) জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালে খানজেহান লোদী দক্ষিণাপথ-বিজয়কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তিনি আহমদনগরের মালিক অম্বরের সহিত সন্ধি করিয়া, মোগলবিজিত সমস্ত প্রদেশ ফিরাইয়া দিলেন। শাহ্ জহান তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া প্রথমে খানজেহানকে মালবে স্থানান্তরিত করিলেন, পরে আগ্রায় আহ্বান করিলেন; কিন্তু খানজেহান সন্দেহপ্রযুক্ত সহসা আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। প্রথমে আহমদনগর, তৎপরে বিজয়পুর ও তৎপরে বুন্দেলখন্দে পলায়ন করিলেন, কিন্তু মোগল সৈন্য দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অবশেষে শেষোক্ত স্থানে হত হইলেন।

খানজেহানের মৃত্যুতে দক্ষিণাপথের যুদ্ধ শেষ হইল না; আহ্মদনগর রাজ্য জয় করিবার জন্য আকবর ও জাহাঙ্গীর বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন; শাহ জহান এক্ষণে সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। আহমদনগরেও এ সময়ে অতিশয় গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল। মালিক অম্বরের পুত্র ফতে খাঁ সুলতানকে হত্যা করিয়া মোগলদিগের সহিত যোগ দিলেন, কিন্তু অচিরে আর এক জন সুলতানকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে দৌলতাবাদ রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাতেও ব্যর্থ প্রযত্ন হইলেন। আহমদনগরের সুলতান বন্দী হইলেন ও ফতে খাঁ মোগলদিগের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিলেন।

তথাপি আহমদনগর বিজিত হইল না। মহারাষ্ট্র-বীর শাহজী পতনোন্মুখ আহমদনগর রাজ্য আপন বাহুবলে স্বাধীন রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুলতানের বংশের আর এক জনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, তিনি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্যে দেশ-শাসনের সুন্দর রীতি স্থাপন করিলেন, বহুসংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন, এবং সুলতানের নামে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সম্রাট এই সমস্ত দেখিয়া স্বয়ং বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া দক্ষিণাপথে আসিলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধ করা শাহজীর সাধ্য নহে; সুতরাং দুই বৎসরের পর ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে সন্ধি স্থাপিত হইল। আহমদনগরের স্বাধীন রাজ্য এত দিনে লুপ্ত হইল, বিজয়পুর ও গলকন্দের সুলতানগণ দিল্লীশ্বরকে কর দিতে স্বীকার করিলেন, এবং শাহজী বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিলেন ও বিস্তীর্ণ জায়গীর ভোগ করিতে লাগিলেন। এই শাহজীর পুত্র প্রসিদ্ধনামা শিবজীর বয়ঃক্রম

তখন দশ বৎসর; তিনিই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহারাষ্ট্রদেশে হিন্দু স্বাধীনতা পুনরায় স্থাপন করেন।

(খ) বাবরের সময় হইতে ভারতবর্ষের সম্রাটগণ কাবুলেরও সম্রাট্ ছিলেন; কিন্তু কাবুলের উত্তরে বল্ক্ ও বাদক্ষাণ ও পশ্চিমে কান্দাহারপ্রদেশ মধ্যে মধ্যে দিল্লীশ্বরদিগের হস্ত হইতে স্খলিত হইত। বিশেষতঃ বল্ক্ বহু দিন হইতে মোগল সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিল, শাহ জহান সেই দেশ বিজয়ার্থ রাজপুত-রাজ জগৎসিংহকে প্রেরণ করিলেন। এই উদ্যমে রাজপুতগণ অসাধারণ সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়াছিল, হিন্দুকুশ পর্ব্বতের ভিতর দিয়া এবং বরফের উপর তাহারা যুদ্ধ করিতে লাগিল, এবং রাজা সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য আবশ্যকমতে স্বহস্তে কোদালি লইয়া মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সম্রাট আপনি কাবুলে আসিলেন, এবং তাঁহার সন্তান মোরাদ বল্ক্ জয় করিলেন, কিন্তু অচিরে উজবেকগণ পুনরায় সেই দেশ আক্রমণ করিল। এবার সম্রাটের আর এক পুত্র আরংজীব যুদ্ধের ভার প্রাপ্ত হইয়া বল্ক্ রক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু যুদ্ধের গতি দেখিয়া এবং এই প্রদেশ অধিক দিন অধীনে রাখা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, অবশেষে শাহ জহান সমস্ত ত্যাগ করিয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন; বল্ক্ ও বাদক্ষাণ জয় হইল না।

কান্দাহারপ্রদেশ জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালে পারস্যরাজের হস্তে পতিত হইয়াছিল, এখন শাহ জহানের রাজ্যকালে দিল্লীশ্বরের হস্তে পতিত হইল, কিন্তু অচিরে পারস্যরাজ পুনরায় এই স্থান জয় করিলেন। তাহার পর আরংজীব দুই বার ও

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা এক বার এই স্থান উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু প্রতিবারই বিফলপ্রযত্ন হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। কান্দাহার দিল্লীশ্বরদিগের হস্ত হইতে চিরকালের জন্য স্খলিত হইল।

(গ) তৎপরে আরংজীব দক্ষিণাপথের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। আহমদনগরের স্বাধীনতা-লোপের পর তথায় গলখন্দ ও বিজয়পুর, এই দুইটি মাত্র স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ছিল। এই দুইটিই দিল্লীর অধীন হয়, আরংজীব এইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশে যাইতেছেন এইরূপ ছল করিয়া, তিনি সহসা গলখন্দের রাজধানী হাইদ্রাবাদ আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিলেন, তথাকার সুলতান আপন কন্যাকে আরংজীবের পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া ও অনেক প্রদেশ ও অর্থ দিয়া আপাততঃ রক্ষা পাইলেন। ইহার পর আরংজীব বিনা কারণে বিজয়পুর আক্রমণ করিলেন, বিদর হস্তগত করিলেন; এবং বিজয়পুরের নগর ও রাজ্য হস্তগত করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা পিতার পীড়ার কথা শুনিয়া, সে উদ্যম ত্যাগ করিয়া, দিল্লীর সিংহাসন হস্তগত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিজয়পুরের সুলতান অনেক অর্থ দান করিয়া আপাততঃ রক্ষা পাইলেন।

(ঘ) অতিশয় বিলাসপটুতার জন্য শাহ জহানের ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে সহসা রোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য ভ্রাতাগণ ইহাতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং তাঁহারা দিল্লীর দিকে আসিতে লাগিলেন। শাহ সুজা বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি

বারাণসী পর্য্যন্ত আসিযা তথায় দারাব পুত্র সলিমাম ও জয়পুরাধিপতি জয়সিংহের নিকট পরাস্ত হইযা বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আরংজীব দক্ষিণাপথ হইতে ও মোরদ গুর্জ্জর হইতে আসিয়া শিপ্রা নদী পার হইযা যশোবন্তসিংহকে পরাস্ত করিলেন। দারা ভীত হইযা স্বযং বহু সৈন্য লইযা আরংজীব ও মোরদের গতিরোধ করিতে আসিলেন; কিন্তু শ্যামাগড়ের যুদ্ধে পরাস্ত হইযা পলাযন করিলেন। আরংজীব আগ্রায প্রবেশ করিযা ছলপূর্ব্বক পিতাকে ও ভ্রাতা মোরদকে বন্দী করিযা, স্বযং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পরবৎসর শাহ সুজা পুনবায যুদ্ধার্থে আসিলেন, কিন্তু আরংজীবকর্তৃক প্রযাগের নিকট পরাস্ত হইযা পুনবায বঙ্গদেশে পলাইলেন। আরংজীব যেরূপ সাহসী ও কার্য্যক্ষম ছিলেন, সেইরূপ ধূর্ত্ত ও কপটাচারী ছিলেন, সুতরাং চারি ভ্রাতার মধ্যে তিনিই পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

শাহজহান বহুসংখ্যক অতিসুন্দর হর্ম্ম্যাদি দ্বারা দিল্লীনগর যেরূপ সুন্দর করিযাছিলেন, সেরূপ সুন্দর নগর, বোধ হয়, সে সময জগতে আর ছিল না। তাঁহার মমতাজমহল নাম্নী এক বেগমের স্মরণার্থ "তাজমহল" প্রস্তুত করিযাছেন, সেরূপ সুন্দর হর্ম্ম্য বোধ হয জগতে আর নাই। দিল্লীর মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত দেওয়ানখাস ও মতিমসজীদ তাঁহারই নির্ম্মিত; এবং তাঁহার কৃত জুম্মামসজীদ জগদ্বিখ্যাত। রত্নমুক্তাবিভূষিত ময়ূর সিংহাসনও তিনিই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মোগল-রাজ্যের অবনতি।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

আরংজীব, ১৬৫৮-১৭০৭। প্রযাগেব যুদ্ধে পবাস্ত হইযা শাহসুজা বঙ্গদেশে পলায়ন কবিলেন। আবংজীবেব পুত্র সুলতান মহম্মদ ও সেনাপতি মীবজুমলা তাঁহাব পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তথায় সুলতান মহম্মদ সুজাব কন্যাকে বিবাহ কবিয়া সুজাব পক্ষে আসিলেন, কিন্তু উভযেই মীবজুমলাব নিকট পবাস্ত হইলেন। শাহসুজা সপবিবারে আরাকানে যাইযা তথাকাব রাজাকর্ত্তৃক হত হইলেন। দাবা শামাগড়েব যুদ্ধে পবাস্ত হইয়া সিন্ধুপ্রদেশে পলাযন কবিলেন; তথায় ধৃত হইযা দিল্লীতে আনীত হইলেন ও আরংজীবেব আদেশে হত হইলেন। কাবারুদ্ধ মোবদও অচিবে আবংজীবেব আজ্ঞায হত হইলেন। এইরূপে পিতাকে বন্দী কবিযা ভ্রাতৃবক্তে স্নাত হইয়া আরংজীব রাজ্য কবিতে লাগিলেন।

(ক) এই সময়ে মহাবাষ্ট্রীয়দিগেব মধ্যে একটি জাতীয় বিপ্লব ঘটিতেছিল। ১৬৩৭ খৃঃঅব্দে আহম্মদনগবেব ধ্বংশের পব শাহজী বিজয়পুরেব সুলতানেব অধীন এক জন সেনাপতি হইয়া প্রশস্ত জায়গীব ভোগ কবিতে লাগিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শাহজীব পুত্র প্রাতঃস্মরণীয় শিবজী ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, স্বাধীন রাজা হইবার চেষ্টা করিতে

লাগিলেন। তিনি প্রথমে তোরণ-দুর্গ, পরে দুই একটি দুর্গ আত্মসাৎ করিলে, বিজয়পুরের সুলতান তাঁহার পিতা শাহজীকে বন্দী করিলেন। পরে শাহজীকে মুক্তি দিলে শিবজীর পুনরায়, পূর্ব্ববৎ আচরণ দেখিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। শিবজী, সৈনাপতি আফ্‌জল খাঁকে হত্যা করিয়া সেই সৈন্যের ধ্বংশসাধন করিলেন। সুল্‌তান আর এক দল সৈন্য পাঠাইলেন, শেষে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলেন; তথাপি কোন বিশেষ জয়লাভ করিতে না পারিয়া শিবজীর সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। শিবজী তদ্দ্বারা সমস্ত কঙ্কণপ্রদেশের অধীশ্বর হইলেন, এবং আপন অধীনে ৭০০০ অশ্বারোহী ও ৫০,০০০ পদাতিক সৈন্য রাখিলেন (১৬৬২ খৃঃ অব্দ)।

শিবজীর ক্ষমতার বৃদ্ধি দেখিয়া আরংজীব তখন শায়েস্তা খাঁ ও মাড়বারের যশোবন্তসিংহকে শিবজীর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। শায়েস্তা খাঁ পুনায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে শিবজী একদিন রাত্রিতে সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, পুনরায় পলায়ন করিলেন; তাহাতে শায়েস্তা খাঁ ভীত হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পরই শাহজীর মৃত্যু হওয়ায় শিবজী রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন (১৬৬৫ খৃঃ অব্দ)।

আরংজীব তখন মহাবলপরাক্রান্ত অম্বরাধিপতি জয়সিংহকে দিলাওয়ার খাঁর সহিত শিবজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। জয়সিংহের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া শিবজী বিনা যুদ্ধেই পরাজয়- স্বীকার ও সন্ধিস্থাপন করিলেন; তদ্দ্বারা তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ দুর্গের মধ্যে বিংশতিটি সম্রাট্‌কে সমর্পণ করিলেন,

ও অবশিষ্ট দ্বাদশটি দুর্গ সম্রাটের অধীনে ভোগ করিবেন, স্বীকার করিলেন। ইহার কিয়ৎপরই জয়সিংহের পরামর্শে শিবজী সম্রাটকে দর্শন করিতে দিল্লী যাত্রা করিলেন। সম্রাট এই সময়ে শিবজীর প্রতি সদাচরণ করিলে তাঁহাকে চিরবিশ্বস্ত ভৃত্য করিতে পারিতেন; কিন্তু আপন ক্রূর ও ধূর্ত্ত বুদ্ধি অনুসারে শিবজীকে প্রথমে অবমাননা করিয়া, পরে যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া দিল্লীতে রাখিবার চেষ্টা করিলেন। শিবজী চক্রান্ত করিয়া দিল্লী হইতে পলায়নপূর্ব্বক আরংজীবের চিরশত্রু হইয়া স্বদেশে উপস্থিত হইলেন (১৬৬৬ খৃঃ অব্দ)।

সম্রাটের আদেশানুসারে জয়সিংহ বিজয়পুর লইবার চেষ্টা করিলেন ও সম্রাটের নিকট সহায়তা চাহিয়া পাঠাইলেন। ধূর্ত্ত আরংজীব আপন অধীনের কোনও কর্ম্মচারী বা সেনা-পতিকে বিশ্বাস করিতেন না; যাহার অধিক ক্ষমতা হইত, সে অতিশয় বিশ্বস্ত ভৃত্য হইলেও তাহার ধ্বংশসাধনের চেষ্টা করিতেন। সেইজন্য এক্ষণে জয়সিংহের অবমাননা করিবার জন্য সহায়তা পাঠাইলেন না; জয়সিংহও ব্যর্থপ্রযত্ন ও ক্ষুণ্ণমনা হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই সুযোগে শিবজী আপনার দুর্গ সমুদয় পুনরায় হস্তগত করিতে লাগিলেন। ১৬৬৮ খৃঃ অব্দ হইতে তিনি বিজয়পুর ও গলখন্দের সুলতানদিগের নিকট কর আদায় করিতে লাগিলেন; এবং ১৬৭০ খৃঃ অব্দে খন্দেশপ্রদেশ হইতে "চৌথ" অর্থাৎ তত্রত্যকার রাজস্বের চতুর্থাংশ আদায় করিলেন। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয়দিগের "চৌথ" গ্রহণের সূত্রপাত। সম্রাট-প্রেরিত সৈন্যদিগকে বার বার পরাস্ত করিয়া শিবজী আপন রাজ্য

ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। উত্তর দিকে তিনি নর্ম্মদা নদী পার হইয়া মোগল প্রদেশ লুণ্ঠন করিলেন; দক্ষিণে মহীশূর পর্য্যন্ত আপনার বিজয় বিস্তার করিলেন। দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিবার পর চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপে দক্ষিণাপথে হিন্দু-স্বাধীনতা স্থিরীকৃত করিয়া ও রাজ্য সুশৃঙ্খল করিয়া শিবজী কালগ্রাসে পতিত হইলেন (১৬৮০ খৃঃ অব্দ)।

(খ) আরংজীব এ দিকে যেরূপ ধূর্ত্ত ও কপটাচারী ছিলেন, আবার সেইরূপ গোঁড়া ধার্ম্মিকও ছিলেন। সুতরাং তিনি প্রথমাবধিই হিন্দুদিগের উপর নানারূপ উৎপাত ও কর-স্থাপন করিয়া, অবশেষে "জিজিয়া" কর স্থাপন করিয়া, সমস্ত দেশের লোককে, বিশেষ রাজপুতদিগকে বিরক্ত করিলেন। সুতরাং রাজপুতগণ আকবরের সময় হইতে যেরূপ দিল্লীর বিশ্বস্ত ও উপকারী কর্ম্মচারী ছিল, এক্ষণে সম্রাটের সেইরূপ প্রবল শত্রু হইয়া উঠিল। মাড়বারের যশোবন্তসিংহ সম্রাটের কার্য্যে কাবুলে প্রাণদান করিলেও অকৃতজ্ঞ সম্রাট সামান্য কারণে তাঁহার পরিবারকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিলেন। সে চেষ্টায় বিফলপ্রযত্ন হইলেন। কিন্তু সমস্ত রাজপুত এই নূতন অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কএক বৎসর পর্য্যন্ত রাজপুতদিগের সহিত সম্রাটের ভয়ানক যুদ্ধ চলিতে লাগিল; অবশেষে মিবারের রাজার সহিত যে সন্ধি-স্থাপন হইল, তাহাতে আরংজীবের বিশেষ কোনও লাভ হইল না। মাড়বার প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে তখনও যুদ্ধ চলিতে লাগিল, আরংজীবের মৃত্যু পর্য্যন্ত সে যুদ্ধ শেষ হইল না।

(গ) শিবজী যত দিন জীবিত ছিলেন, আরংজীব তত দিন

দক্ষিণাপথে আইসেন নাই ; এক্ষণে তিনি ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে সমস্ত দক্ষিণাপথ বিজয়-মানসে দক্ষিণাপথে আসিলেন। ইহার পর ২৪ বৎসর কাল তিনি জীবিত ছিলেন ; কিন্তু এই কালের মধ্যে দক্ষিণাপথের যুদ্ধ শেষ হইল না। আরংজীব দক্ষিণাপথ ত্যাগ করেন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজয়পুর অধিকার করিলেন। এই রূপে সেই স্বাধীন রাজ্য বিলুপ্ত হইল। পরবৎসর তিনি গলখন্দ জয় করিলেন, সুতরাং দক্ষিণাপথে শেষ স্বাধীন মুসলমান রাজ্য বিলুপ্ত হইল। এক্ষণে সম্রাট্ তাঁহার সমস্ত সৈন্য ও বল মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে চালনা করিতে লাগিলেন, বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ চলিতে লাগিল, অনেক দুর্গ আরংজীবের হস্তগত হইল, অনেক যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ পরাস্ত হইল, কিন্তু এ যুদ্ধ শেষ হইল না ; মহারাষ্ট্রীয়গণ বিজিত হইল না। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অশ্বারোহী ক্ষিপ্রগামী, তাহাদিগের কোনও একটি রাজধানীতে সমস্ত বল স্থাপিত ছিল না ; শিবজীর মৃত্যুর পর কোন এক জনের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল না ; সুতরাং এক স্থানে পরাস্ত হইলে তাহারা অন্য স্থানে জড় হইত ; একটি দুর্গ হারাইলে অন্য একটিতে যাইত ; এক জন বন্দী হইলে আর দশ জন যুদ্ধ করিত, সম্মুখযুদ্ধ না করিয়া চারি দিকে মোগলদিগের দেশ-লুণ্ঠন ও সর্ব্বদা আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দান করিত। বিংশতি বৎসরের অনন্ত যুদ্ধেও এরূপ জাতির ক্ষমতা চূর্ণ করিতে না পারিয়া, শ্রান্ত, পীড়িত, বার্দ্ধক্যক্লিষ্ট আরংজীব ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আহমদনগরে প্রাণত্যাগ করিলেন। মোগল শ্রেষ্ঠ আকবর অপেক্ষা আরংজীব সাহস বা অধ্যবসায়ে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা স্থিরপ্রতিজ্ঞায় ন্যূন ছিলেন না ;

তথাপি আকবর আপন উদারস্বভাব, সদাচার ও হিন্দুদিগের প্রতি বিশ্বাস দ্বারা মোগল সাম্রাজ্য গঠিত ও স্থিরীকৃত করেন। আরংজীব আপন ধূর্ত্ততা, জগতের প্রতি অবিশ্বাস ও হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচারবশতঃ সেই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন করিলেন। আরংজীবের সময়েই মোগল সাম্রাজ্য গৌরবহীন ও ক্ষমতাহীন হইল; তাঁহার পর কএক জন হীনবল সম্রাট নাম মাত্র দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন।

বাহাদুর শাহ, ১৭০৭-১৭১২। আরংজীবের পুত্র মোয়াজীম্ ভ্রাতা আজীমকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

(ক) শিবজীর অযোগ্য পুত্র শম্ভুজী আরংজীবকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। শম্ভুজীর পুত্র শাহুর সহিত এক্ষণে মোগলদিগের সন্ধিস্থাপন হইল, তদ্দ্বারা মোগলেরা নিজের লোকের দ্বারা চৌথ আদায় করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দিতে স্বীকার করিল।

(খ) আরংজীবের রাজ্যকালে রাজপুতদিগের সহিত এ পর্য্যন্ত যে যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহা এক্ষণে ক্ষান্ত হইল। সম্রাট্ রাজপুতদিগকে সমস্ত ফিরাইয়া দিলেন। তাহারা আকবরের সময়ে যেরূপ, এক্ষণেও সেইরূপ নাম মাত্র অধীন রহিল।

(গ) খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে নানক নামক এক জন ধর্ম্মগুরু হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম মিশ্রিত করিয়া শিখধর্ম্মের সূত্রপাত করেন। প্রথমে শিখগণ অতিশয় শান্ত ও ধর্ম্মাচারী ছিল, কিন্তু মোগলদিগের অসহ্য উৎপীড়নে ক্রমে তাহারা যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিল। আরংজীবের রাজ্যকালে গুরু গোবিন্দের শিক্ষা-

বলে তাহারা সাহসী যোদ্ধা হইয়া উঠিল, এবং দিন দিন অধিক পরাক্রম লাভ করিতে লাগিল। বাহাদুরের শাসনকালে বন্দু নামক গুরু দ্বারা পরিচালিত হইয়া, তাহারা পূর্ব্ব-পঞ্জাব হইতে অনেক দেশ লুণ্ঠন করিয়া অনেক অত্যাচার করে। সম্রাট তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া লাহোরে আসিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

জেহান্দর শাহ, ১৭১২-১৭১৩। প্রবল মন্ত্রী জুল ফিকারের সহায়তায় বাহাদুরের পুত্র জেহান্দর ভ্রাতাগণকে হত্যা করিয়া সম্রাট হইলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফেরোক্‌-সের বিহারের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ হোসেন ও এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ আবদুল্লার সহায়তায় যুদ্ধে জেহান্দর ও জুল্‌-ফিকারকে নিহত করিয়া সম্রাট হইলেন।

ফেরোক্‌সের, ১৭১৩-১৭১৯। এই ক্ষীণ সম্রাটের রাজ্যকালে দুই ভ্রাতা হোসেন ও আবদুল্লাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন।

(ক) শিখগণ পুনবায় পঞ্জাবে উপদ্রব করাতে এক জন মোগল সেনাপতি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বন্দুকে দিল্লীতে বন্দী স্বরূপ আনেন। এই স্থানে বন্দুকে অতি নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত করা হয়।

(খ) সৈয়দ হোসেনের অত্যন্ত প্রভুত্ব দেখিয়া সম্রাট তাঁহাকে প্রথমে মাড়বার, তৎপরে মহারাষ্ট্রদেশ-বিজয়ার্থ প্রেরণ করেন। দক্ষিণাপথে আসিয়া হোসেন, রাজা শাহুর সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। তদ্দ্বারা শিবজীর সময় হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ যে যে দেশ জয় করিয়াছিল, সমস্তই তাহাদিগের রহিল; এবং সমস্ত দক্ষিণাপথের জন্য মোগলগণ চৌথ (চতু-

র্থাংশ) ও সর্দ্দেশমুখী (অবশিষ্ট তিন অংশের দশমাংশ) দিতে স্বীকার করিল। মহারাষ্ট্রীয়গণও দিল্লীশ্বরকে কর দিতে ও দিল্লী-শ্বরের কার্য্যসাধনার্থে সৈন্য দিতে স্বীকার করিল। হোসেন-কৃত এই সন্ধিতে ফেরোক্সের সম্মত হইলেন না; অচিরে হোসেন দিল্লীতে যাইয়া সম্রাট্‌কে হত্যা করিলেন।

মহম্মদ শাহ, ১৭১৯-১৭৪৮। ফেরোক্সেরকে হত্যা করিয়া সৈয়দেরা ক্রমান্বয়ে রফীউদ্দর্জাৎ ও রফীউদ্দৌ-লাকে সম্রাট করেন; কিন্তু তাঁহারা কএক মাসের মধ্যে কাল-গ্রাসে পতিত হওয়ায় আর এক জনকে মহম্মদ শাহ নামে সম্রাট্ করিলেন।

(ক) ফেরোক্সেরের সময়ে আসফ্‌জা দক্ষিণাপথের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাকে বশীভূত করিবার জন্য সৈয়দ হোসেন দক্ষিণাপথে যাত্রা করিলেন, কিন্তু নূতন সম্রাটকে সঙ্গে সঙ্গে লইলেন। পথিমধ্যে সম্রাটের গুপ্ত আজ্ঞানুসারে হোসেন নিহত হইলেন; ও সম্রাট্ দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া হোসে-নের ভ্রাতা আবদুল্লাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিলেন। এইরূপ সৈয়দদিগের ক্ষমতা শেষ হইল।

(খ) এক্ষণে সম্রাট্ আসফ্‌জাকে উজীরী-পদ দিবার জন্য তাঁহাকে দক্ষিণাপথ হইতে আহ্বান করিলেন। তিনি দিল্লীতে আসিলেন বটে, কিন্তু সম্রাটের বিলাসপটুতা দেখিয়া বিরক্ত হওত দক্ষিণাপথে ফিরিয়া গেলেন, এবং নাম মাত্র দিল্লীর অধীন থাকিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করত হাইদ্রাবাদে রাজ-ধানী করিলেন (১৭২৪ খৃঃঅব্দ)। হাইদ্রাবাদের স্বাধীন রাজ্য অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

(গ) এই সময়ে সাদৎ খাঁ নামে আর এক জন মন্ত্রীও ঐ কারণে বিরক্ত হইয়া অযোধ্যায় গমন করিলেন। তাঁহার স্থাপিত অযোধ্যার স্বাধীন রাজ্য ১৮৫৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

(ঘ) মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ হওয়ায় এত দিন তাহারা অন্য দেশ জয় করিতে পারে নাই; কিন্তু শাহুর "পেশবা" বলজী বিশ্বনাথের বুদ্ধিবলে শাহুর ক্ষমতাই স্থিরী-কৃত হইল। ১৭২০ খৃঃ অব্দে বলজীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র প্রসিদ্ধনামা বাজীরাও পিতার কর্ম্ম পাইয়া প্রথমে গুর্জ্জর ও তাহার পর মালবদেশ জয় করিলেন, পরে ক্রমে দিল্লীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। হাইদ্রাবাদের আসফজা সম্রা-টের সহায়তায় দিল্লীতে আসিলেন; কিন্তু ভূপালের নিকট বাজি-রাওকর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া নর্ম্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে অর্পণ করিয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন (১৭৩৮)। এই বৎসর নাদীর শাহ দিল্লী আক্রমণ করেন। ইহার দুই বৎসর পরে বাজীরাওর মৃত্যু হয়। নীরা নদী-তীরস্থ মলহার রাও হলকার নামক এক জন গোরক্ষক ও রাণাজী সিন্ধিয়া নামক বাজীরাওর এক জন ভৃত্য ক্রমে বাজীরাওর অধীনে সেনানীপদে নিযুক্ত হয়েন। ক্রমে তাঁহারা যে দুইটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

(ঙ) নাদীর কুলী প্রথমে সামান্য লোক ছিলেন, আপন ক্ষমতাবলে পারস্যদেশের রাজা হইয়া পরে সমস্ত কাবুল জয় করিলেন। বাবরের সময় হইতে কাবুল দিল্লীশ্বরদিগের হস্তেই ছিল, এক্ষণে সেই প্রদেশ পৃথক্ হইয়া অন্য রাজার বশীভূত

হইল। কাবুল জয় করিয়া নাদীর শাহ ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারত-বর্ষ আক্রমণ করিলেন। যমুনার নিকট একটি যুদ্ধে দিল্লীশ্বরের সৈন্য পরাস্ত হইল; তৎপরে নাদীর দিল্লীতে আসিয়া সেই নগর বহ্নি ও অসি দ্বারা ছারখার করিলেন, এবং অন্যূন দশ কোটি টাকা ও বহু কোটি টাকার সুবর্ণ, রৌপ্য, রত্ন ও অন্যান্য দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(চ) বাজীরাওর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বলজী "পেশবা" হইলেন। কিন্তু "প্রতিনিধি" রঘুজী তাঁহার পরম শত্রু ছিলেন। রঘুজী (১৭৪২ খৃঃ অব্দ) বঙ্গ ও বিহারদেশ আক্রমণ করিলে, সম্রাট-আদেশে বলজী তথায় যাইয়া রঘুজীকে পরাস্ত করিয়া সে প্রদেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন (১৭৪৩)। ইহার পর বলজী ও রঘুজীর মধ্যে সন্ধিস্থাপন হইল। তদ্দ্বারা বলজী রঘুজীকে বঙ্গ ও বিহারদেশ হইতে "চৌথ" আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করি-লেন। রঘুজীও অচিরে (১৭৪৫) বঙ্গ ও বিহারদেশে পুনরায় গেলেন। তথাকার সুদক্ষ কিন্তু বৃদ্ধ সুবাদার আলীবর্দ্দী খাঁ, দশ বৎসর মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া শেষে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে উড়িষ্যাদেশের আধিপত্য ও বাঙ্গালার "চৌথ" স্বরূপ বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় রাজা শাহুর মৃত্যু হইল; রাজা-রাম বলজীর সহায়তায় রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

(ছ) দিল্লীশ্বর দিন দিন হীনবল হইতে লাগিলেন, এবং ভারত বর্ষের চারি দিকে নূতন নূতন জাতি স্বাধীনতা-লোলুপ হইয়া পরাক্রান্ত হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়, রাজপুত ও শিখদিগের

কথা বারম্বার উক্ত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন রাজধানীর সন্নিকটবর্ত্তী রোহিলখণ্ডে রোহিল্লাগণ ও ভরতপুরে জাঠগণ দিন দিন পরাক্রান্ত হইতে লাগিল। রোহিল্লা-সর্দ্দার আলী মহম্মদ স্বাধীনতা লাভ করিলেন, কিন্তু মহম্মদ শাহ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সর্হিন্দের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন (১৭৪৫)।

আহমদ সাহ, ১৭৪৮-১৭৫৪। মহম্মদ শাহের পুত্র আহমদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

(ক) রোহিল্লারা পুনরায় স্বাধীন হইয়া প্রবল হইয়া উঠিল। অযোধ্যাধিপতি সাদৎ খাঁর পুত্র সফ্‌দরজঙ্গ তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। রোহিল্লারা লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করিল। তখন সফ্‌দরজঙ্গ বহু অর্থ দান করিয়া মহারাষ্ট্র সেনানী সিন্ধিয়া ও হলকারকে ডাকাইলেন, এবং তাঁহাদিগের যোগে রোহিল্লাদিগকে বশীভূত করিলেন।

(খ) মহম্মদ শাহের শাসনকালে কাবুলাধিপতি আহমদ্ দুরাণী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যুবরাজ আহমদ-কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আহমদ্ সম্রাট্ হইলে দুরাণী দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন এবং পঞ্জাব অধিকার করিলেন। সম্রাট আহমদ্ শত্রুকে সেই প্রদেশ সমর্পণ করিয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন।

হাইদ্রাবাদের আসফ্‌জার পৌত্র গাজীউদ্দীন সম্রাট্‌কে অন্ধ ও বন্দী করিয়া রাজবংশীয় আর এক জনকে সম্রাট করিলেন।

দ্বিতীয় আলমগীর, ১৭৫৪-১৭৫৯। আরংজীব দিল্লীর সম্রাট্ হইয়া আলমগীর নাম ধারণ করিয়াছিলেন; সেই

জন্ত এক্ষণে যিনি সম্রাট হইলেন, তিনি দ্বিতীয় আলমগীর নাম ধারণ করিলেন। গাজীউদ্দীন তাঁহার উজীর হইলেন।

(ক) গাজীউদ্দীন শঠতাক্রমে পঞ্জাব হস্তগত করায় আহমদ্ শাহ দুরাণী তৃতীয় বার ভরতবর্ষে আগমন করেন। তিনি দিল্লী অধিকার করিলেন, এবং নাদীর শাহের আক্রমণে যেরূপ হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন হইয়াছিল, এক্ষণেও পুনবায় সেইরূপ হইল দিল্লী ভিন্ন অন্য যে কএকটি নগরে এইরূপ নরহত্যা ও লুণ্ঠন হইল, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ বহুজনাকীর্ণ তীর্থস্থান মথুরার নিরপরাধী হিন্দুগণও একটি বড পর্ব্বের দিনে নৃশংসরূপে হত হইল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে আহমদ্ শাহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(খ) আহমদ্ শাহ স্বদেশে যাইবার পূর্ব্বে গাজীউদ্দীনকে পদচ্যুত করিয়া নজীবউদ্দৌলাকে সম্রাটের উজীর করিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার প্রস্থানের পর গাজীউদ্দীন মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ডাকাইলেন। পেশবা বলজীর ভ্রাতা রাঘব আসিয়া প্রথমে দিল্লীজয় করিলেন, তৎপরে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত সমস্ত পঞ্জাব জয় করিলেন। এই কথা শুনিয়া আহমদ শাহ চতুর্থ বার ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া গাজীউদ্দীন সম্রাটকে হত্যা করিলেন।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় আলমগীরের হত্যায় মোগল সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইল, তাঁহার পুত্র শাহ আলম্ বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন।

পানিপথের যুদ্ধ। মহারাষ্ট্রীয়গণ এক্ষণে ভারতের রাজা হইয়াছিল। দক্ষিণে প্রায় সমুদ্র-তীর হইতে উত্তরে হিমালয় ও সিন্ধু-তীর পর্য্যন্ত তাহাদিগের বিজয় বিস্তৃত হইয়াছিল।

তাহারা দিল্লী হস্তগত করিয়াছিল এবং যে যে প্রদেশ আপনারা শাসন না করিত, তথা হইতে "চৌথ" আদায় করিত। তাহাদিগের বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সেনা ছিল, দশ সহস্র সুসজ্জিত পদাতিক সেনা ছিল, এবং অনেক কামান ও বন্দুক ছিল। তাহাদিগের এই প্রাধান্যে হিন্দু মাত্রেই আনন্দিত হইতে পারিত কিন্তু তাহাদিগের অসভ্য ও নৃশংস যুদ্ধপ্রণালীতে সমস্ত ভারত-বাসীগণ ত্যক্ত হইয়াছিল। অন্যান্য জাতির ন্যায় তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত না, গ্রাম লুণ্ঠন করা, পল্লীগ্রাম দাহ করা, শস্যক্ষেত্র ধ্বংশ করা তাহাদিগের রীতি ছিল। অন্যান্য জাতির যুদ্ধে নির্দ্দোষী গ্রামবাসী ও প্রজাগণ অধিক কষ্ট বোধ করিত না; রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইত, প্রজারা আপন আপন ব্যবসায়ে রত থাকিত; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণ যে দেশে যাইত, তথাকার সমস্ত লোকের সর্ব্বনাশ করিত, তাহারা অধিক দিন যে দেশে থাকিত, সে স্থান প্রথমে দুর্ভিক্ষপীড়িত, পরে জনশূন্য হইত। কথিত আছে, সিন্ধিয়া যখন রোহিলখণ্ডে গিয়াছিলেন (১৭৫৯), তখন এক মাসের মধ্যে তিনি ১৩০০ গ্রাম দগ্ধ করেন। এরূপ ভয়ানক ও অসভ্য অত্যাচারে ভারতবাসীগণ প্রপীড়িত হইল; সকলে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ভয় করিতে লাগিল। বঙ্গদেশে "বর্গীর হাঙ্গামার" নাম শুনিলে, বহু দিন পর্য্যন্ত লোকের হৃৎকম্প হইত।

আহমদ শাহ চতুর্থবার ভারতবর্ষে আসাতে মহারাষ্ট্রীয়গণ অচিরে উত্তর-পশ্চিম হইতে সরিয়া আসিল এবং আহমদ শাহ দিল্লী হস্তগত করিলেন। পরে উভয় পক্ষ আপন আপন সৈন্য

সংগ্রহ করিয়া পানিপথের নিকট আসিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের ৭০,০০০ অশ্বারোহী, ১৫,০০০ পদাতিক ও ২০০ কামান ছিল, আহমদ শাহের ৫৩,০০০ অশ্বারোহী, ৩৭,০০০ পদাতিক ও ৬০ কামান ছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ আপনাদিগের গড়খাইয়ের ভিতর রহিল; বাহির হইয়া যুদ্ধ করিলে পরাজয়ের সম্ভাবনা, এই জন্য কএক মাস অবধি বাহির হইল না, কিন্তু ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি তারিখে খাদ্য কষ্টের জন্য বাহির হইয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইল।

যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ পরাস্ত হইল, এবং তাহাদিগের প্রধান প্রধান সেনাপতি ও অধিকাংশ সৈন্য ধ্বংশপ্রাপ্ত হইল। ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্র প্রাধান্য কিছু কালের জন্য বিলুপ্ত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মোগল-শাসন-কালে ভারতবাসীদিগের অবস্থা।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

উত্তর ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান।—আমরা নবম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, পাঠান দিল্লীশ্বরগণ হিমালয় হইতে যমুনা নদী পর্য্যন্ত এবং সিন্ধু হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। মোগল দিল্লীশ্বরগণ এই সাম্রাজ্য চারি দিকে বিস্তৃত করিয়াছিলেন। পশ্চিমে পারস্যদেশের সীমা হইতে পূর্ব্ব দিকে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত এবং উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে

আহমদনগব, বেরার ও খন্দেশ পর্য্যন্ত মোগল সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কাবুল রাজ্য বাবরের সময়েই দিল্লীশ্বরের অধিকৃত ছিল; পরে হুমায়ুনের সময়ে পৃথক্ হইয়া পুনরায় আকবরের সময় একীকৃত হয়। সেই পরাক্রান্ত ও বিচক্ষণ সম্রাট্ উত্তরে কাশ্মীর, পূর্ব্বদিকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা, দক্ষিণে সিন্ধু, গুর্জ্জর মালব, খন্দেশ, বেরার ও আহমদনগরের কিয়দংশ জয় করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের যে আয়তন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। জাহাঙ্গীর ও শাহ জহানের শাসনকালে আহমদনগর ভিন্ন আর কোন দেশ বিজিত হয় নাই; বরং কাবুলের পূর্ব্বাংশ কান্দাহার মোগল-হস্ত হইতে স্খলিত হইযাছিল। পরে আরংজীব যদিও বিজয়পুর ও গলখন্দ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন বটে, তথাপি সে প্রদেশ শতাংশৎবর্ষও দিল্লীর অধীন থাকে নাই; তথায় হাইদ্রাবাদের নূতন স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। সুতরাং মহানুভব আকবর শাসিত প্রদেশই মোগল-শাসিত প্রদেশ বলিয়া বর্ণনা করিলে অধিক ভ্রম হয় না। সে প্রদেশের সীমা আমরা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি; পশ্চিমে পারস্যদেশের সীমা হইতে পূর্ব্ব দিকে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত, উত্তরে কাশ্মীর ও হিমালয় হইতে দক্ষিণে বেরার ও আহমদনগর পর্য্যন্ত। এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের মধ্যে কেবল একটি প্রদেশ স্বাধীন ছিল; রাজপুত রাজগণ নামে অধীনতা স্বীকার করিলেও, আপন আপন রাজ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে আপনাদিগের রীতি, নিয়ম ও বিধি অনুসারে রাজত্ব করিতেন।

মোগল-সাম্রাজ্য বিস্তৃতিতে যেরূপ পাঠান-সাম্রাজ্য হইতে অধিক, মোগল-শাসন-প্রণালীও সেইরূপ পাঠান-শাসন-প্রণালী

হইতে সূক্ষ্ম ও বহুদূর-বিচারী। ভূমি-পরিমাপ ও কর আদায় সম্বন্ধে মোগল-সম্রাটগণ যেরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া ছিলেন, পাঠান-সম্রাটগণ কখন সেরূপ চেষ্টা করেন নাই। পাঠান-রাজগণ অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা বা কর্ম্মচারীদিগের উপর যে সমস্ত বিষয় ন্যস্ত রাখিতেন, মোগল-রাজগণ সেই সমস্ত বিষয়ে আপনারা বিধি-স্থাপন করেন।

আকবর সমস্ত সাম্রাজ্য ১৫টী সুবায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। সে সুবাগুলি এই ;—

১ দিল্লী	৯ অযোধ্যা
২ আগ্রা	১০ এলাহাবাদ
৩ কাবুল	১১ বিহার
৪ লাহোর	১২ বঙ্গ
৫ মুলতান	১৩ খন্দেশ
৬ আজমীর	১৪ বেরার
৭ গুর্জ্জর	১৫ আহমদনগর
৮ মালব	

প্রত্যেক সুবায় এক জন করিয়া সুবাদার ও আয়-ব্যয়-পরিদর্শন জন্য এক জন করিয়া দেওয়ান নিযুক্ত হইতেন। নিজ সুবায় সুবাদারের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। তিনি শাসনকর্ত্তা ও সমস্ত সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন, এবং দিল্লীশ্বরকে নিরূপিত কর পাঠাইয়া দিয়া আপন সুবায় প্রায় রাজার ন্যায় আধিপত্য করিতেন। তাঁহার অধীনে কর আদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত, এবং "ফৌজদার" অর্থাৎ সেনানীগণ আপন আপন জেলায় শাসন ও শান্তি রক্ষা করিতেন। প্রধান প্রধান

নগরে কাজীগণ বিচার করিত এবং কোতওয়ালগণ শান্তি রক্ষা করিত। পল্লীগ্রামবাসীগণ চিরকালই আপনাদিগের কার্য্য আপনারাই নির্ব্বাহ করিত, আপনাদিগের বিবাদ বিসম্বাদ মণ্ডল বা পঞ্চাইতের দ্বারা নিষ্পত্তি করিত। ভারতবর্ষে চিরকালাবধি ক্ষেত্র-বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামগুলি এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করপ্রদ রাজ্যের ন্যায় আপনাদিগের গ্রাম্য ব্যাপার আপনারা নির্ব্বাহ করিত; রাজকর একত্র করিয়া রাজকর্ম্মচারী বা জমীদারকে দিত, তাহারা সুবাদারের রাজকোষে পাঠাইয়া দিত, সুবাদার সমস্ত সুবার কর একত্র করিয়া বহু শকটে সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লীতে প্রেরণ করিতেন। বঙ্গদেশে জমীদারগণই চিরকাল প্রজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ সুবাদারের নিকট প্রেরণ করিতেন; কিন্তু পাঠানদিগের অধীনে তাঁহাদিগের আপন আপন জমীদারির ভিতর যতটা স্বাধীন ক্ষমতা ছিল, মোগলদিগের কঠোর শাসনে তাহার অনেক হ্রাস হইল। বঙ্গদেশের এক জন শাসনকর্ত্তা মুর্শীদকুলী খাঁ অনেক জমীদারকে কারারুদ্ধ করিয়া আপন কর্ম্মচারী দ্বারা গ্রামের প্রাপ্য কর স্থির করিলেন; শেষে এই অধিক পরিমাণ কর জমীদারগণ না দিতে পারিলে তাহাদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতেন। তথাপি বঙ্গদেশে জমীদার ও কৃষক-দিগের মধ্যে রাজা-প্রজা-সম্বন্ধ কখনও একবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

সম্রাট্ সুবাদারদিগের আচরণসম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে অনেক উপদেশ পাঠাইয়া দিতেন; কিন্তু দূরবর্ত্তী সুবার সুবাদারগণ যে, সেই উপদেশ অনুসারে সর্ব্বদা কার্য্য করিতেন, এরূপ বোধ

হয় না। তাঁহারা নিজ নিজ সুবার মধ্যে এক এক জন স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের ন্যায়ই অনেকটা কার্য্য করিতেন।

ভারতবর্ষে সৈন্যাধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারীদিগের বেতনস্বরূপ জায়গীর দান করার রীতি হিন্দুরাজত্বের সময় হইতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু জায়গীর দান করিলে জায়গীরদারগণ অনেকটা স্বাধীন ক্ষমতা লাভ করে, এই জন্য মোগল সম্রাটগণ জায়গীরদানে বিরত ছিলেন। আকবর সৈন্যদিগকে বেতনস্বরূপ জায়গীর দেওয়ার রীতি একবারে বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে মাসিক বেতনস্বরূপ অর্থ দিবার নিয়ম স্থাপন করেন। পুরাতন জায়গীরদারদিগের উপরও কঠিন নিয়ম স্থাপিত হয়। সৈন্যাধ্যক্ষগণ মনসবদার নাম প্রাপ্ত হইয়া, দশ সহস্র, সপ্ত সহস্র বা পঞ্চ সহস্র বা তদপেক্ষা ন্যূনসংখ্যক সেনার বেতন রাজকোষ হইতে পাইতেন এবং আপন অধীনে সেই সেই পরিমাণ সেনা রাখিতে বাধ্য থাকিতেন। তাঁহাদিগকে "দশ হাজারী" বা "সাত হাজারী" বা "পাঁচ হাজারী" বলিত। এবং তাঁহারা আপন আপন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজকোষ হইতে বেতন মাত্র পাইতেন। রাজপুত রাজগণ আপন আপন জাতীয় যোদ্ধা লইয়া সম্রাটের কার্য্যসাধন করিতেন এবং মনসবদার-পদ প্রাপ্ত হইয়া দিল্লী হইতে বেতন প্রাপ্ত হইতেন। ফলতঃ তাঁহাদিগের প্রভুত্ব-ক্ষমতা ও সম্মান ছিল এবং আরংজীবের পূর্ব্বের দিল্লীশ্বরগণ তাঁহাদিগকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন। ভগবান্‌দাস, মানসিংহ, জয়সিংহ, যশোবন্তসিংহ প্রভৃতি সম্রাটদিগের যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। একা মানসিংহ, আকবর ও জাহাঙ্গীরের পক্ষে অসংখ্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন;

এবং তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে বঙ্গদেশের, দক্ষিণাপথের, কাবুল ও লাহোরের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিজিত জাতির প্রতি এরূপ সম্মান ও বিশ্বাস প্রায় দেখা যায় না; এরূপ সদাচরণে বিজেতাদিগেরও উপকার হয়, পরাজিত জাতিও পরাধীনতার কষ্ট কতকটা বিস্মৃত হয়।

কর-আদায়সম্বন্ধে আকবর যে সুন্দর নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক। হিন্দু রাজগণ ক্ষেত্রের উৎপন্নের ষষ্ঠাংশ লইয়া সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু আকবর উৎপন্নের তৃতীয়াংশ করস্বরূপ লইতেন। আকবর বলিতেন যে, যদিও এই রূপে তিনি ভূমির কর বৃদ্ধি করিলেন বটে, কিন্তু অন্য নানারূপ বিরক্তিজনক কর ও মাশুল তিনি একবারে ত্যাগ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজাদিগের অনেক কষ্টের লাঘব সাধন করিয়াছেন।

এই ভূমিকর আদায়ের জন্য তিনি প্রথমে সমস্ত কর্ষণ-যোগ্য ভূমির পরিমাপ করেন, পরে সেই ভূমির উর্ব্বরতা অনুসারে তাহাকে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এই তিন প্রকার ভূমির উৎপন্নের পরিমাণ ঠিক দিয়া, পরে তিন দিয়া হরণ করিলে গড়ে যে ফসল হয়, তাহা পাইতেন, এবং তাহারই তৃতীয়াংশ তিনি রাজকরস্বরূপ লইতেন। যথা—

প্রথম	শ্রেণী	গহমের	ভূমিতে	প্রতি	বিঘায়	১৮ মণ	গহম	হয়।
দ্বিতীয়	,,	,,	,,	,,	,,	১২ মণ	,,	,,
তৃতীয়	,,	,,	,,	,,	,,	৮ মণ ৩৫ সের	,,	

ঠিক দিলে তিন বিঘাতে ৩৮ মণ ৩৫ সের হয়। তাহার তৃতীয়াংশ ১২ মণ ৩৮৸৷০ সের প্রতি বিঘার গড় ফসল। তাহার তৃতীয়াংশ ৪ মণ ১২৷৷৶ সের রাজকরস্বরূপ প্রাপ্য।

এই কব অত্যন্ত অধিক, কিন্তু এই কর ববাবব আদায় হইত না। যে জমীতে প্রতি বৎসব ফসল হইত, তাহাতেই এই কর আদায় হইত। যে জমী পতিত থাকিত, তাহার খাজনা লাগিত না। বন্যা বা অন্যান্য কাবণেব জন্য যে জমীব যত অপকার হইযাছে, সেই পবিমাণে তাঁহাব কব মাপ হইত।

এইরূপে মোগলাধীন সমস্ত ভাবতবর্ষে ভূমি-পবিমাপ ও কব আদায় হইতে লাগিল। মহানুভব টোডবমল্ল, যিনি প্রথমে গুর্জ্জবে যুদ্ধ কবিযাছিলেন, পবে বঙ্গদেশ জয কবিযাছিলেন, তিনিই এই বিশাল বন্দোবস্তেব প্রণেতা।* কিন্তু আমবা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিযম কবিলেই নিযম পালন হয না, আদেশ বা উপদেশ দান কবিলেই তাহা কার্য্যে পবিণত হয না। প্রত্যেক সুবাব শাসনকর্ত্তাদিগের অনেকটা স্বাধীন ক্ষমতা ছিল, এবং তাঁহারা সেইটি স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতেন। জাহাঙ্গীরেব সময ইংবাজদিগেব সহিত ভাবতবর্ষেব বাণিজ্যেব সুবিধাব জন্য হকিন্‌স্ ও সাব্ তমাস বো ভাবতবর্ষে আগমন কবেন। তাঁহাদিগেব বর্ণনা হইতে শাসনকর্ত্তাদিগেব স্বাধীন ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচাবেব অনেক পবিচয পাওযা যায। বো বলেন, কি সমুদ্রবন্দব সমূহে, কি অন্য স্থানে, শাসনকর্ত্তাগণ প্রজাদিগেব উপব স্বেচ্ছাচাব কবিতেন ও অন্যায পূর্ব্বক অনেক অপহবণ কবিতেন। মুর্শীদকুলী খাঁ বঙ্গদেশেব জমীদাবদিগেব উপব যে অত্যাচাব

---

* টোডবমল্লের পঞ্জাবে জন্ম হয়, তাঁহাকে কেহ কাযস্থ, কেহ ক্ষত্রিয বলেন। বস্তুতঃ তাঁহাতে ক্ষত্রিয়েব ন্যায় অসাধাবণ সাহস ও বণপাণ্ডিত্য, ও কাযস্থের ন্যায হিসাবে পাবদর্শিতা ও আয়ব্যয় বন্দোবস্তেব ক্ষমতা উভয়ই ছিল।

করিতেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে; এবং রাজা মানসিংহ যখন বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন এক জন অধীনস্থ কর্ম্মচারী বর্দ্ধমানে কিরূপ অত্যাচার করিতেন, তাহা আমরা মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের প্রারম্ভে দেখিতে পাই। রাজা ও রাজপুরুষদিগের স্বেচ্ছাচারিতা, বোধ হয় জগতের সকল উষ্ণ-দেশে সকল সময়ে প্রচলিত আছে, বিশেষ ভারতবাসীগণ নিতান্ত ধীরপ্রকৃতি বলিয়া এরূপ রাজকীয় স্বেচ্ছাচারিতা কি হিন্দু কি পাঠান কি মোগল, সকল রাজার অধীনেই বহন করিয়াছে।

কোন কোন নগরের সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া হকিন্স্ এবং রো বিস্মিত হইয়াছেন, এবং সম্রাটের রাজধানীর অপরি-সীম সৌন্দর্য্য ও ও ধুমধামের বিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। মোগল-দিগের অধীনে শিল্পকার্য্যেরও বিস্তর সুখ্যাতি করিয়াছেন। শান্ত, স্বকার্য্যরত গ্রামবাসীদিগের অধিক বর্ণনা নাই।

সম্রাটের কথা রো লিখিয়াছেন যে, তিনি প্রাতঃকালে উঠি-য়াই আপন গবাক্ষ হইতে নীচে রাজদর্শনেচ্ছু প্রজাদিগকে দর্শন দিতেন; দ্বিপ্রহরের সময় পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি জন্তুর যুদ্ধ দর্শন করিতেন; ও বৈকালে তিনি দরবারে বসিয়া রাজকার্য্য ও বিচারকার্য্য সমাধা করিতেন। তথায় সিংহাসনের চারি দিকে দুই সারি রেল ছিল। নিকটবর্ত্তী রেলের ভিতর কেবল অতিশয় সম্মানিত লোকে স্থান পাইতেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকে দ্বিতীয় রেলের ভিতর স্থান পাইতেন, এবং অসংখ্য সাধারণ লোকে রেলের বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া রাজ-দর্শন পাইত। সম্রাট প্রত্যহ এই দরবারে আসিতেন, পীড়া বা মদ্যপানবশতঃ এক দিন না আসিলে তাহার ক্ষমা আছে.

দুই দিন না আসিলে তাহার ক্ষমা নাই। সমস্ত রাজাদেশ তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ হইত ও রাজকার্য্য এইরূপে প্রচারিত হইত; সুতরাং সমস্ত রাজ্যের লোকে জানিতে পারিত। সন্ধ্যার সময় সম্রাট দরবার গৃহের নিকট "গোসলখানায়" বিশ্বাসী অমাত্যদিগের সহিত কথোপকথন করিতেন। সম্রাটের জন্মদিনের অথবা অন্য পর্ব্বের ধুমধাম ও মণি মাণিক্যের ছড়াছড়ি দেখিয়া সার্ টমাস রো বিস্মিত হইয়াছিলেন।

সৈন্যসম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রাজপুত ও পাঠান ভিন্ন ভারতবর্ষে সাহসী সেনা ছিল না।

টাবের্ণীয়ে নামক ফরাসী ভ্রমণকারী শাহ জহানের সময়ে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য্য ও শান্তির অনেক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ এই সময়ে ভারত সাম্রাজ্য যেরূপ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেরূপ বোধ হয়, মুসলমানদিগের অধীনে পূর্ব্বে কখনও করে নাই। এখনও শাহ জহানের কৃত যে অসংখ্য প্রাসাদ, জলপ্রণালী, পথ, সরাই, জলাধার প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করে।

তথাপি আমরা রাজধানীর সমৃদ্ধি ও সম্রাটের কার্য্য সমুদয়, তাজমহলের সৌন্দর্য্য বা ময়ূর-সিংহাসনের অপারসীম মূল্যের বিষয়ে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদিগের বর্ণনা পাঠ করিয়া যেন প্রজাদিগের প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত না হই। সমস্ত হিন্দুস্থানের অর্থ রাশীকৃত হইয়া দিল্লীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিত, কিন্তু দিল্লী সমস্ত ভারতবর্ষ নহে, দিল্লীর অসংখ্য সুন্দর প্রাসাদ দেখিয়া যেন আমরা সমস্ত ভারতবাসীদিগকে সেইরূপ সমৃদ্ধিশালী মনে না করি। তথাপি প্রজাদিগের অবস্থাও নিতান্ত মন্দ ছিল না।

রাজপুরুষদিগের স্বেচ্ছাচারিতা সত্ত্বেও তাহারা উর্ব্বরা ভারতবর্ষে নিজ নিজ চাষ বা বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া একরূপ স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিত। বিশেষ, শাহ জহানের শাসনকালে তাহারা যেরূপ শান্তি ভোগ করিয়াছিল, পূর্ব্বে কখনও সেরূপ করে নাই।

আরংজীবের রাজ্যকালের প্রারম্ভে বের্ণীয়ে নামক এক জন প্রসিদ্ধ ফরাসী ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে অনেক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে প্রকৃত অবস্থা অনেক জানা যায়। তিনি দিল্লীর চতুর্দ্দিকের প্রাচীর, বিস্ময়কর দুর্গ ও প্রাসাদ (যাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে,) রাজদরবার ও রাজকার্য্য, ওমরাহ্ ও মন্‌সবদারদিগের বড় বড় অট্টালিকা, দরিদ্র লোকের অসংখ্য পর্ণকুটীর, প্রধান প্রধান পথ ও জনপূর্ণ বাজার এবং দোকান প্রভৃতির অনেক বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ের অধিক বর্ণনা এ স্থানে দিবার প্রয়োজন নাই।

দেশের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের ন্যায় অনেক স্থান অতিশয় উর্ব্বর। বঙ্গদেশ মিশর অপেক্ষাও উর্ব্বর এবং এই প্রদেশে কেবল যে ধান্য এবং অন্যান্য খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়, এমত নহে, রেশম, তুলা ও নীল প্রভৃতি বাণিজ্যের দ্রব্যও উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে লোকসংখ্যা প্রচুর; ভূমিতে চাষ হয়। শিল্পব্যবসায়ীগণ স্বভাবতঃ অলস হইলেও আপন আপন কার্য্যে রত থাকে এবং গালিচা, জরী, সুবর্ণ ও রৌপ্যখচিত বস্ত্রাদি এবং উত্তম উত্তম রেশম ও সূতার বস্ত্র নির্ম্মাণ করে। এই সমস্ত নানারূপ বাণিজ্য দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে বাহির হইয়া যায়, এবং তাহার বিনিময়ে জগতের নানা

দেশ হইতে সুবর্ণ ও রৌপ্য আসিয়া এই দেশে জড় হয়। ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশোৎপন্ন দ্রব্য অধিক ব্যবহার করে না, সুতরাং সুবর্ণ ও রৌপ্য ভারতবর্ষ হইতে অধিক বাহির হইয়া যায় না। ভারতবর্ষে অর্থ ও অনেক সুবর্ণ, রৌপ্য থাকার এই একটি কারণ। এই সুবর্ণ, রৌপ্য অধিকাংশই স্ত্রীলোকদিগের গহনার জন্য ব্যবহৃত হইত, সামান্য লোক ও অতি দরিদ্র সেনাও আপন স্ত্রীকে গহনা দিত।

অন্যান্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে যে দ্রব্যাদি আসিত, বের্ণীয়ে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়াছেন। সিংহল প্রভৃতি দ্বীপ হইতে হস্তী ও নানারূপ মসলা আসিত, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশ হইতে সীসা আসিত, ফ্রান্স হইতে বস্ত্রাদি আসিত, ও তাতার, আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে অশ্ব আসিত। সমরখন্দ ও বোখারা প্রভৃতি দেশ হইতে আঙ্গুর, বাদাম, পেস্তা, আক্রোট, কিস্‌মিস্‌, আপেল প্রভৃতি ফল আসিত। মল্লদ্বীপ হইতে কড়ি আসিয়া বঙ্গ ও অন্যান্য দেশে অর্থস্বরূপ ব্যবহৃত হইত; মিশর হইতে গণ্ডারের শৃঙ্গ, হস্তীর দন্ত ও গোলাম আসিত, চীন হইতে মৃগনাভি ও কাচের বাসন আসিত, এবং সিংহল প্রভৃতি দ্বীপ হইতে মুক্তা আসিত।

সৈন্যসম্বন্ধে বের্ণীয়ে লিখিয়াছেন যে, রাজপুত রাজা, মুসলমান ওমরাহ ও মন্‌সবদারগণই সৈন্যাধ্যক্ষ। প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈন্য মাসে পঞ্চবিংশতি টাকার অনন বেতন পাইত এবং পদাতিকগণ প্রত্যেকে দশ, পঞ্চদশ বা বিংশতি টাকা বেতন পাইত। কামান-চালনার জন্য ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পোর্তুগীজ, বা জর্মান সৈন্য নিযুক্ত হইত, এবং প্রথম প্রথম

তাহারা ২০০ টাকা করিয়া বেতন পাইত; কিন্তু ক্রমে মোগলগণ কামানের ব্যবহার শিক্ষা করিলে ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা কমিয়া গেল এবং তখন তাহারা ৩২ টাকার অধিক বেতন পাইত না। সম্রাটের নিজের সৈন্য অনুমান ৪০,০০০ অশ্বারোহী ও ১৫,০০০ পদাতিক, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদিগের সৈন্য একত্র করিলে সর্ব্বশুদ্ধ সম্রাটের দুই লক্ষ অশ্বারোহী ও এক লক্ষের অনধিক পদাতিক ছিল। সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্য, দোকানী ও বাজার চলে, এইজন্য সৈন্য আরও অধিক বলিয়া বোধ হয়। দিল্লী ও আগ্রার অধিকাংশ প্রজাই সৈন্য বা তাহাদিগের ভৃত্য, সৈন্যগণ দিল্লী বা আগ্রা ত্যাগ করিলে সেই নগর যেন শূন্য হইয়া যাইত।

সম্রাট, সেনানী ও শাসনকর্ত্তাদিগকে বেতনস্বরূপ অর্থ না দিয়া তাহাদিগকে জায়গীর প্রদান করিতেন; সেই জায়গীরে জায়গীরদারদিগের অবিভক্ত অধিকার থাকিত। জায়গীর ভিন্ন অবশিষ্ট ভূমি সম্রাটের নিজের, তিনি ইজারা করিয়া দিতেন। এই জায়গীরদার, শাসনকর্ত্তা ও ইজারাদারের স্বেচ্ছাচারিতার কথা বের্ণীয়ে অনেক লিখিয়াছেন; পল্লীবাসী কৃষক এবং নগরবাসী বণিক তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ অধীন ছিল, তাঁহারা অত্যাচার করিলে তাহার প্রতীকার ছিল না। অর্থ দেখিলেই ইহাঁরা লুব্ধ হইতেন। সুতরাং বণিকদিগের অধিক অর্থ-সঞ্চয়ের লালসা থাকিত না; যাহারা অর্থ সঞ্চয় করিত, তাহারাও সামান্য গৃহে বাস করিয়া ও হীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অর্থ গোপন করিত, এবং মৃত্তিকার নীচে অর্থ পুতিয়া রাখিত। সম্রাটের কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণ সকলেই অহঙ্কারী ও অত্যাচারী;—প্রজা ধনী

হইলেও ক্ষমতাহীন ও ভীত। ফলতঃ ইউরোপের সহিত তুলনা করিলে ভারতবর্ষে বা অন্যান্য উষ্ণদেশে রাজা বা রাজপুরুষদিগের অত্যাচার চিরকালই অধিক, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বের্ণীয়ে যথার্থই বলেন, এই অত্যাচারে বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য শিল্পকর্ম্ম সমস্তেরই অবনতি ;—বণিক বা শিল্পকারী, কাহারও কার্য্যে সম্যক্ উৎসাহ নাই ; কোনও শিল্পকর্ম্মের উপর যদি বড় লোকের লোভ পড়ে, তাহা হইলে তাঁহারা যথেচ্ছা মূল্য দিয়া লইতে পারেন, কেহ আপত্তি করিতে পারে না।

কখন কখন সম্রাটের অতিশয় অর্থের প্রয়োজন হইলেও, তিনি কোন লোকের নিকট বহুসংখ্যক টাকা লইয়া কোনও প্রদেশের শাসনকর্তৃপদ বিক্রয় করিতেন। নূতন শাসনকর্ত্তা সেই অর্থ নিরীহ প্রজাদিগের নিকট দশ গুণ পরিমাণে আদায় করিয়া লইতেন। এক এক জন শাসনকর্ত্তা এক একটি রাজার ন্যায় ক্ষমতাপন্ন ; আপন প্রদেশে রাশি রাশি অর্থ সঞ্চয় করিতেন। কাজী ও বিচারপতিগণও উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বড় লোকের সহায়তা করিতেন।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এইটি ভারতবর্ষ ও জগতের সমস্ত উষ্ণদেশের চিরন্তন দুর্ভাগ্য ;—কিন্তু এ দুর্ভাগ্য, এ অত্যাচার সত্ত্বেও শান্ত নিরীহ ভারতবাসী নাগরিক ও কৃষকগণ যে, এককপ স্বচ্ছন্দে থাকিত, তাহার সন্দেহ নাই। বের্ণীয়ে স্বয়ং বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং তথাকার সমৃদ্ধি ও স্বচ্ছন্দতা ও সৌন্দর্য্যের সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলেন, বঙ্গদেশের অপর্য্যাপ্ত ধান্যে সেই দেশ ও অন্যান্য বহু দেশের ভরণ পোষণ হয়। বঙ্গদেশের চিনি কর্ণাট পর্য্যন্ত যায়,

এবং তথায় আম্র ও আনারস প্রভৃতি নানাপ্রকার ফলও উৎপন্ন হয়। বঙ্গদেশে টাকায় ২০টা মুরগী পাওয়া যায় ও হাঁসও সেইরূপ অল্পমূল্য; ছাগল, ভেড়াও অনেক পাওয়া যায় এবং মৎস্যেরও শেষ নাই। তুলা, রেশম, সোরা, গালা, আফিম ও নানারূপ মসলা ও ঔষধ এই স্থানে প্রচুর পাওয়া যায়।

বের্ণীয়ে আরও বলেন যে, রাজমহল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই ধারে তিনি অসংখ্য খাল দেখিয়াছিলেন; বাণিজ্যের নৌকাদি গমনাগমনের জন্য বহু পরিশ্রমে এই খাল কাটা হইয়াছিল। এই খালের উভয় পার্শ্বে বহুলোক সমাকীর্ণ নগর, পল্লীগ্রাম, ও ধান্য, ইক্ষু, সরিষা ও তিল প্রভৃতি শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল। নদীর দুই ধার সুন্দর সুন্দর বৃক্ষে পরিপূর্ণ, ও গঙ্গা দ্বীপপূর্ণ; কিন্তু সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী দ্বীপগুলি আরাকানের দস্যুদিগের উপদ্রবে নির্জ্জন হইয়াছিল এবং ব্যাঘ্রাদি জন্তুতে পূর্ণ ছিল। একবার বের্ণীয়ে ৯ দিনে পিপলী হইতে হুগলীতে আসিয়াছিলেন। এই ভ্রমণের শেষে বের্ণীয়ে লিখিয়াছিলেন "যে সুন্দর রমণীয় প্রদেশের ভিতর দিয়া যাইলাম, তাহার উপর চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া আমার বোধ হইল, যেন আমার নয়ন কখনই তৃপ্ত হইবে না। পরাধীনতায় বা স্বাধীনতায়, হিন্দুশাসনে বা মুসলমান-শাসনে বঙ্গদেশ চিরকালই সুন্দর, উর্ব্বর ও শান্ত।"

দক্ষিণ ভারতবর্ষ বা দক্ষিণাপথ। নবম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে যে, ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্য ধ্বংশ হইলে পর দক্ষিণাপথে কেবল তিনটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ছিল। যথা, আহমদনগর, বিজয়পুর ও গলকণ্ড। এবং

কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলীগার ও রাজগণও নামে এই মুসলমান সুলতানদিগের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

আকবরের সময় হইতে মোগলগণ দক্ষিণাপথ-বিজয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং শাহ জহানের রাজ্যকালে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে আহমেদনগর রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল।

আহমদনগরের স্বাধীনতা-বিলোপের সময় শাহজী নামক এক জন মহারাষ্ট্রীয় অতিশয় ক্ষমতা ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শিবজী মুসলমানের অধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া পুনর্বার দক্ষিণাপথে হিন্দু-স্বাধীনতা স্থাপন করেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, তিনি স্বাধীন রাজার পদ গ্রহণ করিলেন; সুতরাং হিন্দু বিজয়নগর রাজ্য-লোপের ঠিক এক শত বৎসরের পর দক্ষিণাপথে হিন্দু মহারাষ্ট্র রাজ্য পুনঃস্থাপিত হইল।

পরে আরংজীব ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়পুর রাজ্যের ধ্বংশসাধন করিলেন এবং পর বৎসর গলখন্দ রাজ্য ধ্বংস করিলেন; সুতরাং ইহার পর মহারাষ্ট্র ভিন্ন সমস্ত দক্ষিণাপথ মোগলদিগের কবকবলিত হইল।

কিন্তু দক্ষিণাপথ অধিক দিন মোগলদিগের হস্তে রহিল না। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে আসফজা হাইদ্রাবাদে একটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিলেন। সেটি এখনও বর্ত্তমান আছে ও তাহাকে নিজামের রাজ্য কহে।

দক্ষিণাপথের এই সমস্ত রাজ্যবিপ্লব নিম্নে এক স্থানে প্রদর্শিত হইল। যথা—

১৫৬৫ খৃষ্টাব্দের পর আহমদনগর, বিজয়পুর ও

	গলখন্দ এই তিনটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্য।
১৬৩৭ খৃঃ অব্দের পর	আহমদনগর মোগলদিগের অধীন; বিজয়পুর ও গলখন্দ দুইটি মাত্র স্বাধীন মুসলমান রাজ্য।
১৬৬৫ খৃঃ অব্দের পর	আহমদনগর মোগলদিগের অধীন; বিজয়পুর ও গলখন্দ দুইটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ও মহারাষ্ট্রদেশে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য।
১৬৮৭ খৃঃ অব্দের পর	আহমদনগর, বিজয়পুর ও গলখন্দ মোগলদিগের অধীন; মহারাষ্ট্র হিন্দু রাজ্য স্বাধীন।
১৭২৪ খৃঃ অব্দের পর	হাইদ্রাবাদের স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ও মহারাষ্ট্রে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য।

মুসলমান সুলতানদিগের অধীনে হিন্দুদিগের অবস্থা আমরা নবম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে নূতন মহারাষ্ট্র রাজ্যের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে।

শিবজী মহারাষ্ট্র রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা; তাঁহার রাজ্য-প্রণালী হইতে পরের সময়ের রাজ্যপ্রণালী অনেকটা অনুমিত হইতে পারে।

শিবজীর পদাতিক সেনার মধ্যে অধিকাংশই মাউলী অথবা হিতকরী জাতীর। তাহারা আপনারা অস্ত্র আনিত, কিন্তু সরকার হইতে গোলা ও বারুদ পাইত। তলবার, ঢাল এবং বন্দুক তাহাদিগের প্রধান অস্ত্র, এবং পর্ব্বতারোহণে ও দুর্গ-আক্রমণে তাহারা অতুল্য। দশ জন সৈন্যের উপর এক জন নায়েক, ৫০ জনের উপর এক জন হাবেলদার ও ১০০ জনের উপর এক জন করিয়া জুমলাদার থাকিত। এক সহস্র পদাতি-কের সেনানীকে একহাজারী ও পাঁচ সহস্র পদাতিকের সেনানীকে পাঁচহাজারী কহিত। পাঁচ হাজারীর উপর আর পদ ছিল না, কেবল সরনৌবৎ বা সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল।

এইরূপ অশ্বারোহীদিগের মধ্যে প্রত্যেক ২৫ জনের উপর এক জন হাবেলদার, ১২৫ জনের উপর এক জন জুমলা-দার এবং ৬২৫ জনের উপর এক জন সুবেদার ছিল। দশ জন সুবেদারের অর্থাৎ ৬,২৫০ জন অশ্বারোহীর অধ্যক্ষকে পাঁচ-হাজারী কহিত, এবং তাহাদিগের উপর সরনৌবৎ বা সেনা-পতি ছিল। অশ্বারোহীগণ তলবার ও ঢাল ব্যবহার করিত এবং কেবল এক অংশ মাত্র বন্দুক ব্যবহার করিত। বর্শাই তাহাদিগের বিশেষ ব্যবহার্য্য অস্ত্র ছিল। মহারাষ্ট্রীয় অশ্বা-রোহীর বর্শাচালনা প্রসিদ্ধ। মহারাষ্ট্রের অশ্বগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও শীঘ্রগামী; পার্ব্বতীয় প্রদেশে তাহারা অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারিত, এবং সম্মুখযুদ্ধে পারদর্শী না হইলেও, তাহারা শত্রুর চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া, খাদ্য ধ্বংস করিয়া ও স্থানে স্থানে সহসা আক্রমণ করিয়া, আবার পুনরায় পলাইয়া যাইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিতে পারিত। এইরূপ মহারাষ্ট্রীয় অশ্বা-

বোহীবাও সিন্ধুতীব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ও দিল্লী হইতে কর্ণাট পর্য্যন্ত আচ্ছাদন কবিযা চৌথ আদায় করিত ও শক্রর গ্রাম ও ক্ষেত্র দগ্ধ কবিত।

পদাতিকদিগেব মাসিক বেতন তিন চাবি টাকা হইতে দশ বাব টাকা পর্য্যন্ত ছিল। অশ্বাবোহীদিগেব মধ্যে দুইটি শ্রেণী ছিল; বর্গীগণ সবকাব হইতে অশ্ব পাইত এবং মাসিক ছয় সাত টাকা হইতে ১৫।২০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইত, সিল্লীদাবগণ আপনাদিগেব অশ্ব আনিত এবং মাসিক ১৮।২০৲ টাকা হইতে ৪০।৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইত। লুণ্ঠনপ্রাপ্ত সমস্ত দ্রব্যই সবকাবেব, কিন্তু লুণ্ঠনকাবীগণ উপযুক্ত পাবিতোষিক পাইত।

শাবদীয পূজাব কালে যুদ্ধ সময আবস্ত হয বলিযা শিবজী সেই পূজা অতি ধুমধামেব সহিত নির্ব্বাহ কবিতেন, এবং সেই সময়ে সমস্ত সৈন্যেব পবিদর্শন কবিতেন। তাহাব পব যে যুদ্ধ আবস্ত হইত, লুণ্ঠনই তাহাব প্রধান অঙ্গ; কিন্তু কৃষক, গোব্রুগবা স্ত্রীলোকদিগেব উপব হস্তক্ষেপ কবা নিষেধ ছিল।

সৈন্যবচনাসম্বন্ধে শিবজী যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, শাসন ও কব-আদায-সম্বন্ধেও সেইরূপ বন্দোবস্ত কবিযাছিলেন। জমীব ফসল স্থিব করা হইত, এবং সেই ফসলেব পাঁচ ভাগেব মধ্যে তিন ভাগ কৃষকেব, আব দুই ভাগ সবকাবেব। আপনাব কর্ম্মচাবী দ্বাবা শিবজী এই সমস্ত কর আদায় করিতেন; দুই তিনটী গ্রামে এক জন করিয়া কারকুন ও এক একটি ক্ষুদ্র জেলায় এক জন করিয়া ব্রাহ্মণ তরফদার বা তালুকদার নিযুক্ত হইত। কতকগুলি তালুকদারের উপব এক জন করিয়া সুবেদার থাকিত। দেশমুখ বা দেশপাণ্ডে-

(জমীদার)-দিগের অধিকৃত স্থানেও শিবজী প্রথমে নিজ কর্ম্মচারী দ্বারা প্রাপ্য করের সংখ্যা স্থির করিতেন, পরে সেই কর আদায় জন্য সেই দেশমুখকে বৎসর বৎসর আদেশ দিতেন।

কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যে যেরূপ টোডরমল্লের কর-আদায়-সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম বন্দোবস্ত অধিক দিন স্থায়ী হইল না, অবশেষে শাসনকর্ত্তাগণ নির্দ্ধারিত করে এক একটি প্রদেশ শাসন করিতেন; মহারাষ্ট্রদেশেও সেইরূপ শিবজীর সূক্ষ্ম কর আদায়ের ও সৈন্যগণকে বেতন দিবার প্রণালী অধিক দিন থাকিল না। অবশেষে কর্ম্মচারী ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ চিরস্থায়ী বেতনস্বরূপ এক একটি জায়গীর প্রাপ্ত হইতে লাগিল, অথবা এক একটি প্রদেশের চৌথ আদায় করিবার ক্ষমতা পাইল; ও এইরূপ প্রকাণ্ড মহারাষ্ট্র রাজ্যের ভিতর নানা স্থানে হলকার, সিন্ধিয়া প্রভৃতি এক একটি রাজ্য হইয়া উঠিল।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের ক্ষমতা ও যুদ্ধপ্রণালী পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছিল, সুতরাং এ স্থানে সে বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। সমস্ত মহারাষ্ট্রদেশ তাহাদিগের অধীনে ছিল; তদ্ভিন্ন প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে তাহারা "চৌথ" বা "সর্দ্দেশমুখী" আদায় করিত।

রাজস্থান। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ মোগলদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, কেবল রাজস্থানের রাজগণ নামে অধীনতা স্বীকার করিয়া স্বাধীনভাবে আপন আপন দেশে রাজত্ব করিতেন। মিবারের সংগ্রামসিংহ, সম্রাট বাবরের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কিছু কাল পরে প্রাণত্যাগ করেন। পরে আকবরের শাসনকালে যখন অন্যান্য প্রধান

বাজপুত রাজগণ দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করেন, তখন মিবারের প্রতাপসিংহ অধীনতা স্বীকার করিলেন না। সেই জন্য তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের সহিত অনেক দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে। শেষে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে অমরসিংহ জাহাঙ্গীরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু সে নাম মাত্র অধীনতা; অন্যান্য রাজপুতগণ আকবরের অধীনে যেরূপ নানা বিজয় ও শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, মিবারের রাণা তাহা কখন করেন নাই, তিনি কখনও আপন রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হয়েন নাই।

তথাপি এই সময় হইতে রাজপুতদিগের জাতীয় জীবন ক্ষীণ হইতে লাগিল। তাহার অন্য কোনও কারণ লক্ষিত হয় না, কেবল মোগলদিগের প্রাধান্য স্বীকার করাতে প্রথমে রাজপুত-দর্প, পরে রাজপুত-তেজ লীন হইতে লাগিল। যে রাজারা চিরস্বাধীনতার দর্প করিতেন, তাঁহারা এক্ষণে প্রবলতর শত্রুর উৎকৃষ্টতা, আপনাদিগের নিকৃষ্টতা ও অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। যাঁহারা মুসলানদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিতেন, তাঁহারা এক্ষণে দিল্লীশ্বরকে কন্যা দান করিতে পারিলে আপনাদিগকে ভাগ্যবান মনে করিতে লাগিলেন। যাঁহারা চিরকাল দিল্লীশ্বরদিগের সহিত সমান যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে দিল্লীশ্বরের দাস হইয়া বঙ্গদেশ হইতে কাবুল পর্যন্ত যুদ্ধ ও শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পরাধীনতা জাতীয় তেজ বিনাশ করে, আমরা অন্য হইতে নিকৃষ্ট, এই চিন্তায় প্রথমে জাতীয় দর্প, তৎপরে জাতীয় বল হরণ করে। রাজপুতগণেরও তাহাই ঘটিল। যাঁহারা পৃথুরায়ের সময় হইতে

ভাবতবর্ষের হিন্দু জাতিদিগের মধ্যে প্রবল ছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে দিন দিন নিস্তেজ হইতে লাগিলেন।

আরংজীবের অত্যাচাবে বাজপুতগণ দলবদ্ধ হইয়া আর একবাব সম্রাটের সহিত যুদ্ধে অগ্রসব হইল। মাড়বারেব বাঠোরগণ ত্রিংশৎ বৎসব যুদ্ধ কবিয়াছিল। কিন্তু অধীনতায় বাজপুতদিগেব জাতীয় জীবন নিস্তেজ হইতেছিল; যখন মহাবাষ্ট্রীয়গণ ক্ষমতাপন্ন হইয়া রাজস্থান আক্রমণ করিল, তখন সেই ক্ষীণতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। মোগলদিগেব সহিত যুদ্ধে সংগ্রামসিংহ ও প্রতাপসিংহ যে বীবত্ব ও স্থিবপ্রতিজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বাজস্থান হইতে বিলুপ্ত হইযাছিল, বাজপুতগণ বিনা যুদ্ধে "চৌথ" দিতে স্বীকাব কবিল। পরে যখন মহা রাষ্ট্রীযগণ বাব বাব বাজস্থান লুণ্ঠন কবিয়া দেশ ছাবখাব কবিতে লাগিল, তখন বাজপুতগণ ভীকব ন্যায় কেবল ক্রন্দন করিল মাত্র, অথবা অর্থ দান কবিয়া মহাবাষ্ট্রীয়দিগকে বিদায় কবিল। এই রূপে পবাধীনতায বাজপুতদিগেব জাতীয় জীবন অন্তর্হিত হইল;

মোগল-ক্ষমতা যখন ক্রমে বিলুপ্ত হইল, তখন ভারতবর্ষে চাবি দিকে নূতন নূতন বাজ্য, নূতন নূতন জাতি পবাক্রান্ত হইতে লাগিল। মহাবাষ্ট্রীযগণ প্রায সমগ্র ভাবতবর্ষ হইতে কর আদায় কবিতেছিল, বর্ণিত হইযাছে। আসফজা দক্ষিণে ও সাদৎ খাঁ অযোধ্যায দুইটি বাজ্য স্থাপন কবেন। পশ্চিমে শিখ, জাঠ, বোহিল্লা প্রভৃতি জাতি পবাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। অতি দক্ষিণে হায়দরআলী নামে এক জন মুসলমান মহীশূরে একটি অতি পবাক্রান্ত বাজ্য স্থাপন কবিতেছিলেন। বিদেশীয় জাতির মধ্যে কাবুল হইতে আহমদ্ শাহ দুরাণী

আসিয়া দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন ; ইউরোপ হইতে পর্ত্তু-গীজ, ওলন্দাজ ও দিনেমারগণ স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। আর কর্ণাটে ও বঙ্গদেশে ইংরাজ ও ফরাসীগণ পবস্পরেব সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। প্রকৃতিব নিষমানুসাবে এ সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী-বলের মধ্যে ইংবাজদিগেব প্রবলতম বল অচিরে ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন কবিল ; সে রূপ বল ভারতবর্ষে পূর্ব্বে কথনও লক্ষিত হয নাই ; সে বলে ভাবতবর্ষ অচিবে চমকিত ও বশীভূত হইল।

ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের সাহিত্য। আমরা হিন্দু বাজ্য-বর্ণনার শেষে হিন্দু-সাহিত্য ও সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি ; এই স্থানে ভাবতবর্ষেব মুসলমানদিগেব সাহিত্যেব বিষয়ে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। বিশেষ বিবরণের প্রযোজন নাই, কেন না ভাবতবর্ষে মুসলমান-সাহিত্য কখনই বিশেষ উৎকর্ষ লাভ কবে নাই। ফের্দ্দৌসী, সাদী ও হাফেজ পাবস্যদেশে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন ও সেই দেশেই কবিতা লিখিযাছিলেন। ভাবতবর্ষেব মুসলমানদিগেব মধ্যে সেরূপ মহাকবি এক জনও জন্মগ্রহণ কবে নাই।

মুসলমানদিগেব ধর্ম্মপুস্তক কোরাণ এবং আইন ও বিজ্ঞান-শাস্ত্র আববী-ভাষায় রচিত, এবং মুসলমানেবা সেই ভাষাকেই পবিত্র ভাষা বলিয়া মনে কবে। তথাপি সুন্দর সুন্দর কবিতা সমস্তই পাবস্য-ভাষায় রচিত। সাদী, ফের্দ্দৌসী ও হাফেজ সেই ভাষাতেই আপনাদিগের কাব্য রচনা কবিয়াছেন। ভারতবর্ষেও যে সমস্ত কাব্য ও ইতিহাস গ্রথিত হইয়াছে, তাহাও পারস্য ভাষায় ;—এইটি বিদ্বান্‌দিগের ও রাজসভার ভাষা

ছিল। তথাপি মুসলমানদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা পারস্থ বা আরব্য-ভাষায় হইত না, উর্দ্দু-ভাষাতেই হইত।

ভারতবর্ষের মুসলমান কবিদিগের মধ্যে আমীর খসরুই প্রধান। সম্রাট কৈকোবাদের সহিত তাঁহার পিতা বাকারা খাঁর সাক্ষাৎ এবং সম্রাট আল্লাউদ্দীনের পুত্রের সহিত হিন্দু-কুমারী দেবলাদেবীর প্রণয় সম্বন্ধে খসরু কবিতা লিখিয়াছেন।

কাব্যে যেরূপ, বিজ্ঞান, অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রেও সেইরূপ ভারতবর্ষের মুসলমানগণ কখনই হিন্দুদিগের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে ভাস্করাচার্য্যের সময়ে যে সমস্ত আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছিল, তাহা মুসলমানগণ অবগত ছিল না। আকবরের সময় ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী ও বীজ-গণিত এবং বেদ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ পারস্থ ভাষায় অনুবাদিত হয়।

কিন্তু এ সকল বিষয়ে হীন হইলেও মুসলমানগণ ইতিহাসে হিন্দুদিগের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। হিন্দুদিগের ইতিহাস একবারেই নাই, মুসলমানদিগের মধ্যে ফেরেস্তা, কাফী খাঁ প্রভৃতি ইতিহাসবেত্তার গ্রন্থ অদ্যাপি আদরণীয়। বাবর আপনার যে জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি মনোহর, আকবরের সময় প্রসিদ্ধ আবুল ফাজেল আইন আকবরী লিখিয়াছেন এবং তাঁহার ভ্রাতা ফৈজী অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

"হর্ম্ম্যনির্ম্মাণবিষয়েও মুসলমানগণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এলোরার ন্যায় আশ্চর্য্য ও প্রকাণ্ড কার্য্যে মুসলমানগণ কখনও হস্তক্ষেপ করে নাই, তথাপি তাহাদিগের মসজীদে

সমাধিমন্দিরে কল্পনাশক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, হিন্দু-অট্টালিকায় তাহা পাওয়া যায় না। তাজমহল, মতীমসজীদ, দেওয়ানখাস্ বা জুম্মামসজীদ অপেক্ষা অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এবং অধিকতর কষ্টসাধ্য প্রাসাদ ও মন্দির হিন্দুগণ প্রস্তুত করিয়াছে, কিন্তু সেই হিন্দুরচিত হর্ম্মো সেরূপ মানসিক ক্ষমতা বা কল্পনাশক্তির পরিচয় নাই।

সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে হিন্দুগণ অতুল্য ছিল, মোগলদিগের সময়ে বিদেশীয় ভ্রমণকারীগণ যে শিল্পকার্য্য ও কারুকার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, ভারতবর্ষজাত, মুসলমানগণ বিদেশ হইতে আনে নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ইংরাজ-শাসন।

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

ইউরোপীয় উপনিবেশ। পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরাজ ও ফরাসী এই পাঁচ ইউরোপীয় জাতি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য চালাইতেছিল।

(ক) ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বাবরের দিল্লী-বিজয়ের অনুমান ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কোডি-গামা আফ্রি-

কার দক্ষিণ দিয়া ভারতবর্ষে আগমনের পথ আবিষ্কার করিলেন। ক্রমশঃ সেই পথ দিয়া পর্ত্তুগীজগণ আসিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে লাগিল। এবং তাহাদিগের প্রধান উপনিবেশ গোয়া নগরী শীঘ্রই প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠিল। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির আগমনে পর্ত্তুগীজদিগের ক্ষমতা ও বাণিজ্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু গোয়া অদ্যাবধি তাহাদিগের অধিকারে আছে।

(খ) পর্ত্তুগীজদিগের অনুমান এক শত বৎসর পরে আকবরের রাজ্যকালে ওলন্দাজগণ এ দেশে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া, যব, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ অধিকার করে। ভারতবর্ষের মধ্যে চুঁচুড়াই ওলন্দাজদিগের প্রধান উপনিবেশ ছিল। সে নগর ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে লইয়াছে।

(গ) ওলন্দাজদিগের কিছু পরেই দিনেমারগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য আরম্ভ করে। ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীরামপুরেই তাহাদিগের প্রধান অধিকার ছিল। সেটি ইংরাজগণ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ক্রয় করিয়া লইয়াছে।

(ঘ) ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্য ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নামক এক বণিকসম্প্রদায়, রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকট হইতে সনন্দ-পত্র প্রাপ্ত হইল। পরবৎসর তাহাদিগের অর্ণবপোত সুমাত্রা দ্বীপে উপস্থিত হইয়া কুঠী স্থাপন করিল। ক্রমে ইংরাজেরা পিপ্‌লী, মসলীপত্তন, সুরাট, কালিকট্, হুগলী, কাশীমবাজার, পাটনা প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে কুঠী স্থাপন করিল।

নবম পরিচ্ছেদে আমরা লিখিয়াছি যে, ১৫৬৫ খৃঃঅব্দে

বিজয়নগরের রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, তথাকার রাজবংশ কর্ণাটের চন্দ্রগিরিতে নিবাস করিতেছিলেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা সেই বংশের রাজার অনুমতি পাইয়া একটি কুঠী নির্ম্মাণ করে ও তাহার নাম ফোর্ট সেণ্ট্ জর্জ রাখে। কালক্রমে সেই স্থানই মান্দ্রাজ নাম ধারণ করিয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রাজধানী হইয়াছে।

ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ পর্ত্তুগালের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া বোম্বাই নগর যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হওত ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে সেই নগর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন। কালক্রমে বোম্বাই নগর বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রাজধানী হইয়াছে।

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আরংজীবের পুত্র আজীমের নিকট হইতে কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর ক্রয় করে। কালক্রমে কলিকাতা, বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর ও পরে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজধানী হইয়াছে।

(৬) ইংরাজদিগের অনতিপরেই ১৬০৪ খৃঃ অব্দে ফরাসীগণ এ দেশে বাণিজ্য করিতে আইসে ও প্রথমে মরিশস্ ও বুরবন্ দ্বীপ অধিকার করে। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে সুরাটে, ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে পণ্ডিচেরীতে ও ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে চন্দননগরে তাহারা কুঠী স্থাপন করে; তদ্ভিন্ন মাহী, কারিকল প্রভৃতি কএক স্থানে তাহাদিগের অধিকার ছিল। কালক্রমে পণ্ডিচেরীই সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিল। এখনও এই স্থানে ফরাসীদিগের ভারতবর্ষের রাজধানী আছে। তদ্ভিন্ন চন্দননগরও এখন পর্য্যন্ত ফরাসীদিগের অধিকৃত।

কর্ণাট-বিজয়। ১৭৪৪-১৭৬৩ খৃঃ অব্দ। পূর্ব্বকালে

যে প্রদেশটিকে দ্রাবিড় বলিত, এক্ষণে সেইটিই কার্ণাটিক বা কর্ণাট বলিয়া খ্যাত। তথাকাব যুদ্ধই আমরা এক্ষণে বর্ণনা কবিব। পূর্ব্বকালে যে প্রদেশটিকে কর্ণাট বলিত, সেটি এখন মহীশূব বলিযা খ্যাত।

(ক) ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে ইউবোপে ফ্রবাসী ও ইংবাজ জাতিদিগেব মধ্যে যুদ্ধ আবম্ভ হইল, এবং ভাবতবর্ষেও ঐ দুই জাতি পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। মবিশস্ ও বুববনেব শাসনকর্ত্তা লাবর্ডনে মান্দ্রাজ অধিকাব কবিলেন, ও পণ্ডিচেবীব শাসনকর্ত্তা ডুপ্লে ইংবাজদিগেব প্রতি অন্যায আচবণ কবিলেন। ইহাব কিছু পবেই ইংবাজগণ মান্দ্রাজ উদ্ধাব কবিল। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে ইউবোপে ঐ দুই জাতিব মধ্যে সন্ধিস্থাপন হওযায় ভাবতবর্ষেও সন্ধি হইল।

(খ) কর্ণাটেব নবাবী লইযা চণ্ডসাহেবেব সহিত মহম্মদআলীব বিবাদ হইল, এবং আসফজাব মৃত্যুর পব হাইদ্রাবাদেব বাজ্য লইযা মজঃফবজঙ্গ ও নাজীবজঙ্গেব বিবাদ হইল। ফবাসীগণ চণ্ডসাহেব ও মজঃফবজঙ্গেব সহাযতা কবিতে লাগিল। ফবাসীদিগেব সহাযতায অচিবে মজঃফবজঙ্গ হাইদ্রাবাদেব সুবাদাব ও চণ্ডসাহেব কর্ণাটেব নবাব হইলেন। ফরাসীদিগেব এই বিক্রম ও যশোবিস্তাব দেখিযা ইংরাজেরা অপর পক্ষ অর্থাৎ মহম্মদআলী ও নাজীবজঙ্গের পক্ষ অবলম্বন কবিল। সুতবাং কর্ণাটে দ্বিতীয় বাব ইংবাজ ও ফবাসীদিগেব মধ্যে যুদ্ধ আবম্ভ হইল। মহম্মদআলী ত্রিচিনপল্লীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং চণ্ডসাহেব সেই নগব বেষ্টন করিয়াছিলেন। ইংবাজদিগেব মধ্যে ক্লাইব নামক এক জন

অসামান্য বীব ত্রিচিনপল্লীর উদ্ধারার্থ চণ্ডসাহেবের রাজধানী আর্কট্ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন। ক্লাইবের মনোরথ পূর্ণ হইল, চণ্ডসাহেব ত্রিচিনপল্লী ছাড়িয়া আপন রাজধানী উদ্ধারার্থ আসিলেন, কিন্তু ক্লাইব এরূপ সাহসের সহিত কতিপয় মাত্র সৈন্য লইয়া সেই নগর রক্ষা করিলেন যে, শত্রুরা উহা লইতে পারিল না, এবং ক্লাইবের যশ চারি দিকে বিস্তার হইল। এই সময়ে আরও ইংরাজ সৈন্য ত্রিচিনপল্লীতে উপস্থিত হওয়ায় তথায়ও অবরোধকারী সৈন্য পরাস্ত হইল। ফরাসীরা তখন বিজয়ের আশা ত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিল, এবং মহম্মদ আলীই কর্ণাটের নবাব হইলেন। কর্ণাটে যেরূপ ইংরাজ-ক্ষমতা প্রবল হইল, হাইদ্রাবাদে ফরাসীদিগের ক্ষমতা সেইরূপ প্রবল হইল, এবং মজঃফরজঙ্গের মৃত্যুর পর তাহারা সলাবৎজঙ্গকে সুবাদার করিল।

(গ) ইহার দুই বৎসর পর ইউরোপে পুনরায় ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সুতরাং ভারতবর্ষেও ঐ দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ফরাসীদিগের সেনাপতি লালী ইংরাজদিগকে উৎসন্ন করিবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং সেই জন্য হাইদ্রাবাদের নিজামের রাজ্য হইতে অধীনস্থ সেনানী বুসীকে ডাকাইয়া আনিলেন। এটি অতি অজ্ঞতার কার্য্য হইয়াছিল, কেন না বুসী হাইদ্রাবাদের অনেক যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া সেই রাজ্যে ফরাসীপ্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেটি একবারে বিলুপ্ত হইল। লালী ইংরাজদিগের ফোর্ট সেণ্ট্ ডেবিড্ দুর্গ অধিকার করিলেন, কিন্তু মান্দ্রাজ বেষ্টন করিয়াও লইতে পারিলেন না। পরে বুসী ও লালী ইংরাজদিগের নিকট

বন্দিবাসের যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন এবং বুসী বন্দী হইলেন। এক্ষণে একে একে ফরাসী অধিকারগুলি ইংরাজদিগের হস্তগত হইল, এবং অবশেষে কর্ণাটে ফরাসীদিগের শেষ অধিকার পণ্ডিচেরীও ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। তাহার পর ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে দুই জাতির মধ্যে সন্ধিস্থাপন হওয়ায় ফরাসীরা পণ্ডিচেরী ফিরিয়া পাইল কিন্তু কর্ণাটে তাহাদিগের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজেরাই কর্ণাটে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল।

বঙ্গবিজয়। ১৭৫৬-১৭৬৫ খৃঃ অব্দ। বঙ্গ দেশের সুবাদার আলীবর্দ্দী খাঁ ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে কালগ্রাসে পতিত হয়েন; তাঁহার অনুপযুক্ত দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা সুবাদার হইলেন।

(ক) রাজা রাজবল্লভ ঢাকার শাসনকর্ত্তা হইয়া অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এই সম্পত্তির উপর সুবাদারের লোভ হইল। সুতরাং রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সুবাদারের ভয়ে ইংরাজদিগের শরণাগত হইয়া কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুবাদার কৃষ্ণদাসকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ইংরাজদিগকে আদেশ করিলেন, ইংরাজগণ শরণাপন্ন ব্যক্তিকে ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন। অনেক ইংরাজ নৌকাযোগে পলাইয়া গেলে, অবশিষ্ট ১৪৬ জনকে বন্দী করিয়া সিরাজের কর্ম্মচারীগণ রাত্রিতে একটি সঙ্কীর্ণ ঘরে রাখিল; তথায় গ্রীষ্ম ও পিপাসায় ১২৩ জনের এক রাত্রিতে প্রাণ বিয়োগ হয়। এই শোচনীয় ঘটনাটিকে **অন্ধকূপ-হত্যা** বলে।

এই ঘটনার অচিরকাল পরেই মান্দ্রাজ হইতে ক্লাইব ও

ওয়াট্‌সন আসিয়া কলিকাতা পুনবায় অধিকার করিলেন। সিরাজ পুনবায় কলিকাতা আক্রমণেচ্ছু হইলেন, কিন্তু পথিমধ্যে ক্লাইব কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সময়ে সুবাদাব ফরাসীদিগের সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছেন বলিয়া, ক্লাইব ফরাসীনগর চন্দননগর অধিকাব করিলেন।

তৎপরে ক্লাইব সুবাদারকে পদচ্যুত করিবার জন্য গোপনে তাঁহার সেনাপতি মীরজাফর, মন্ত্রী রায়দুর্লভ ও কোষাধ্যক্ষ জগৎশেঠের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত কথা স্থির হইতেছে, এমন সময় সেই ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে উমীচাঁদ নামক এক জন ধূর্ত্ত ব্যক্তি সময় বুঝিয়া বলিলেন যে, কলিকাতা আক্রমণের সময় তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল, তাঁহাকে যদি অনেক টাকা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি এই ষড়যন্ত্র সুবাদারের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবেন। ক্লাইব যেরূপ সাহসী ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন, সেইরূপ ধূর্ত্তও ছিলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ একখানি মিথ্যা প্রতিজ্ঞা-পত্র প্রস্তুত করাইলেন, সেই খানিতে উমীচাঁদকে তাঁহার প্রার্থিত টাকা দিবার কথা সন্নিবেশিত করিলেন, এবং সেই খানি দেখাইয়া উমীচাঁদকে শান্ত করিলেন। সদাচারী ওয়াটসন এরূপ মিথ্যাপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলেন, তাহাতে ক্লাইব ওয়াট্‌সনের নাম জাল করিলেন।

সমস্ত স্থির হইলে ক্লাইব যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। পলাশীর ক্ষেত্রে দুই পক্ষ সম্মুখীন হইল, কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ হইল না। ক্ষণেক যুদ্ধ হওয়াতেই বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীর-

জাফব সুবাদারকে কুমন্ত্রণা দিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিবাব আদেশ দেওয়াইলেন ; এই আদেশ পাইযা সুবাদারের সৈন্য যুদ্ধে বিবত হইল, ক্লাইব অনায়াসে জযলাভ করিলেন। এই বিশ্বাসঘাতকতাব জন্য ক্লাইব মীবজাফবকে বঙ্গদেশেব সুবাদাব কবিলেন ও স্বয়ংও অনেক অর্থলাভ কবিলেন। সিবাজউদ্দৌলা ভগবান্‌গোলায ধবা পডিযা মীব্ জাফবেব পুত্র কর্তৃক নিহত হইলেন উমীচাঁদ যখন অর্থ চাহিলেন, তখন ক্লাইব তাঁহাকে প্রকৃত প্রতিজ্ঞা-পত্রখানি দেখাইলেন, তাহাতে উমীচাঁদেব অর্থ পাইবাব কোনও উল্লেখ ছিল না। উমীচাঁদ শোকে জ্ঞানশূন্য হইলেন। (১৭৫৭ খৃঃ অব্দ)।

(খ) মীব্‌জাফব্ নবাব হইলেন, কিন্তু তিনি সাক্ষীগোপাল মাত্র, ক্লাইবই সর্ব্বেসর্ব্বা। ক্লাইব ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে ফরাসীদিগকে উত্তব সবকাব প্রদেশ হইতে তাডাইলেন, এবং চুঁচুডাব ওলন্দাজদিগকে পবাস্ত কবিলেন, পবে ১৭৬০ খৃঃ অব্দে বিলাত গমন কবিলেন। এ দিকে মীব্ জাফব ইংবাজদিগকে যত টাকা দিতে স্বীকাব কবিযাছিলেন,তাহা না দিতে পাবায কলিকাতাব ইংবেজগণ তাঁহাকে পদচ্যুত কবিযা, সেই বৎসবেই (১৭৬০) তাঁহাব জামাতা মীব্ কাসীম্‌কে নবাব কবিলেন। ইংবাজ কর্ম্মচাবীগণ পুনবায বিলক্ষণ অর্থলাভ কবিলেন,এবং বর্দ্ধমান,মেদিনীপুব ও চট্টগ্রাম এই তিনটি জেলা ইংবাজদিগকে প্রদত্ত হইল।

(গ) মীব্ কাসীম্ অতিশয কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তিনি ইংরাজদিগেব দর্প ও প্রাধান্য সহ্য কবিতে না পারিয়া মুঙ্গেবে বাজধানী করিলেন। দিল্লীর শেষ সম্রাট দ্বিতীয আলমগীরেব পুত্র শাহ্ আলম্ বিহারে নানা স্থানে উপদ্রব করিতেছিলেন,। মীর্

কাসীম্ পাটনায় যাইয়া তাঁহাকে দিল্লীশ্বর বলিয়া মানিয়া বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা করস্বরূপ দিতে স্বীকৃত হইয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী পদের সনন্দ পত্র পাইলেন।

সে সময়ের ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ অতিশয় অর্থগৃধ্নু ও অসৎ ছিলেন। বাণিজ্য দ্রব্যের উপর সে সময়ে সকল বণিকই শুল্ক দান করিত, কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্রব্যে সম্রাটের সনন্দ অনুসারে কোনও শুল্ক লাগিত না। কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণও আপনারা গোপনে বাণিজ্য করিতেন এবং আপনাদিগের নৌকায় কোম্পানীর নিশান উড়াইয়া সেই শুল্কদান রহিত করিতেন। মীর্ কাসীম্ অন্যায় আচরণের বার বার প্রতীকার চাহিয়াও বিফলযত্ন হওয়ায় একবারে সমস্ত শুল্ক উঠাইয়া দিলেন ও বলিলেন কি দেশী কি বিদেশী. কাহাকেও শুল্ক দিতে হইবে না। এই উদার আচরণেও ইংরাজেরা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিল, এবং মীর কাসীমকে পদচ্যুত করিয়া বৃদ্ধ মীর জাফরকে নবাব করিল। মীর্ কাসীম্ পাটনার অধ্যক্ষ এলীস্ সাহেবকে তাঁহার সঙ্গীগণের সহিত বন্দী করিলেন, পরে গরীয়ার যুদ্ধে ইংরাজ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া পাটনায় যাইয়া এলীস্ ও অন্যান্য ইংরাজদিগকে ও কয়েক জন ধনী হিন্দুকে নৃশংসরূপে হত্যা করিলেন। প্রথমে মুঙ্গের পরে পাটনা ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। মীর্ কাসীম্ অযোধ্যার নবাব ও শাহ্ আলমের সহিত যোগ করিয়া যুদ্ধে পুনরায় পরাস্ত হইলেন ও পলায়ন করিলেন। পরে ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে বক্সারের নিকট আর একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতেও ইংরাজগণ জয় লাভ করিল। এইরূপে মীর কাসীমের আশা ভরসা বিলুপ্ত হইল।

(ঘ) বৃদ্ধ মীর্‌জাফর পুনরায় নবাব হইলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ক্লাইব লর্ড খেতাব পাইয়া বিলাত হইতে আসিলেন এবং ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের অনেক দোষ সংশোধন করিয়া দিলেন। অনন্তর এলাহাবাদে যাইয়া অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও শাহ আলমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সন্ধি হইল; সুজা অযোধ্যা ফিরিয়া পাইলেন, কেবল কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশ সম্রাট শাহ আলমকে দেওয়া হইল; এবং শাহ আলম্ বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর নির্দ্ধারণ করিয়া কোম্পানীকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করিলেন। এইরূপে কোম্পানী পূর্ব্ব বিজিত প্রদেশত্রয়ে এত দিনে আইন অনুসারে অধিকারী হইলেন (১৭৬৫), মুর্শীদাবাদের সাক্ষীগোপাল নবাবকে তাঁহারা বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা বৃত্তিস্বরূপ দিতে সম্মত হইলেন। পরবৎসর ক্লাইব সিপাহীদিগের একটি বিদ্রোহ দমন করিয়া ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

ক্লাইবের ন্যায় অসাধারণ ইংরাজ পুরুষ ভারতবর্ষে কদাচিৎ আসিয়াছেন। তিনি কেরাণী হইয়া এ দেশে আইসেন, পরে ইংরাজদিগের বিপদ দেখিয়া সহসা লেখনীর পরিবর্ত্তে অসি ধারণ করিয়া যেরূপ বীরত্ব দেখান, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তিনিই এ দেশে ইংরাজরাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা; দুঃখের বিষয় যে, রাশি রাশি অর্থ গ্রহণ করিয়া এবং দুই একটি প্রতারণার কার্য্য করিয়াই আপন যশঃ কলুষিত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি ও কর্ম্মচারীদিগের সহিত জঘন্য ষড়যন্ত্র না করিয়া, কেবল স্বকীয় বলেই নবাবকে পরাস্ত

করিলে অধিক সততা প্রকাশ হইত। সদাচারী ওয়াট্‌সন্‌ সাহেব সেইরূপ পরামর্শই দিয়াছিলেন।

এই সময়ে বঙ্গদেশে শাসনাভাব ও রাজ্যবিপ্লব বশতঃ লোকদিগের যেরূপ কষ্ট হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। দস্যু ও তস্করে দেশ উৎসন্ন করিতে লাগিল, গ্রাম ও ক্ষেত্র সকল জঙ্গলপূর্ণ হইতে লাগিল, এবং ১৭৭০ খৃঃ অব্দে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইল, তাহাতে বঙ্গ দেশের তৃতীয়াংশ লোকের প্রাণ বিয়োগ হইল।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ১৭৭৪-১৭৮৫। হেষ্টিংস বহু বৎসরাবধি কোম্পানীর কার্য্য করিয়া ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ দেশের শাসনকর্ত্তা হয়েন। তাহার পরবৎসর কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা নির্দ্ধারিত করিলেন যে, বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তাই সমস্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল্‌ হইবেন। এইরূপে গবর্ণর জেনেরল্‌ পদের সৃষ্টি হইল এবং হেষ্টিংস ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক ২॥০ লক্ষ টাকা বেতনে ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনেরল হইলেন।

(ক) হেষ্টিংসের সময়ে ১৭৭২ খৃঃ অব্দে দেশ-শাসন-কার্য্য মুসলমানদিগের হস্ত হইতে ইংরাজেরা গ্রহণ করিল এবং ধনাগার ও সমস্ত প্রধান আফীস্‌ মুর্শীদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনীত হইল। কর-সংগ্রহের জন্য প্রতি জেলায় কলেক্টর নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহারাই দেওয়ানী মকদ্দমা নিষ্পত্তির ভার লইলেন; তদ্ভিন্ন প্রতি জেলায় ফৌজদারী মকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য কাজী ও মুফ্‌তী নিযুক্ত হইলেন। কলিকাতায়ও সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নেজামৎ আদালত

নামে দুইটি বিচারস্থান স্থাপিত হইল। ইহার অচিরকাল পরেই কলিকাতার সুপ্রিম্‌কোর্ট স্থাপিত হইল। এ সমস্ত নিয়ম সত্ত্বেও বহুকালাবধি দেশে সুশাসন হইল না। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগের নিকট হইতে কলেক্টরগণ অতিশয় অধিক কর লইতে লাগিলেন, জমীদারগণ তাহা দিতে না পারায় বন্দীস্বরূপ কলিকাতায় প্রেরিত হইতেন। কলেক্টরগণ দেশীয় মকদ্দমা কিছু মাত্র বুঝিতেন না, অধীনস্থ আম্‌লাগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত তাহারা অন্যায় কার্য্য ও অন্যায় বিচার দ্বারা রাশি রাশি অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল। দেশে পূর্ব্ববৎ ডাকাইতি ও দস্যুতাও চলিতে লাগিল, অনেক সময়ে সর্দ্দার ডাকাইৎগণ আম্‌লাগণকে উৎকোচ দিয়া বিচারের পথ রুদ্ধ করিত। অবিচারে ও অতিশয় করগ্রহণে ও অশাসনে প্রজা একবারে উৎসন্নপ্রায় হইল। ফলতঃ ইংরাজ শাসনের প্রথম বিংশ বা ত্রিংশৎ বৎসর বঙ্গবাসীগণ যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিল, বোধ হয় সিরাজ্‌উদ্দৌলার সময়ে বা পূর্ব্বে কোন সময়ে সেরূপ কষ্ট পায় নাই।

(খ) অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিল্লাদিগের সহিত অন্যায় যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি রোহিল্লাদিগের ধ্বংসসাধন জন্য ইংরাজদিগের সহায়তা চাহিলেন। ইংরাজদিগের সহিত রোহিল্লাদিগের কোন বিবাদই ছিল না, কিন্তু হেষ্টিংস সুজার অর্থে বশীভূত হইয়া সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। রোহিল্লারা পরাজিত হইল, এবং ইংরাজবলে বলিষ্ঠ সুজা তাহাদিগের সমস্ত দেশ একবারে ছারখার করিলেন। এই সময়ে কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশও সম্রাট্ শাহ আলমের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া অযোধ্যার নবাবকে ৫০ লক্ষ টাকা পণে

দেওয়া হইল, এবং ইংরাজেরা সম্রাটকে যে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, হেষ্টিংস তাহাও রহিত করিলেন।

(গ) কলিকাতার কৌন্সিলের কয়েক জন মেম্বর হেষ্টিংসের শত্রু ছিলেন, এবং হেষ্টিংস বাঙ্গালার নবাব-সংসার হইতে উৎকোচ লইয়াছেন এইরূপ অপবাদ দিতেন। এ অপবাদ সত্যই হউক, বা মিথ্যাই হউক, হিন্দুরাজা নন্দকুমার এই বিষয় প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; তাহাতে হেষ্টিংস ভীত হইয়া নন্দকুমার একটি জাল করিয়াছেন বলিয়া, কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে তাঁহার নামে অভিযোগ আনাইলেন। এই অপরাধে নন্দকুমারের ফাঁসী হয়। এটি অবিচার হইয়াছিল, তাহা সকলেই স্বীকার করেন, কেন না জাল অপরাধ প্রমাণ হইলেও ভারতবর্ষের আইনানুসারে প্রাণদণ্ড হইতে পারে না; কেবল হেষ্টিংসের বিপদ মোচন করিবার জন্য তাঁহার বন্ধু জজ ইম্পে অবিচার করিলেন।

(ঘ) ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে বারাণসী প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া, ২২॥০ লক্ষ টাকা কর স্থির করিয়া চৈৎসিংহকে জমীদারীস্বরূপ দেয়। হেষ্টিংস তিন বৎসর পর্য্যন্ত সেই রাজার নিকট ৫ লক্ষ টাকা করিয়া অতিরিক্ত গ্রহণ করেন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে চৈৎসিংহ এই অতিরিক্ত কর দানে অসম্মত হওয়ায় হেষ্টিংস তাঁহাকে অবমানিত ও কারারুদ্ধ করেন, এবং তিনি পলায়ন করিলে তাঁহার পরিবারের আর এক জনকে জমীদার করিয়া ৪০ লক্ষ টাকা কর স্থাপন করেন।

(ঙ) অযোধ্যায় নবাব সুজার মৃত্যু হইলে তাঁহার মাতা

ও দুই পত্নী সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করেন। সুজার পুত্র আসফ্ উদ্দৌলা সেই টাকা না পাইলে ইংরাজদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন না বলিলেন, তাহাতে হেষ্টিংস সেই বেগমদিগের উপর অতিশয় অত্যাচার করিয়া এক কোটি বিংশতি লক্ষ টাকা আদায় করিলেন।

(চ) হেষ্টিংসের সময় মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ইংরাজদিগের প্রথম যুদ্ধ হয়। তৃতীয় পেশবা বলজীর কথা আমরা একাদশ পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, তাঁহার মৃত্যুর পর ১৭৬১ খৃঃ অব্দে তাঁহার পুত্র মধুরাও পেশবা হয়েন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও অল্প কাল পেশবা হইয়াই নিহত হইলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে একটি গৃহবিচ্ছেদ হইল। নারায়ণের পিতৃব্য রাঘবজী পেশবা পদ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু নানা ফর্ণাবীজ প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান প্রধান লোক মৃত নারায়ণের নবজাত শিশুকে পেশবার সিংহাসনে আরোহণ করাইলেন। ইংরাজেরা এই সময়ে আপনারা কিছু লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া রাঘবের সহায়তা করিল, এবং বোম্বাইর নিকটে সাল্‌সেট্ নামক স্থান আপনাদিগের হস্তগত করিল। কিছু কাল যুদ্ধের পর ইংরাজেরা রাঘবকে ত্যাগ করিয়া নানা ফর্ণাবীজের নিকট সালসেট্ ও বেসীন্ প্রাপ্ত হইয়া "পুরন্দরের সন্ধি" স্থাপন করিল। ইহারই কিছু পরে এই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া ইংরাজেরা পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিল, কিন্তু ইংরাজ সৈন্য একটি পার্ব্বতীয় প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া নিরুপায় হইয়া "ওয়ার্গাওঁর সন্ধি" স্থাপন করিল ও তদ্দারা সমস্ত

বিজিত স্থান দিতে স্বীকার করিল। এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার অনতিপরেই সন্ধি-লঙ্ঘন করা হইল এবং পুনরায় যুদ্ধা-রম্ভ হইল। গডার্ড কলিকাতা হইতে ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া সুরাটে আসিলেন এবং সিন্ধিয়া ও হুলকারকে পরাজিত করিয়া বেসীন্ অধিকার করিলেন ও পপ্‌হাম্ প্রথমে লাহোর, পরে গোবালীয়র অধিকার করিলেন। ইহার পর "সালবাইয়ের" সন্ধি হইল। পুরন্দরের সন্ধিই বজায় রহিল; রাঘবজী পেশবা হইতে পারিলেন না, কেবল মাসে ১৫,০০০ টাকা করিয়া বেতন পাইবেন স্থির হইল। নানা ফর্ণাবীজেরই জয় হইল (১৭৮২)।

(ছ) হেষ্টিংসের সময়, ইংরাজেরা যে সমস্ত যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে মহীশূরের যুদ্ধই প্রধান। আমরা নবম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে বিজয়নগরের রাজ্যের ধ্বংসের পর ভারতবর্ষের অতি দক্ষিণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজা ও পলী-গারগণ নামে বিজয়পুর ও গলখন্দের মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন, মহীশূরের রাজারা ঐরূপ প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন ছিলেন, ও ১৭৫০ খৃঃ অব্দে ঐ হিন্দু রাজ্যের মন্ত্রী নন্দ-রাজ সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করেন। তাঁহার অধীনে হাইদর নামক একজন সামান্য সৈন্য ছিলেন, তিনি আপনবুদ্ধিবলে ১৭৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে সমস্ত ক্ষমতা আপনি গ্রহণ করিয়া মহীশূরের সুলতান হইলেন; এবং হিন্দুরাজ্যের লোপসাধন করিলেন।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে, হাইদ্রাবাদের নিজাম্ ও মহারাষ্ট্রীয়গণ হাই-দারের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করে; এবং ইংরাজগণ বিনা কারণে হাইদ্রাবাদের বিরুদ্ধে যোগ দেয়। হাইদার আলী অর্থ দান করিয়া নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সন্তুষ্ট করিলেন, সুতরাং কেবল

ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দুই বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ যুদ্ধ চলিতে লাগিল, শেষে হাইদর সন্ধি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু ইংবাজগণ তাহা স্বীকার করিল না। তাহাতে হাইদর আলী ক্রুদ্ধ হইয়া বহুসংখ্যক অশ্বাবোহী লইয়া সহসা মান্দ্রাজের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; মান্দ্রাজের ইংবাজগণ তাহাতে এত ভীত হইল যে, তৎক্ষণাৎ সন্ধি স্থাপন করিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহাব যে অধিকাব ছিল, তাহাই রহিল। এইরূপে প্রথম মহীশূব যুদ্ধ সমাপ্ত হইল।

হেষ্টিংসেব সময় দ্বিতীয় মহীশূব যুদ্ধ হয়। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে ৮০,০০০ সৈন্য লইয়া হাইদব কর্ণাট আক্রমণ কবিলেন, এবং একে একে ইংবাজদিগেব অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত কবিলেন, ও কর্ণেল বেলিব অধীনেব ইংবাজ সৈন্যকে পবাস্ত কবিয়া বেলীকে বন্দী কবিলেন। ইংবাজেবা গবর্ণব জেনেবল হেষ্টিংসেব নিকট আবও অধিক সৈন্য প্রার্থনা করিল, ও সেই সৈন্য আসিয়া পৌছিলে ১৭৮১ খৃঃ অব্দে হাইদব ক্রমান্বয়ে তিনটি যুদ্ধে পবাস্ত হইলেন। খৃঃ ১৭৮২ অব্দেব শেষে হাইদবেব মৃত্যু হয, কিন্তু তাঁহার পুত্র টিপু সুলতান ইংবাজদিগেব সহিত যুদ্ধ কবিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে সন্ধিস্থাপন হইল, তদ্দাবা উভয় পক্ষেরই যুদ্ধেব পূর্ব্বে যে যে অধিকাব ছিল, তাহাই রহিল।

ইহারই পরবৎসর হেষ্টিংস স্বদেশে গমন কবিলেন। তথায় পার্লিয়ামেণ্টের প্রধান প্রধান বক্তা বর্ক, ফক্স, সেরিডান, পিট্ সকলে, হেষ্টিংসের ভারতবাসীদিগেব প্রতি অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার নামে পার্লিয়ামেণ্টে অভিযোগ উপস্থিত করেন।

হেষ্টিংস স্বয়ং যখন সেই বক্তাদিগের বক্তৃতা শুনিলেন, তখন তাঁহার মনে প্রকৃত অনুতাপ উদয় হইল, এবং তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, তাঁহার ন্যায় অন্যায়াচারী জগতে আর নাই। বিশেষ রোহিল্লাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অযোধ্যার বেগমদিগের প্রতি অত্যাচার ও বারাণসীর চৈৎ সিংহের প্রতি অন্যায়াচরণ, এই তিনটির জন্য তাঁহার প্রতি লোকে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়। সাত বৎসর পর্য্যন্ত এই অভিযোগ চলিতে লাগিল। ইহার মধ্যে লোকের মন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল; শেষে হেষ্টিংস নির্দ্দোষী বলিয়া অব্যাহতি পাইলেন। প্রকৃত পক্ষে হেষ্টিংস্ নির্গুণ লোক ছিলেন না; সুশাসনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধি, অধ্যবসায়, তীক্ষ্ণ-প্রতিভা প্রভৃতি অনেক সদ্গুণ-সমন্বিত ছিলেন। তাঁহার প্রধান দোষ এই ছিল যে আপন স্থির উদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি অত্যাচার বা নিষ্ঠুর আচরণ হইতে বিরত হইতেন না; স্বদেশীয়দিগের ক্ষমতা-বিস্তারের জন্য অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

লর্ড কর্ণওয়ালিস, ১৭৮৬-১৭৯৩। হেষ্টিংসের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসিলেন।

(ক) ইংরাজদিগের মিত্র ত্রিবাঙ্কোরের হিন্দু রাজাকে টিপু-আক্রমণ করায় তৃতীয় মহীশূর-যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং কর্ণওয়ালিস্ সেই যুদ্ধ করিবার জন্য স্বয়ং মান্দ্রাজে গমন করিলেন। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে তিনি বাঙ্গালোর নগর হস্তগত করিলেন এবং টিপুকে একটি যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। পরবৎসর তিনি টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিলেন; তখন টিপু ভীত হইয়া অর্দ্ধেক

রাজ্য ও অনেক অর্থ দিয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন (১৭৯২)। এই যুদ্ধে হাইদ্রাবাদের নিজাম্ ও মহারাষ্ট্রীয়গণ ইংরাজদিগের সহযোদ্ধা ছিল, সুতরাং তাহারাও বিজিত প্রদেশের অংশ পাইল।

(খ) ক্লাইবের সময় হইতে বঙ্গবাসীদিগের যে ভয়ানক অবস্থা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। রাজকর্ম্ম-চারীগণ জমীদারী নিলামে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিলেন; নূতন ক্রেতাগণের প্রজার উপর মায়া, দয়া নাই, তাহারা প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করিতে লাগিল এবং প্রজার উপর অন্যায় আচরণ করিতে লাগিল। তথাপি তাহারা রাজকর দিতে অসমর্থ হইল, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের অনেক ক্ষতি হইতে লাগিল। এই সকল অনিষ্ট সংশোধনার্থ কর্ণওবালিস দশ বৎসরের জন্য একটি বন্দোবস্ত করিলেন (দশ-শালা বন্দোবস্ত), এবং কোম্পানীর অধ্যক্ষেরা সেইটি মঞ্জুর করিলে সেইটিই চিরস্থায়ী হইল। সেই বন্দোবস্ত অনুসারে গবর্ণমেণ্ট জমীদারগণকে জমীর মালিকত্ব প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া স্বীকার করিলেন যে, সে রাজস্বের ভবিষ্যতে কখনও বৃদ্ধি হইবে না। রাজস্বের পরিমাণ অতিশয় অধিক হওয়ায় অনেক দিন পর্য্যন্ত দেশের লোক অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে লাগিল; কিন্তু পরিণামে যে সুফল ফলিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ভারতবর্ষে রাজস্ব বৃদ্ধি করিতেছেন, কিন্তু বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে ভূমির কর বৃদ্ধি করিবার উপায় নাই; সুতরাং দেশের বহুপর অর্থ অনেকটা দেশেই রহিয়া যাইতেছে, তাহাতে দেশের

লোক অপেক্ষাকৃত সুখী হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি দোষ এই যে, জমীদারদিগের যেরূপ সুবিধা হইল, কৃষকদিগের তত দূর সুবিধা হইল না; জমীদারগণ কৃষকদিগের নিকট হইতে ইচ্ছামত কর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ রহিলেন। এ দোষটিও ক্রমে ক্রমে সংশোধন হইতেছে ও জমীদারদিগের কর-বৃদ্ধি-ক্ষমতা ১৮৫৯ খৃঃ অব্দের ১০ আইন অনুসারে অনেক হ্রাস পাইয়াছে, বোধ হয় আরও পাইবে।

(গ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভিন্ন কর্ণওয়ালিস্ বঙ্গদেশের আরও অনেকগুলি উপকার করিয়া গিয়াছেন। হেষ্টিংস্ প্রতি জেলায় এক জন করিয়া কলেক্টর নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের উপর দেওয়ানী মকদ্দমা-নিষ্পত্তির ভার এবং কাজী ও মুফ্তীদিগের উপর ফৌজদারী মকদ্দমা-নিষ্পত্তির ক্ষমতা দিয়াছিলেন। তাহাতে সুচারুরূপে কার্য্য না চলায় কর্ণওয়ালিস্ প্রতি জেলায় এক জন করিয়া জজ্ নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা সমস্ত দেওয়ানীকার্য্য করিতে লাগিলেন, এবং মাজিষ্ট্রেটের অনেক ক্ষমতাও পাইলেন। তদ্ভিন্ন কলিকাতা, মুর্শীদাবাদ, পাটনা ও ঢাকায় চারিটি প্রবিন্সিয়াল কোর্ট স্থাপন করিলেন। তাঁহারা জেলার জজ্‌দিগের আপীল শুনিতেন এবং স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া জজ্‌দিগের সোপর্দ্দ করা ফৌজ্‌দারী সেসন্ মকদ্দমাও নিষ্পত্তি করিতেন। হেষ্টিংস বিচারকার্য্যের সুবিধার জন্য কতকগুলি স্থূল স্থূল আইন করিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস্ সেই গুলি সংগ্রহ ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রচার করিলেন।

দেশীয় লোকে এ সময়ে অনেকে বড় বড় চাকুরী করিতেন, এবং অনেকে অন্যায় কার্য্য ও উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। তাঁহা

দিগের উচিত শিক্ষা ও বেতন বৃদ্ধি করিয়া না দিয়া তাঁহাদিগকে কার্য্য হইতে একবারে বহিষ্কৃত করা হইল। সমস্ত শাসনকার্য্য ইংরাজদিগের হস্তে ন্যস্ত হইল। ইংরাজ কর্ম্মচারীগণও এই সময়ে অসৎ ছিলেন, এবং গোপনে বাণিজ্য ও অন্য উপায় দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিতেন। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অন্য মীমাংসা হইল, তাঁহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

প্রতি জেলায় অতি অল্প বেতনে কএক জন করিয়া মুন্সেফ্ এই সময়ে নিযুক্ত হয়েন।

সার্ জন শোর, ১৭৯৩-১৭৯৮। ইঁহার শাসনকালে কোনও বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হয় নাই।

মার্কুইস ওয়েলেসলী, ১৭৯৮-১৮০৫। মার্কুইস্ ওয়েলেসলীর সময় মহীশূরের চতুর্থ যুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ এই দুইটী ঘটনা হয়। গবর্ণর জেনেরল্ ওয়েলেসলীর সময় তাঁহার ভ্রাতা কর্ণেল্ ওয়েলেস্লী ইংরাজদিগের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ডিউক্ অব ওয়েলিংটন্ নাম প্রাপ্ত হয়েন, ও ওয়াটর্লুর যুদ্ধে ফরাসীরাজ নেপোলীয়ন্‌কে পরাস্ত করিয়া অতিশয় যশোলাভ করেন।

(ক) টিপু ফরাসীদিগের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া মার্কুইস্ ওয়েলেস্লী তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভ করেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই দিক হইতে দুই দল ইংরাজসৈন্য যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে আসিল এবং সেই নগর হস্তগত করিল। সেই যুদ্ধে টিপু হত হইলেন। ওয়েলেস্লী কতক

প্রদেশ কোম্পানীর জন্য গ্রহণ করিলেন, এবং অবশিষ্ট প্রদেশে পুরাতন হিন্দুরাজবংশীয় এক বালককে অধিষ্ঠিত করিলেন (১৭৯৯)।

(খ) ইংরাজেরা বহু পূর্ব্বেই কর্ণাট জয় করিয়াছিল; এক্ষণে কর্ণাটের নবাব রীতিমত পেন্‌সন্ পাইয়া সেই প্রদেশটী ইংরাজদিগকে দান করিলেন (১৮০১)।

(গ) হেষ্টিংসের সময়ে প্রথম মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ হয়, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে সিন্ধিয়া ও হলকারের ক্ষমতা এত বাড়িয়াছিল যে, পেশবার ক্ষমতা একবারে বিলুপ্তপ্রায় হইল। সেই ক্ষমতা পুনঃস্থাপনের জন্য এক্ষণকার পেশবা দ্বিতীয় বাজারাও ইংরাজদিগের সহিত একটি সন্ধি করিলেন (১৮০২)। ইংরাজেরাও অতিশয় ক্ষমতাপন্ন মহারাষ্ট্রীয়দিগের ক্ষমতা চূর্ণ করিবার একটি সূত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইল।

দৌলৎ রাও সিন্ধিয়ার রাজ্য এই সময়ে আগ্রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং তাঁহার ৬০,০০০ সৈন্য ছিল; তাহার মধ্যে অনেকেই ফরাসীদিগের দ্বারা সুশিক্ষিত। তাঁহার মিত্র বেরারাধিপতি রঘুজীরও ৩০ ০০০ সৈন্য ছিল। ইংরাজসৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত হইল; দক্ষিণ হইতে ওয়েলেস্‌লী (গবর্ণর জেনেরলের ভ্রাতা) ও উত্তর হইতে লেক আসিতে লাগিলেন। ওয়েলেস্‌লী আহম্মদনগর অধিকার করিলেন ও কএক দিন পরে সিন্ধিয়া ও রঘুজীর সমবেত সৈন্যকে আসাইয়ের তুমুল সংগ্রামে পরাস্ত করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে র্গাঁমে আর এক যুদ্ধে ওয়েলেস্‌লী পুনরায় জয়ী হইলেন; তৎপরে রঘুজী ভীত,

হইয়া কটকপ্রদেশ ও বরদা নদীর পশ্চিমে সমস্ত প্রদেশ ইংরাজদিগকে দিয়া সন্ধি করিলেন (১৮০৩)।

• উত্তরে লেক আলীগড় ও দিল্লী অধিকার করিলেন এবং দিল্লীতে সম্রাট শাহ আলমকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। তৎপরে লাসবারীর যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পুনর্বার পরাস্ত করিলেন। সিন্ধিয়া চারি দিকে পরাজিত হইয়া এবং মিত্র রঘুজী সন্ধিস্থাপন করিয়াছেন দেখিয়া, আপনিও সন্ধিস্থাপন করিলেন। তদ্দ্বারা দক্ষিণে ব্রোচ ও আহমদ্নগর এবং উত্তরে দোয়াব, দিল্লী, আগ্রা, গোয়ালীয়র প্রভৃতি অনেক স্থান ইংরাজদিগকে দান করিলেন (১৮০৩)।

যশোবন্ত রাও হলকার এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার ও তাঁহার মিত্র ভরতপুরের রাজার সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমে ইংরাজদিগের পরাজয় হইল। কর্ণেল মন্‌সন্ ভীত হইয়া পলায়ন করিয়া আগ্রায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং হল্‌কার তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। হল্‌কার দিল্লী আক্রমণ করিয়া লইতে পারিলেন না, পরে লেকের নিকট দীঘ ও ফরক্কাবাদের যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, আপন মিত্র ভরতপুরের রাজার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে দুর্গ অতিশয় দৃঢ় বলিয়া ইংরাজেরা বেষ্টন করিয়াও উহা লইতে পারিল না। ভরতপুরের রাজার সহিত ইংরাজদিগের সন্ধিস্থাপন হইল; তদনুসারে হল্‌কার ভরতপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইতিমধ্যে সিন্ধিয়া পুনর্বার ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন। হল্‌কারের ভরতপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তিনি হল্‌কারকে আপন শিবিরে আহ্বান করিলেন। এইরূপে ইংরাজ-

দিগের সহিত যুদ্ধবশতঃ পুরাতন শত্রু সিন্ধিয়া ও হল্‌কারের বন্ধু হইলেন; লেক তাঁহাদিগকে আপাততঃ আক্রমণ করিবার কোন সুবিধা পাইলেন না।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ও সার্ জর্জ্জ বার্লো, ১৮০৫-১৮০৭। ওয়েলেস্‌লীর সময়ে ইংরাজ-রাজ্য পূর্ব্ব হইতে দ্বিগুণ হইয়াছিল, তাহাতে কোম্পানীর অধ্যক্ষেরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা সমরপ্রিয় ছিলেন না, এবং ওয়েলেস্‌লী অনাবশ্যক যুদ্ধ দ্বারা রাজ্যবৃদ্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। সুতরাং লর্ড কর্ণওয়ালিস্ পুনরায় গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসিলেন। তিনি সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধস্থানে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে তাঁহার কাল হইল। সার্ জর্জ্জ বার্লো গবর্ণর জেনেরল হইয়াই সন্ধিস্থাপন করিলেন (১৮০৫)। তদ্দ্বারা সিন্ধিয়া গোয়ালীয়র দুর্গ ফিরিয়া পাইলেন এবং চম্বল নদ ইংরাজ ও সিন্ধিয়ার রাজ্যের মধ্যসীমা হইল। হল্‌কারের সহিতও সন্ধি হওয়ায় তিনি পূর্ব্বের অধিকার প্রায় সমস্তই ফিরিয়া পাইলেন।

লর্ড মিণ্টো, ১৮০৭-১৮১৩। এই সময়ে ইউরোপে ইংরাজদিগের সহিত ফরাসীদিগের ঘোর যুদ্ধ হয়, এবং ফরাসীরা ভারতবর্ষে কিছু না করিতে পারে, সেই অভিপ্রায়ে মিণ্টো পারস্যের রাজা, কাবুলের আমীর ও সিন্ধুর সর্দ্দারদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন যে, তাঁহারা ইংরাজ ভিন্ন অন্য কোনও ইউরোপীয় জাতির সহিত সম্পর্ক রাখিবেন না। এই সময়ে শিখ-অধিপতি রণজিৎ সিংহের সহিত ইংরাজদিগের একটি সন্ধি হয়। তদ্দ্বারা রণজিৎ শতদ্রু নদীর পশ্চিম-তীরের

রাজ্য করিবেন, পূর্ব্ব-তীরে হস্তক্ষেপ করিবেন না, স্বীকার করিলেন। রণজিৎসিংহ অসাধারণ লোক ছিলেন; ১৭৮০ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়, এবং তাঁহার অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময় পূর্ব্ববর্ণিত আহমদ্ শাহ দুরাণীর পৌত্র তাঁহাকে লাহোরের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। শিখেরা পূর্ব্বেও সাহসী যোদ্ধা ছিল, এক্ষণে রণজিতের দ্বারা নীত ও শিক্ষিত হইয়া অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন জাতি হইয়া উঠিল।

মার্কুইস্ হেষ্টিংস্, ১৮১৩-১৮২৩। এক্ষণে যিনি গবর্ণর জেনেরল হইলেন, তাঁহার নাম আর্ল্ ময়রা ছিল; নেপাল-যুদ্ধের পর তিনি মার্কুইস্ হেষ্টিংস্ পদ প্রাপ্ত হয়েন।

(ক) নেপালের গুর্খাগণ অতিশয় পরাক্রান্ত হওয়ায় গবর্ণর জেনেরল তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। নেপালে চারি দল সৈন্য পাঠান হইল, তন্মধ্যে উড্ ও মার্লো কিছুই করিতে না পারিয়া আপন আপন সৈন্য লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, এবং জিলেপ্সী কলুঙ্গের দুর্গ লইতে যাইয়া হত হইলেন। কেবল অক্টর্লনী অনেক চেষ্টার পর প্রথমে কুমায়ুনপ্রদেশ, পরে যমুনা ও শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ জয় করিলেন। তাহাতে নেপালীগণ একবার সন্ধির কথা উত্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় অন্য মত হওয়ায় পরবৎসর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং সুদক্ষ সেনাপতি অক্টর্লনী রাজধানী কাটামুণ্ডের নিকট পর্য্যন্ত যাইলেন। তখন নেপালীগণ ভীত হইয়া সন্ধিস্থাপন করিল; ইংরাজগণ যে সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়াছেন, তাহা রাখিলেন। সেই সমস্ত প্রদেশে এক্ষণে সিমলা, নাইনিতাল প্রভৃতি পার্ব্বতীয় সুন্দর সুন্দর নগর নির্ম্মাণ হইয়াছে।

(খ) পিণ্ডারী নামে এক জাতীয় দস্যু মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া নানা দেশ লুণ্ঠন করিত, এবং এক্ষণে আপনারাই নানা স্থানে ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। হেষ্টিংস এই দস্যু জাতিকে ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণ ইংরাজদিগের বলবৃদ্ধি দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, ইংরাজদিগের সহিত পিণ্ডারীদিগের যুদ্ধ দেখিয়া তাহারাও অস্ত্রধারণ করিল। সুতরাং ইংরাজদিগকে একবারে পিণ্ডারী ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইল।

সিন্ধিয়ার দেশে সৈন্য লইয়া না যাইলে পিণ্ডারীদিগের উচিত দমন হয় না; সেই জন্য সিন্ধিয়ার সহিত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল; সিন্ধিয়া প্রথমে ইংরাজদিগকে আসিতে দিতে অসম্মত ছিলেন, কিন্তু শেষে ইংরাজদিগের যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া ভীত হইয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন এবং ইংরাজ সৈন্যকে স্বদেশে আসিতে দিতে স্বীকার করিলেন।

পিণ্ডারীদিগের প্রধান এক জন আমীরখাঁ অনুপায় হইয়া ইংরাজদিগের অধীনতা স্বীকার করিলেন, তাঁহার দস্যু-ব্যবসায় দূর হইল, তাঁহারই বংশীয়েরা অদ্যাপি টঙ্কের নবাব আছেন।

পেশবা বাজীরাও অস্ত্রধারণ করিয়া ইংরাজদিগের রেসিডেন্সী লুণ্ঠন করিলেন, কিন্তু অচিরে যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। পেশবার সমস্ত রাজ্য এক্ষণে ইংরাজেরা অধিকার করিল; কেবল শিবজীর বংশজ রাজাকে সেতারার নিকট একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ দান করিল। পেশবা অতঃপর আট লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া কানপুরের নিকট বিঠুরে নিবাস করিতে লাগিলেন।

বেরারের রাজা আপ্পা সাহেব নাগপুরের ইংরাজদিগকে

আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া পঞ্জাবে পলাইলেন। তিনি তথায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। ইংরাজেরা পূর্ব্ববর্ণিত (মার্কুইস্ ওয়েলেস্লীর শাসন, (গ) দেখ) রঘুজীর পৌত্রকে নাগপুরের রাজা করিল।

হল্‌কারের রাজ্যে পিণ্ডারীগণকে আশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়া সেই রাজার সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হইল। মাহীদ্‌পুরের মহাযুদ্ধে হল্‌কারের সৈন্য পরাস্ত হইল। তাহার পর যুবক মল্‌হার্ রাও হল্‌কারের সহিত সন্ধি হইল। তদনুসারে ইংরাজেরা হল্‌কারের রাজ্যে এক দল সৈন্য রাখিতে ও তাহার ব্যয়ের জন্য খন্দেশপ্রদেশ অধিকার করিতে অনুমতি পাইল।

এইরূপে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ একে একে পরাস্ত হইলে, পিণ্ডারীগণ একবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। ইংরাজ সৈন্য তাহাদিগের প্রদেশ চারি দিকে বেষ্টন করিয়াছে, পলাইবারও উপায় নাই। অগত্যা ক্রমে ক্রমে এক এক দল পিণ্ডারী ইংরাজদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে লাগিল এবং লুণ্ঠনব্যবসায় ত্যাগ করিয়া এক একটি নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান গ্রহণ করিয়া কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। করীম্ খাঁ ও চীটু খাঁ পিণ্ডারীদিগের মধ্যে প্রধান ছিল; করীম্ খাঁ অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিল; চীটু খাঁ ইংরাজের অধীনতা স্বীকার না করিয়া আসীরঘরের জঙ্গলের ভিতর আশ্রয় লইয়া ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হইল।

এইরূপে ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্র-ক্ষমতা চূর্ণ হইল, এবং পিণ্ডারীগণ অনেক কষ্টে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইল ও দস্যু-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে লাগিল।

লর্ড আমহর্ষ্ট, ১৮২৩-১৮২৮। মার্কুইস্ হেষ্টিংসের

বিলাত-যাত্রার কএক মাস পরে নূতন গবর্ণর জেনেরল আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

(ক) ব্রহ্মদেশের রাজা পূর্ব্বেই আরাকান, আসাম প্রভৃতি কএকটি স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, এক্ষণে বঙ্গদেশের উপর পুনরায় আক্রমণ করায় প্রথম ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধ হইল। ইংরাজ-সৈন্য সমুদ্রপথে ১৮২৪ খৃঃ অব্দে রেঙ্গুনে উপনীত হইয়া সেই নগর হস্তগত করিল; কিন্তু বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় ও খাদ্যাভাবে নানা কষ্ট পাইল। তথাপি যুদ্ধ চলিতে লাগিল এবং অনেকগুলি যুদ্ধে ইংরাজদিগের জয় হইল ও অনেক নগর তাহাদিগের হস্তগত হইল। শেষে ইংরাজেরা রাজধানী অমরাপুরের নিকট যাইলে ব্রহ্মরাজ সন্ধি করিলেন। তদ্দারা আসাম, কাছাড়, জয়ন্তী, আরাকান তেনাসরীম্ প্রভৃতি প্রদেশ ইংরাজ-হস্তগত হইল।

(খ) ভরতপুরের রাজার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার শিশুকে রাজ্য না দিয়া শিশুর পিতৃব্য দুর্জ্জনশাল সিংহাসনে উঠিলেন। এই জন্য ইংরাজগণ সেই দুরাক্রম্য দুর্গ জয় করিয়া শিশুকেই দান করিল।

লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিক্, ১৮২৮-১৮৩৫।

বেণ্টিংকের শাসনকালে একটিও বড় যুদ্ধ হয় নাই, দেশ শান্তি ভোগ করিয়াছিল এবং গবর্ণর জেনেরলের অসাধারণ সদ্গুণে প্রজাগণ অনেক সামাজিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

(ক) কুর্গের রাজা প্রজাপীড়ক হওয়ায় ও মান্দ্রাজের গবর্ণরকে একখানি কর্কশ পত্র লিখায় তিনি পদচ্যুত হইলেন। তাঁহার রাজ্য ইংরাজের অধিকৃত হইল। মহীশূরের শাসনসম্বন্ধীয়

বড় বিশৃঙ্খলা হওয়ায় ইংরাজ কর্ম্মচারীর হস্তে সেই দেশের শাসনকার্য্য সমর্পিত হইল।

(খ) দেশীয় লোক উচ্চ কার্য্যের অযোগ্য, এই বিশ্বাসে এত দিন দেশীয় লোককে বড় কর্ম্ম দেওয়া হয় নাই। মহানুভব বেণ্টিংক মানবচরিত্র বিশেষ করিয়া জানিতেন, তিনি জানিতেন, যাহাকে ঘৃণা ও অবিশ্বাস করা যায়, সেই ক্রমে অবিশ্বাসী হইয়া উঠে, যাহাকে বিশ্বাস করা যায়, সে ক্রমে বিশ্বাসের যোগ্য হয়। তিনি স্থির করিলেন, দেশীয় লোকদিগকে সমাদর করিয়া অধিক বেতনে উচ্চ কর্ম্ম দিলে অবশ্যই তাহারা সে কর্ম্ম ভাল করিয়া করিবে। পূর্ব্বে দেশীয় লোক কেবল মুন্সেফ বা সদর আমীন হইতে পারিত; মহানুভব বেণ্টিংক্ ডেপুটী কলেক্টর ও সদর-আলা (আধুনিক সবর্ডিনেট জজ্), এই দুই পদের সৃষ্টি করিয়া দেশীয় লোকদিগকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সেই দুই পদের দেশীয় কর্ম্মচারীগণ আজি ৪০ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত যেরূপ সততা ও যত্ন সহকারে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, সেরূপ বেতনগ্রাহী কোনও সম্প্রদায় এ দেশে তদপেক্ষা উত্তম কার্য্য করেন নাই। ইহা ভিন্ন বেণ্টিংকের সময় আরও কএকটি শাসনসম্বন্ধীয় সংস্কার হয়। প্রবিন্সিয়াল কোর্ট গুলি উঠিয়া গেল, এবং কএকটি বিভাগ সৃষ্টি হইয়া, প্রতি বিভাগে এক জন করিয়া কমিশনর নিযুক্ত হইলেন। ফৌজদারী মকদ্দমা বিচারের ক্ষমতা জজদিগের হস্ত হইতে উঠাইয়া কলেক্টরদিগের হস্তে অর্পিত হইল, এবং কলিকাতার ন্যায় এলাহাবাদে একটি রেবিনিউ বোর্ড ও সদর আদালত স্থাপিত হইল। পূর্ব্বে বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই, এই তিনটি প্রেসিডেন্সী ছিল,

এক্ষণে উত্তরপশ্চিমে আর একটি প্রেসিডেন্সী হইল। ভারত-বর্ষের মধ্যে বিনা স্বত্বে যাহারা নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেছিল তাহাদিগের ভূমি বাজেআপ্ত হইল।

(গ) কিন্তু শাসনসম্বন্ধীয় সংস্কার অপেক্ষা সামাজিক সংস্কার দ্বারা বেণ্টিংক অধিক কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। সতীর চিতারোহণস্বরূপ কুৎসিত রীতি তিনি উঠাইয়া দিলেন, উড়িষ্যার খন্দ বর্ব্বরদিগের ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য নরহত্যা-রীতি উঠাইয়া দিলেন; রাজস্থানে কন্যাহত্যা-রীতি উঠাইবার চেষ্টা করিলেন, এবং মধ্যভারতবর্ষে "ঠগী" নামক দস্যুতা একেবারে দমন করিলেন। দেশীয় লোকের বিদ্যা-শিক্ষার জন্য যে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এত দিন সংস্কৃত ও পারস্য-ভাষার চর্চ্চায় ব্যয় হইত. সেই টাকা এক্ষণে মেকলে, ট্রিবিলীয়ন প্রভৃতি মহোদয়দিগের পরামর্শানুসারে ইংরাজি শিক্ষায় ব্যয় হইতে আরম্ভ হইল। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইল, স্থানে স্থানে ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং দেশে ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ হইল।

এই সময়ে রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। লর্ড ক্যানিং ভিন্ন বেণ্টিংকের ন্যায় মহানুভব, সদাশয়, সদ্‌গুণশালী ও প্রজাহিতৈষী গবর্ণর জেনেরল কখনও এ দেশে আইসেন নাই। বেণ্টিংকের বিলাতগমনের পর লর্ড অকলণ্ড আসিবার পূর্ব্বে সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ প্রায় এক বৎসর গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৩৫ অব্দে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন। দেশীয় লোক এই কার্য্য স্মরণার্থ কলিকাতায় সাধারণের পাঠ ও উপকারার্থে একটি বড়

পুস্তকালয় স্থাপন করিলেন ও তাহার নাম "মেট্‌কাফ্‌ হল" রাখিলেন।

লর্ড অক্‌লণ্ড, ১৮৩৬-১৮৪২। এই গবর্ণর জেনেরলের শাসনকালে কাবুলের যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় নাই।

(ক) পূর্ব্ববর্ণিত আহমদ্ শাহ দুরাণীর বংশীয় শাহ সুজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অন্য বংশজ দোস্ত মহম্মদ্ কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দোস্ত মহম্মদ্ ইংরাজদিগের নিকট হইতে একখানি কর্কশ পত্র পাইয়া, বিরক্ত হইয়া পরে ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা করিতে অসম্মত হওয়ায়, গবর্ণর জেনেরল কাবুলে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ-সৈন্য প্রথমে কান্দাহার, পরে গজ্‌নী ও পরে কাবুল অধিকার করিল এবং শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইল। দোস্ত মহম্মদ্ ইংরাজদিগের শরণাগত হইয়া বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া ভারতবর্ষে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইল; কিন্তু ইংরাজেরা একবার কাবুলে আধিপত্য পাইয়া তাহা ছাড়িতে ইচ্ছুক না হইয়া সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিল ও কাবুলবাসীদিগের প্রতি উদ্ধত ব্যবহার করিতে লাগিল। কাবুলীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তখন ইংরাজেরা বিপদে পড়িয়া শাহ সুজাকে ভারতবর্ষে লইয়া গিয়া দোস্ত মহম্মদকে পুনরায় রাজত্ব দিতে ও আপনারা কাবুল ত্যাগ করিয়া আসিতে স্বীকার করিল। এই সন্ধি অনুসারে ৪,৫০০ সৈনিক ও ১১,০০০ অন্য লোক ভারতবর্ষে যাত্রা করিল, কিন্তু পর্ব্বত-পথে কাবুলীদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সকলেই হত হইল; কতক

গুলি স্ত্রীলোক ও বালক বন্দী হইল ; ব্রাইডন নামক এক জন মাত্র ইংরাজ ও ২০ জন সিপাহী ভগ্নদূতস্বরূপ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জেলালাবাদে সংবাদ দিল। ভারতবর্ষে আগমন অবধি ইংরাজদিগের এরূপ দুর্গতি কখনও হয় নাই (১৮৪১)।

লর্ড এলেন্‌বরা, ১৮৪২-১৮৪৪। নূতন গবর্ণর জেনেরল আসিয়া কাবুলের অবমাননার প্রতিশোধ-চেষ্টাতেই প্রথমে রত হইলেন।

(ক) ইংরাজ-সৈন্য কাবুলে প্রবেশ করিল এবং জেলালাবাদ ও কান্দাহারে যে অবশিষ্ট ইংরাজ-সৈন্য ছিল, তাহার উদ্ধারসাধন করিল। পরে গজনী উৎসন্ন করিয়া কাবুলের বাজার পুড়াইয়া দিল, এবং কাবুল অধীনে রাখা বা কাবুলে আর বাস করা ভাল নয় বিবেচনা করিয়া, পুনরায় ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কাবুল পূর্ব্ববৎ স্বাধীন হইল, দোস্ত মহম্মদ্ স্বাধীনতা লাভ করিয়া পূর্ব্ববৎ রাজা হইলেন। ইংরাজদিগের এত অর্থ ও মনুষ্য নাশে কোনও ফল হইল না।

(খ) কাবুলযুদ্ধের সময় সিন্ধু প্রদেশের আমীরেরা বন্ধুর ন্যায় আচরণ করেন নাই বিবেচনা করিয়া, গবর্ণর জেনেরল তথায় নেপিয়রকে সৈন্যসমেত পাঠাইলেন। অচিরে যুদ্ধারম্ভ হইল ; মিয়ানী ও হাইদ্রাবাদের যুদ্ধে আমীরগণ পরাস্ত হইলেন, সিন্ধু-প্রদেশ কোম্পানীর অধিকৃত হইল। সিন্ধু বিজেতা সার্ চার্লস নেপিয়র বলিয়াছেন যে, ঐ প্রদেশবিজয়-কার্য্যটি বড় অন্যায় ও গর্হিত কার্য্য বটে, কিন্তু ইংরাজদিগের স্বার্থের জন্য উহা আবশ্যক।

(গ) সিন্ধিয়ার রাজ্যে গৃহকলহ হওয়ায় ইংরাজেরা এক

পক্ষ অবলম্বন করিয়া অপর পক্ষকে মহারাজপুর ও পানী-য়াবের যুদ্ধে পরাস্ত করিল। গবর্ণর জেনেরল এই সুযোগ পাইয়া সিন্ধিয়ার রাজ্যের পূর্ব্বস্বাধীনতা লোপ করিয়া করপ্রদ রাজ্যের মধ্যে নিবিষ্ট করিলেন।

(ঘ) এই সময়ে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট পদের সৃষ্টি হয়, এবং ইহাঁর শাসনকালে ভারতবর্ষে দাসত্বপ্রথা আইন দ্বারা উঠাইয়া দেওয়া হয়।

লর্ড হার্ডিঞ্জ, ১৮৪৪-১৮৪৭। প্রথম শিখযুদ্ধই এই সময়ের প্রধান ঘটনা। ১৮৩৫খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ রণজিৎ-সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র ক্রমান্বয়ে রাজা হয়েন; কিন্তু অত্যল্প কালের পর প্রথমের মৃত্যু হয়, দ্বিতীয় হত হন। তখন রণজিতের তৃতীয় পুত্র পঞ্চম বৎসরের শিশু দিলীপ সিংহ রাজা হইলেন। তাঁহার মাতা চন্দ্রাবতীর প্রিয়পাত্র লালসিংহ মন্ত্রী ও তেজসিংহ সেনাপতি হইলেন।

(ক) রণজিৎ সৈন্যগণকে অপূর্ব্ব ইউরোপীয় শিক্ষা দিয়া-ছিলেন; সেই সকল সৈন্য এক্ষণে আপনার দুর্দ্ধর্ষবলে মত্ত হইয়া শতদ্রু পার হইয়া ইংরাজ অধিকার আক্রমণ করিল। সেনাপতি তেজসিংহ ও লালসিংহ আপন পরাক্রান্ত সৈন্যকে ভয় করি-তেন, সুতরাং গোপনে ইংরাজদিগের বিজয় ও আপন সৈন্যের ধ্বংস চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাহা না হইলে সুশিক্ষিত শিখ-দিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধে কি হইত, বলা যায় না। মুদ্‌কী ও ফেরোজসহরে দুইটি ভীষণ যুদ্ধ হইল; দুইটিতেই ইংরাজ-সেনাপতি গফ্ কর্ত্তৃক শিখেরা পরাস্ত হইল। কিন্তু তাহাদিগের আশ্চর্য্য সাহস ও যুদ্ধপ্রণালী দেখিয়া ইংরাজেরা

চমকিত হইল (১৫ই ও ২১এ ডিসেম্বর, ১৮৪৫)। ইহার পর এক মাসের মধ্যে নূতন শিখ-সৈন্য শতদ্রু পার হইয়া আসিল, গোলাবসিংহ তাহাদিগের সেনাপতি ছিলেন। লুধীয়ানা রক্ষার জন্য স্মিথের অধীনে এক দল ইংরাজ-সৈন্য প্রেরিত হইল। লুধীয়ানা রক্ষা হইল, কিন্তু শিখদিগের সহিত বদ্দীওয়লে যে একটি সামান্য যুদ্ধ হইল, তাহাতে সেই ইংরাজ-সৈন্য পরাস্ত হইয়া বহু দ্রব্যাদি ত্যাগ করিয়া কষ্টে পলায়ন করিয়া আসিল।

তৎপরে আলীওয়লের যুদ্ধে (২৮এজানুয়ারি, ১৮৪৬) গোলাবসিংহ ও শিখগণ স্মিথ্‌কর্ত্তৃক পরাস্ত হইল। গোলাবসিংহ তৎক্ষণাৎ আপন সৈন্য ত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি ও মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তথাপি শিখ-সৈন্য আর একবার ইংরাজ দিগের সহিত যুদ্ধ করে; কিন্তু সুব্রাওনের যুদ্ধেও (১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৬) শিখগণ গফ্‌ ও স্মিথের নিকট পরাস্ত হইল। তাহাদিগের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি তেজসিংহ স্বজাতীয় সৈন্যের একবারে ধ্বংসসাধন করিবার জন্য একটি সেতু ভাঙ্গিয়া রাখিয়া আপনি পূর্ব্বেই পলায়ন করেন।

এক্ষণে সন্ধিস্থাপন হইল। শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান ইংরাজদিগের হইল, শিশু দিলীপ পঞ্জাবের রাজা হইলেন, এবং যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য শিখদিগের নিকট হইতে কাশ্মীর কাড়িয়া লওয়া হইল। গোলাবসিংহ ইংরাজদিগকে ঐ যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ এক ক্রোড় টাকা দেওয়ায়, তাঁহাকেই ঐ রাজ্য দেওয়া হইল। কেহ কেহ বলেন, গোলাবসিংহ যুদ্ধসময়ে গোপনে ইংরাজদিগের মিত্র ছিলেন, তাঁহার স্বদেশীয়দিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মূল্যস্বরূপ ইংরাজেরা তাঁহাকে

এই অনুগ্রহ করিল। তাঁহারা আরও বলেন যে, এই যুদ্ধে জয়লাভার্থ ইংরাজেরা অন্য কএক জন শিখসেনানীকে অর্থে বশীভূত করিযাছিল।

লর্ড ডেলহাউসী, ১৮৪৮-১৮৫৬। শিখদিগের বলবিক্রম এখনও ভগ্ন হয় নাই, সুতরাং অচিরে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

(ক) মুলতানে দুই জন ইংরাজকে শিখগণ হত্যা করে। অচিরে তথায় ও সমস্ত পঞ্জাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরাজগণ অচিরে মুলতান লইল; এদিকে বিপাশা নদীর তীরে ইংরাজসেনাপতি গফের সহিত শিখ-সেনাপতি শের সিংহের চিলিয়ানবালার প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হইল (১২ই জানুয়ারি, ১৮৪৯)। ইংরাজগণ ভারতবর্ষে এরূপ সাহসী সুশিক্ষিত শত্রু কখনও দেখে নাই, সমরক্ষেত্রে এরূপ ভয়ানক যুদ্ধ কখনও করে নাই; সমস্ত দিবসের যুদ্ধের পরেও কোনও পক্ষ জয়লাভ করিতে পারিল না। ইহার অচিরপরেই গুজরাট নগরের যুদ্ধ (ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯) গফ্ সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন, এবং শিখ ক্ষমতা ও রাজ্য ধ্বংস হইল। পঞ্জাব ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। দিলীপ সিংহ বাৎসরিক ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিলাতে বাস করিতেছেন।

(খ) রেঙ্গুনের শাসনকর্ত্তা কএক জন ইংরাজের উপর উপদ্রব করায় দ্বিতীয় ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধ হয়। তাহাতে ইংরাজেরা জয়ী হইল, ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী পেগুপ্রদেশ কোম্পানীর অধীনে আনীত হইল (১৮৫৩)।

(গ) বেরারের রাজার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার মহিষীরা পোষ্য-

পুত্র গ্রহণ করিতে চাহিলেন। গবর্ণর জেনেরল তাহাতে সম্মত না হইয়া ঐ দেশ (নাগপুর) কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করিলেন।

(ঘ) অযোধ্যায় বিলাসপটু শাহ ওয়াজিদ আলীর অধীনে শাসনকার্য্যের বিশৃঙ্খলা হওয়ায় ডেলহাউসী সেই রাজ্য কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করিলেন।

(ঙ) পঞ্জাব, পেগু, নাগপুর ও অযোধ্যা ভিন্ন ডেলহাউসী সিকিম্ ও উড়িষ্যার অঙ্গুল রাজ্য ও হাইদ্রাবাদের নিকট বাইকড়, দোয়াব প্রভৃতি কএক প্রদেশ হস্তগত করিলেন।

(চ) এই শাসনকালে ভারতবর্ষে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ স্থাপন হয়, ডাকের টিকিটের সৃষ্টি হয় ও শিক্ষা প্রণালীর উন্নতি সাধন হয়। এই শাসনকালে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ হয়, এবং কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপিত হয়।

লর্ড ক্যানিং, ১৮৫৬-১৮৬২ খৃঃ অব্দ। সিপাহীদিগের মহৎ বিদ্রোহ ও কুজন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোপসাধনই এই শাসনের প্রধান ঘটনা।

(ক) গরু ও শূকরের চর্ব্বি দিয়া টোটা প্রস্তুত হয়; তাহাই দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া বন্দুকে ভরিতে হইবে, হিন্দু ও মুসলমান সেনাদিগের জাতিধ্বংসের জন্য ইংরাজেরা এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, এইরূপ একটি জনশ্রুতিতে সমস্ত সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাজ্যপিপাসু ডেলহাউসী অযোধ্যা ও নাগপুর যেরূপে অধিকার করিয়াছিলেন, তজ্জন্যও ভারতবর্ষে হুলুস্থূল পড়িয়াছিল, তাহাই বোধ হয়, বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ।

বিদ্রোহীগণ মিরাট হস্তগত করিয়া লুণ্ঠন ও দগ্ধ করিল এবং সকল ইংরাজকে হত্যা করিল। পরদিন দিল্লী হস্তগত করিয়া

তথায়ও অত্যাচার করিল। নানা সাহেব কানপুর হস্তগত করিয়া তথাকার আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত ইংরাজকে অতি নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিলেন। বিদ্রোহীদিগের জয় এ সময় হইতে ক্ষান্ত হইল (১৮৫৬)।

হাবেলক্ ও আউট্রাম লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করিলেন, উইল্সন্ দিল্লী অধিকার করিলেন, ও গোয়ালিয়রে পরবৎসর বিদ্রোহ হওয়ায় রোজ তাহাও দমন করিলেন (১৮৫৭)। সিপাহীরা অতিশয় অত্যাচার করিয়াছিল; ইংরাজেরা বিজয় লাভ করিয়াও অত্যাচারের ত্রুটি করিল না। অনেক নির্দ্দোষী গ্রামবাসীর ঘর দগ্ধ হইল, বিদ্রোহী বলিয়া ৩,০০০ লোককে ফাঁসী দেওয়া হইল। এই সময়ে জিঘাংসাপূর্ণ ইংরাজদিগকে দমন করিয়া ও নির্দ্দোষীদিগের প্রতি অত্যাচার না হয়, এরূপ চেষ্টা করিয়া, লর্ড ক্যানিং চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। লর্ড বেণ্টিংক ভিন্ন তাঁহার ন্যায় মহানুভব, উদারচেতা গবর্ণর জেনেরল ভারতবর্ষে আইসেন নাই।

(খ) সিপাহী-বিদ্রোহে বিলাতে ইংরাজগণ বিরক্ত হইল, এবং অচিরে কোম্পানী উঠাইয়া দিল, মহারাজ্ঞী স্বয়ং ভারতের অধীশ্বরী হইলেন (১৮৫৭)।

এই শাসনকালে বঙ্গদেশে কবি মধুসূদন দত্ত প্রসিদ্ধ মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করেন, হিন্দু-স্বাধীনতা লোপ হওয়া অবধি ভারতবর্ষে এরূপ উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হয় নাই। ইংরাজশাসনে বঙ্গদেশে চিন্তাস্রোত নূতন প্রবাহিত হইয়াছে ও রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বঙ্গভাষা দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করিতেছে।

ইংরাজী শিক্ষায় সমস্ত ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল কতক কতক লাভ করিয়া উপকৃত হইতেছে।

লর্ড এলগীন্, ১৮৬২-১৮৬৩। এই শাসনকালে সদর দেওয়ানী ও সুপ্রীম্ কোর্ট একত্র হইয়া হাইকোর্ট নাম ধারণ করিল। লর্ড এল্গীন্ পীড়িত হইয়া ভারতবর্ষেই প্রাণত্যাগ করেন।

সার্ জন্ লরেন্স, ১৮৬৪-১৮৬৮। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় লরেন্স পঞ্জাবে অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত শান্তি রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অধীনস্থ শিখ-সৈন্য বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই। তাহারই পুরস্কারস্বরূপ সার্ জন্ লরেন্স গবর্ণর জেনেরল হইলেন। তাঁহার শাসনকালে ভুটানের সহিত একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংরাজেরা জয়লাভ করে ও ভোটদিগের কতকটা প্রদেশ ইংরাজরাজ্যের অন্তর্গত হয়।

লর্ড মেয়ো, ১৮৬৯-১৮৭২। এই শাসনকালে কাবুলের দোস্ত মহম্মদের পুত্র সের আলীকে রাজা বলিয়া গবর্ণর জেনেরল স্বীকার করেন, এবং তাঁহার বন্ধুত্ব ক্রয় করিবার জন্য বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা সাহায্য দিতে অঙ্গীকার করেন। আন্দামান দ্বীপ দর্শনার্থ গিয়া লর্ড মেয়ো পোর্ট ব্লেয়ারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত এক জন মুসলমানকর্ত্তৃক সহসা আক্রান্ত হইয়া হত হয়েন।

লর্ড নর্থব্রুক, ১৮৭২-১৮৭৬। ইঁহার শাসনকালে বঙ্গদেশে একটি দুর্ভিক্ষ হয়; কিন্তু রাজপুরুষদিগের যত্নে অধিক লোকের প্রাণ বিনাশ হয় নাই। দুর্ভিক্ষে লোকবিনাশ-নিবারণার্থ রাজপুরুষদিগের এই প্রথম সফল চেষ্টা।

বরদার গুইকুমারের গর্হিত আচরণ হেতু সকলে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। শেষে তিনি ইংরাজ রেসিডেণ্টকে বিষ প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করেন, এই অভিযোগ হওয়ায় গবর্ণর জেনেরল তাঁহার বিচার করিবার আদেশ করেন। তিন জন ইংরাজ বিচারক ও তিন জন দেশীয় রাজা এই বিচার করেন; প্রথম তিন জন তাঁহাকে দোষী ও শেষ তিন জন তাঁহাকে নির্দ্দোষী বিবেচনা করেন। গবর্ণর জেনেরল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া অন্য এক জনকে রাজা করেন, সেই অবধি সার্ মাধব রাও নামক বিজ্ঞ মন্ত্রীর চেষ্টায় সেই দেশ সুশাসিত হয়।

লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে ইংলণ্ডের মহারাজ্ঞীর প্রথম সন্তান যুবরাজ এল্‌বার্ট এড্‌ওয়ার্ড প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ ভারতবর্ষে আসিয়া সমস্ত দেশ সন্দর্শন করেন, এবং প্রজাদিগের অসীম রাজভক্তিতে তিনি ও তাঁহার মাতা অতিশয় সন্তোষ লাভ করেন।

লর্ড লিটন্। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারিতে ইংলণ্ডের মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরী (Empress of India) উপাধি ধারণ করিলেন। এই সংবাদ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচারিত হইল, এবং দিল্লীর প্রধান দরবারে বড় ধূমধামের সহিত সকলকে জ্ঞাত করা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ বৎসর ভারতবর্ষের পক্ষে সুখকর হইল না; মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ঘটে, তাহাতে অনুমান পঞ্চাশ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ হয়। বঙ্গদেশের ১৭৭০ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষের পর, বোধ হয়, ভারতবর্ষে এরূপ মহাবিপদ কখনও আইসে নাই; অনেক গ্রাম প্রায় জনশূন্য হইয়া গিয়াছে; অনেক জেলায় তৃতীয়াংশ বা তদধিক লোক নাই।

ইহারই পর দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করা হইল, এবং দেশীয় লোকের প্রায় সকল প্রকার অস্ত্র বিনা লাইসেন্সে রাখা নিষেধ করা হইল। মহারাজ্ঞীর নূতন উপাধি-গ্রহণের পরেই দেশের এইরূপ দুরবস্থা ও এইরূপ অনুদার শাসনপ্রণালী দেখিয়া ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের অনেক বিজ্ঞ লোক দুঃখিত হইলেন।

হিন্দু ও মুসলমানদিগের শাসনকালে ভারতবাসীদিগের অবস্থা, রীতি, নীতি, সমাজিক সভ্যতা ও রাজাদিগের শাসন-প্রণালী বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। ইংরাজের অধীনে প্রজাদিগের অবস্থার সেরূপ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই, কেন না এক্ষণে আমাদিগের কিরূপ অবস্থা, শাসন-প্রণালীর কি কি দোষগুণ, ভারতবাসীদিগের জাতীয় জীবন, জাতীয় উদ্যম ও জাতীয় চিন্তা ইংরাজ-শাসনে কত দূর ও কোন্ কোন্ অংশে উন্নত বা অবনত হইতেছে, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি, এবং চারি দিকে দেখিতে পাইতেছি। অতএব সে বিষয়ের বিবরণে একটি পরিচ্ছেদ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন কি?

সম্পূর্ণ।